আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩০ সাল। { ১ম সংখ্যা।

বর্ষ-প্রশস্তিঃ।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ]

(১)

গীর্ব্বাণা স্থরমানবোত্তমচয়ৈর্ভক্তিপ্রসূনস্রজা-
যস্তানেকবিপত্তিজাল হরণৌপাদৌ সদাবন্দিতৌ।
সর্ব্বেষ্টার্থকরং পরেশমনঘং পূর্ণং বিভূত্যা হি তম্
সর্ব্বাপৎপ্রশমার্থ মিষ্টমধমাবন্দামহেশঙ্করং ॥

১। সুরাসুর নরশ্রেষ্ঠ মহানুভবগণ সর্ব্বদা সকল বিপত্তি জাল নাশক যাঁহার চরণ যুগল বন্দনা করেন, সকলের সকল অভিষ্টার্থের পূরণকর্ত্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অভিষ্টদেব সেই দেবাধি-পতি মঙ্গলময় পরমেশ্বর মহাদেবকে মতিহীন আমরা প্রণাম করি।

(২)

যা চিন্ময়ী জগদিদং নিখিলং স্বশক্ত্যা
ব্যাপ্যাবতিপ্রণয়তো জননী বিপদ্ভ্যঃ।
সাভক্তহৃৎসরসিজাসনবাসিনী নো
দুর্গাস্তু দুর্গতিহরা সুচির প্রসন্না ॥

২। নিত্যানন্দময়ী, জগজ্জননী যিনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে নিজ শক্তি প্রভাবে ব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্ববিধ বিপদ্ জাল হইতে প্রণয়ের সহিত রক্ষা করিতেছেন; ভক্তহৃৎপদ্মবাসিনী সেই সুরেশ্বরী দুর্গাদেবী, প্রসন্না হইয়া, চিরদিন আমাদের দুর্গতি বিনাশ করুন,

(৩)

নমামঃ শঙ্করং সাক্ষাৎ

কাশীনাথং জগদ্‌গুরুং।

ধন্বন্তরিং মহাভাগং

অভৌম বৈদ্যকাকরং ॥

৩। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার, জগদ্‌গুরু কাশীনাথ মহাভাগ ধন্বন্তরি দেবকে প্রণাম করি। যিনি আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ অমূল্য রত্নের আকররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৪)

ভরদ্বাজং মহাবাহং

আয়ুর্ব্বেদাব্ধি সন্তরে।

সিদ্ধবাচং মহর্ষীণং

বন্দামহে চিরং নতাঃ ॥

৪। বিশাল আয়ুর্ব্বেদ সাগর পারের প্রধান অবলম্বন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ মহর্ষিপতি, ভরদ্বাজ দেবকে আমরা চিরনত হইয়া বন্দনা করি।

(৫)

সংসারকল্যাণপরাঃ পরেশ-

কৃপাশ্রিতা রক্ষিতবৈদ্যশাস্ত্রাঃ।

যে গ্রাহকা বৃত্তিহিতোপদেশ-

কৃপার্পণৈর্নো জনয়ন্তি সার্থান্ ॥

(৬)

বিদন্তু তে বিজ্ঞতমাঃ স্বভাব—

সিদ্ধাং চিরস্থাং হি কৃতজ্ঞতাং নঃ।

অষ্টাব্দে খলু পত্রিকেয়ং

প্রবর্ত্ততে যৎ মহিমা সতেষাং ॥

(যুগ্মকম্)

৫।৬। সংসারের কল্যাণকার্য্য তৎপর, পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র, বৈদ্যকশাস্ত্রের রক্ষক, যে গ্রাহকগণ, অর্থ, হিতোপদেশ ও সহানুভূতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে সফলকাম করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞতম মহাত্মগণ সমীপে, আমাদের আন্তরিক চিরস্থায়ি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি, আর এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা যে অষ্টম বর্ষে প্রবৃত্ত হইল—ইহা তাঁহাদেরই মহত্ত্বের পরিচায়ক।

বায়ুপিত্ত, কফ।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়া।

"প্রকৃতির জ্ঞান না হইলে বিকৃতির জ্ঞান হইতে পারে না"——ইহাই হইল আমাদের প্রাচীন কথা, তাই বায়ুর স্বাভাবিক শারীর ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহর্ষি চরক বায়ুর অবিকৃত ক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"উৎসাহোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস চেষ্টা ধাতু গতিঃ সমা।
সমোমোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্॥"

কার্য্যানুরাগকে উৎসাহ বলে; যদিও ইহা মানস ব্যাপার,তথাপি উহা বায়ুরই স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, বায়ু রজোগুণ বহুল, সেই রজোগুণই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক, অতএব রজোগুণাধিক বায়ু সমস্ত শরীরও মানসব্যাপারের চালক,সুতরাং উৎসাহ মানস কার্য্য হইলেও তৎপ্রবর্ত্তকতা হেতুক বায়ুর কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উচ্ছ্বাস, শ্বাসগ্রহণ এবং নিশ্বাস অন্তর্গৃহীত বায়ুর ত্যাগ, ইহাকেই আমরা শ্বাস প্রশ্বাস বলি. এই শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের জীবনের সাক্ষী, যখন জীব-নিদ্রার শান্তক্রোড়ে শায়িত থাকে, তখন বহিরিন্দ্রিয় গ্রাম নিষ্ক্রিয়বৎ অবস্থান করে, তদানীং কেবল শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই চৈতন্য শক্তির উপলব্ধি করিতে পারি। চেষ্টা শব্দে সঙ্কোচ প্রসারণ-গমনাগমন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া বুঝায়, যদ্যপি ইহাকে কেহ কেহ [illegible] কার্য্য বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই বায়ু প্রেরণায় বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। "গতিমতাং সমোমোক্ষঃ" গতিমৎশব্দে অভ্যন্তরবর্ত্তী মল-মূত্র-স্বেদ-স্ত্রীরজঃ এবং বহির্ম্মুখী রসাদি ধাতুগত মল ও উপধাতু সমূহ লক্ষিত হইয়াছে, সেই মলসমূহ বায়ুর ক্রিয়া ভিন্ন যথাযথ বহির্গত হইতে পারে না, কারণ জড় পদার্থ কখনও স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না,——ইহাই হইল অবিকারজ বায়ুর কর্ম্ম। এই বায়ুর ক্রিয়া-কলাপ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বহির্জগৎ যেমন বায়ুর ক্রিয়ার অধীন, তেমনি আমাদের দেহ-জগৎও বায়ুকর্ম্মের অধীন, বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী সমস্বরে বায়ুর সর্ব্বাত্মতা, জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহার কারণ প্রভৃতি শক্তিমত্তা ঘোষণা করিয়াছেন।

বায়ুস্থান।

এই বিশ্ব জগতে বায়ু ভিন্ন যেমন স্থান নাই, আমাদের শরীর জগতেও তেমনি বায়ু ভিন্ন স্থান নাই, সুতরাং বায়ু আমাদের সর্ব্ব দেহব্যাপী, তথাপি উহাকে শাস্ত্রে [illegible] ভেদে স্থান ও নাম ভেদ করিয়াছে।

ক্রমশঃ তাহারই বর্ণনা করিব, সুশ্রুত বায়ুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যথা বস্তি (মূত্রাশয়), মলাশয়, কটি, সক্থি, পাদদ্বয়, অস্থি। কিন্তু এই সমস্ত বাতস্থান হইলেও পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান, মলাশয় ও পক্বাশয় শব্দ তুল্যার্থ বাচী, গ্রহণীনাড়ীর অধোদেশবর্ত্তী ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র উভয়ই মলাশয় বা পক্বাশয় শব্দের প্রতিপাদ্য। কারণ ঐ সমস্ত স্থানেই পরিপাক প্রাপ্ত ভুক্তদ্রব্য মলীভূত হইয়া বহির্গমনের জন্য অবস্থান করে।

বায়ুর নাম।

এক ব্যক্তির কার্য্যভেদে যেমন পাচক, পাঠক, বাদক প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তথা এক বায়ু ও শারীর কার্য্য ভেদে প্রাণ, উদান, সমান, অপান, ব্যান, এই পাঁচ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চনামাত্মক বায়ু যখন হৃদয়ে থাকে তখন "প্রাণ" কণ্ঠদেশে "উদান" নাভিদেশে সমান, মলদ্বারে অপান ও সর্ব্ব শরীরগামীকে ব্যান" বায়ু বলিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপী, তথাপি উক্ত বস্তি প্রভৃতি স্থান প্রধান, কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান পক্বাশয়। কারণ ঐ স্থানেই ভুক্তদ্রব্যের কটু পাক বশতঃ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং ঐ উৎপন্ন বায়ুই শরীরস্থ অন্যান্য বায়ুর বল দান করে। দ্বিতীয়তঃ অন্নই দেহের বল, সেই অন্ন পরিপাচক অগ্নির বল পুনঃ বায়ু, অতএব পক্বাশয়াস্থিত বায়ুই দেহ ধারণের অধিক উপকার করায় পক্বাশয়কে বায়ুর প্রধানতম স্থান কথিত হইয়াছে।

প্রাণবায়ু।

এখন আমরা কার্য্য ও স্থান ভেদে পঞ্চ বায়ুর ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। যে বায়ু বক্ত্র সঞ্চারী অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নাসিকা ও মুখ দ্বারা গমনাগমন করে, তাহাকে "প্রাণ" বায়ু বলে, এবং এই প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ভুক্তদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইয়া পাকস্থলীতে গমন করে। তথাচ সুশ্রুত,—'বায়ুর্যো বক্ত্র সঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহ ধৃক,সোহন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাবপ্য বলম্বতে॥" এখন আমরা বক্ত্র সঞ্চারী প্রাণ বায়ু দেহধৃক্; এবং ভুক্তদ্রব্যের অন্তঃ প্রবেশক প্রাণবায়ু প্রাণাবলম্বক—এই দুই কথার ভিতরে কোন বিশিষ্টতত্ত্বনিহিত আছে কি না—তাহারই আলোচনা করিব, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—বাহ্যবায়ুর ভিতরে অক্সিজেন নামক এক প্রকার পদার্থ সমন্বিত বাহ্য বায়ু ফুসফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুসফস স্থিত দৈহিক রক্ত প্রবাহকে পরিস্কৃত করে; সেই বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে গিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাদৃশ রক্ত বিশোধন উপায় কোথাও বর্ণনা করেন নাই; অথচ ধমনী প্রবাহিত রক্তের ও শিরা প্রবাহিত রক্তের বর্ণাদির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাই, "তপনীয়েন্দ্রগোপাভং পদ্মা-লক্তকসন্নিভং"—ইত্যাদি বিশুদ্ধ রক্তের যে লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত রক্ত সুস্থ দেহে ধমনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আবার তদানীং শিরাস্থিত রক্ত মোক্ষণ করিলে তাহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত রক্ত

দেখিতে পাই, সুতরাং ধমনীস্থ রক্ত বিশুদ্ধ এবং শিরাস্থিত রক্ত অবিশুদ্ধ এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি কেহ শিরাস্থিত রক্তকে বাতাদি দোষ দূষিত রক্ত বলিতে চাহেন, তাহা হইলে জীবগণ সর্ব্বদাই রুগ্ন—এ আপত্তি আসিতে পারে, এবং স্বাস্থ্য শব্দের অভিধান উঠাইয়া দিতে হয়, মহর্ষিগণ যখন বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন,তখন তাঁহারা বিশোধন উপায় যে জানিতেন না—একথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারে না। তবে সেই বিশোধন উপায় কি, তাহা হইল এখন চিন্তনীয়। আমরা পাশ্চাত্যমতের রক্ত শোধন প্রণালীর কথা বলিয়াছি, এবং তাহাতে বুঝিয়াছি যে, শ্বাস প্রশ্বাসই রক্ত শোধনের বিহিত উপায়, আয়ুর্ব্বেদ মতেও বক্ষ্সঞ্চারী প্রাণ বায়ু দেহ ধৃক্ অর্থাৎ দেহকে ধারণ বা রক্ষা করে, এই দেহ রক্ষাই রক্ত বিশোধন পূর্ব্বক বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তাতেই চিন্তা করিতে পারিয়াছি, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এখন দেখা যাক প্রাণবায়ু প্রাণ অবলম্বক কি প্রকারে হইতে পারে, এস্থলে প্রাণ শব্দের অর্থ বল, এই বল অন্নমূলক, সুতরাং ভুক্ত দ্রব্য প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আমাশয়ে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া প্রাণবায়ু প্রাণাবলম্বক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উদান বায়ু।

উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থান করে, এই উদানবায়ুর সাহায্যে মানব কথাবার্ত্তা, গান ও নানাবিধ ধ্বনি করিতে পারে। উদান-বায়ুর উক্ত কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, উদানবায়ু কণ্ঠস্থিত স্বরবাহী স্রোতঃচতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বরবাহী স্রোত চতুষ্টয় সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"দ্বাভ্যাং ভাষতে দ্বাভ্যাং ঘোষং করোতি।" অর্থাৎ দুইটী স্বরবাহী স্রোত দ্বারা স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা বলে এবং অপর স্রোত দ্বয় দ্বারা গভীর ধ্বনি করে।

সমানবায়ু।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পক্বাশয় বায়ুর স্থান, এই পক্বাশয়াশ্রিত বায়ুকে সমানবায়ু বলে। এই সমান বায়ু জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে, করে, সমান বায়ু সন্ধুক্ষিত জঠরা-নল আমাদের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, পরিপাক ক্রিয়ায় জঠরানলের প্রাধান্য থাকিলেও তাহার মূলীভূত কারণ সমান বায়ুর সন্ধুক্ষণ, এই সমান বায়ু ব্যাপিয়া থাকে; এবং অপান বায়ু উণ্ডুক হইতে সমগ্র স্থূলান্ত্রে অবস্থান করে।

পূর্ব্বে যে পক্বাশয়কে বায়ুর স্থান বলা হইয়াছে, সে কেবল সামান্য ভাবে। নাম ভেদে বায়ুর স্থান বিভাগ করিতে হইলে সমান বায়ুর স্থান ক্ষুদ্রান্ত্র এবং অপান বায়ুর স্থান বৃহদন্ত্র—এই ভাবে স্থান ভাগ করিতে হইবে। এই সমান বায়ু অধো দিকে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং উর্দ্ধ দিকে আমাশয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে অর্থাৎ পক্বাশয় সমান্ বায়ুর স্থান; জঠরানল সংক্ষুক্ষণ করিতে গ্রহণী এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে রসকে পৃথক করিতে আমাশয় পর্য্যন্ত প্রসা-রিত হয়।

তাই শাস্ত্র কার বলিয়াছেন—"আম পক্বাশয়চরঃ সমনোবহ্নি মঙ্গতঃ, সোহন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।

অপানবায়ু।

সমান বায়ু প্রসঙ্গে বলিয়াছি অপান বায়ু মলাশয়ে অর্থাৎ স্থূলান্ত্রে অবস্থিতি করে, ঐ অপান বায়ু মল, মূত্র, শুক্র, রজঃ গর্ভ ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধোদিগে নিঃসারণ করে।

ব্যানবায়ু।

ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহচর, এই ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক রসরক্তাদি সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ প্রসারণ বেগ বশতঃ হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত স্রোত দ্বারা সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হয়, আয়ুর্ব্বেদের সহিত এ স্থলে মত বিরোধ থাকিলেও সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার অবিরোধ আছেই। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা উভয়েই তুল্যফলে পরিতৃপ্ত। তবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচ প্রসারণ ক্রিয়া যে বায়ু, তাহাও আমরা এই প্রবন্ধেই বলিয়াছি।

বায়ুর এই সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়াই বায়ু কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয় অতএব বায়ুর ক্রিয়া মুহূর্ত্ত বন্ধ থাকিলে জীবগণ জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। আর সমভাবে বায়ুর ক্রিয়া থাকিলে জীবগণ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। এ বিষয়ে মাধবের চরক সংগ্রহ শ্লোক যথা—
অব্যাহগতি র্যস্ত স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ॥
বায়ুস্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতং॥"

বায়ুর গুণ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বায়ুর কয়েকটী স্বাভাবিক গুণ কথিত হইয়াছে। এখন আমরা তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।" রুক্ষঃ শীতোলঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।" শাস্ত্রকারগণ এই রুক্ষাদি গুণ সমূহকে বায়ুর স্বাভাবিক গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রুক্ষগুণ শোষক হইয়া থাকে, বায়ুর যে শোষক শক্তি আছে—তাহা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই। রাত্রে একখানি আর্দ্রবস্ত্র ফেলিয়া রাখিলে তাহা কেবল বায়ুদ্বারাই শুকাইয়া যায়। ব্যাধি সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও দেখা যায় যে, রুক্ষ গুণ প্রকোপিত বায়ু শরীরকে শুষ্ক ককরিয়া থাকে, যথা জীর্ণ জ্বর ও শোষ প্রভৃতি রোগে বায়ুর আধিক্য থাকে, তাই রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে; ক্ষয়জ বাত প্রকোপ রুক্ষ গুণোদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, কারণ যেখানে ধাত্বাদির ক্ষয় দেখিতে পাই, সেইখানেই শরীরের শুষ্কতা লক্ষিত হয়। রুক্ষতাকে মৃৎতৈজস গুণ বলা যাইতে পারে, সুতরাং রুক্ষগুণ শীত গুণের বৈধর্ম্মী, অতএব এক বায়ুতেই উক্ত উভয় গুণের সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, ইহার উত্তরে চরক ও বাগভটের টীকারগণ বলিয়াছেন যে, শীতগুণ বায়ুর প্রকৃত নয়, কিন্তু উষ্ণগুণে বায়ু প্রশমিত হইবে ইহা বুঝাইবার জন্যই বায়ুর শীত গুণ বলা হইয়াছে; কারণ বিপরীত গুণে বাতাদি দোষের প্রশমন হয় ইহাই হইল দোষ সাম্যের প্রধান নিয়ম। বায়ু লঘু গুণ হেতুক অতি সূক্ষ্ম স্রোতাদির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, অতএব বায়ুর সর্ব্ব ব্যাপকতা সিদ্ধ

হইল। বায়ু যে স্বয়ং গতিশীল তাহা চল গুণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এবং নিশ্চল পিত্ত কফ ও রস রক্তাদি ধাতুকে স্থানান্তরে নয়ন করিতে বায়ুই যে কর্ত্তা তাহাও অবিসম্বাদী মত, দোষ ধাতু মল মূলক দেহে বায়ুরই যে প্রভুত্ব তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

বায়ুর যে খরত্ব গুণ বলা হইয়াছে; ঐ খর শব্দের অর্থ অমৃদু অর্থাৎ কঠিন, অমূর্ত্ত পদার্থের মৃদু কঠিনতা কল্পনা অসম্ভব হইলেও বায়ু যে রুক্ষতানিবন্ধন শোষণ শক্তি দ্বারা বস্তুগত দ্রবাংশ শুষ্ক করতঃ কঠিনতা উৎপাদন করে, সেই কঠিনতা দর্শন করিয়া বায়ুর খর গুণ কথিত হইয়াছে, অমূর্ত্ত বায়ুর গুণাদি সমস্তই ক্রিয়া গম্য, তাই শাস্ত্রে বায়ুর গুণ কথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "অব্যক্তোব্যক্ত কর্ম্মা চ রজো বহুল এব চ।" অর্থাৎ বায়ু অমূর্ত্ত, কিন্তু বায়ুর কার্য্য দেখিয়া বায়ুর গুণাদি লক্ষিত হয়, বায়ুর অমূর্ত্ততা বশতঃ গুণাবলী লক্ষিত না হইলে বায়ুর গুণ কথনের অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—বায়ু পিত্ত কফ সমগুণ বিশিষ্ট আহার বিহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং বিপরীত গুণ যুক্ত আহার বিহার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বায়ুর গুণ উক্ত না হইলে গুণের সমত্ব বা বিপরীতত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। তদভাবে কোন প্রকার চিকিৎসা কার্য্যই চলিতে পারে না।

এই বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়া সমূহ আলোচনা করিয়াও বুঝিয়াছি যে, দেহ ধারণ করিতে হইলে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম, শরীরের অন্যান্য পদার্থ সমূহের অভাবে যতক্ষণ জীবিত থাকা যায় বায়ু অভাবে তাহার অর্দ্ধক্ষণও জীবন থাকিতে পারে না। অদ্য বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়াই আলোচিত হইল, অতঃপর পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহার পর বায়ু পিত্ত কফ কি প্রকারে রোগোৎপত্তি করে তাহাই বিবৃত করিতে যত্নবান হইব।

দিবোদাস।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ]

অখিল-অমর-নিখিল-মানব-শীর্ষ আনত চরণে যাঁর।
একাধারে যিনি নৃপ মহর্ষি-ভিষগাচার্য্য-করুণাধার॥
ছেদিতেন যিনি অমরগণের শত জরা-ব্যাধি মরণ পাশ,
ধন্বন্তরি স্বরূপে উদিল আদি দেবাংশ সে দিবোদাস॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতাল হর্ষে॥

মহারাজর্ষি-দেব দিবোদাস ! উদিলে দ্বাপরে সিদ্ধ ক্ষেত্রে।
বারাণসী ধামে স্থাপিলে রাজ্য নাশিয়া ভদ্র শ্রেণ্য পুত্রে।
অসীম বীর্য্য দরশি ইন্দ্র শতেক নগরী করিল দান।
তাঁহার সকাশে লভিলে শিক্ষা ব্রহ্মা গ্রথিত আয়ুর জ্ঞান॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥
নৃপতি "সুদেব" জনক তোমার লভিলে তনয় প্রতর্দ্দনে।
মহিষী "সুযশা" সদৃশী তোমার পুলকিত প্রজা তোমার ধ্যানে॥
শিষ্য তোমার সুশ্রুত আদি শত শত ঋষি প্রতিভাবান্।
বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকি' আয়ুর বিদ্যা করিলে দান॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥
শল্য শাস্ত্র প্রচারি' বিশ্বে রচিলে বিশাল আয়ুর তন্ত্র।
খ্যাত "চিকিৎসা দর্শন" নামে ছাইল জগতে যশের মন্ত্র॥
পুরাণে তোমার ঘোষিল মহিমা মুখরিত বেদ তোমার গানে।
অশীতি হাজার বরষ ব্যাপিয়া পালিলে ধরণী করুণা দানে॥
কখন অজিন-আসনে আসীন্ কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥
চতুঃষষ্টী কলায় পূর্ণ শাসিলে রাজ্য একচ্ছত্র।
অসূয়ামত্ত দেবতা বৃন্দ তোমার পতনে খুঁজিল ছিদ্র॥
সুর গুরু মতে বারাণসী হ'তে তিরোহিত হ'ল অনল সূর্য্য।
বিশ্ব-বিজয়ী জ্যোতিতে তোমার সাধিলে যজ্ঞ যাগের কার্য্য॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥
একদা যখন বারাণসী ধামে পিনাকীর হ'ল বাসাভিলাস।
সাম দান্ ভেদ নিপুণ তোমার রাজ্য ছলনে করিল নাশ॥
প্রবল প্রতাপে গোমতীর তীরে আবার স্থাপিলে শোভন রাজ্য।
আজিও মানব ব্যাধি-বিমুক্ত স্মরি তব নাম দানিয়া আজ্য॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥

বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ]

যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার নিকট অতি শিশু বলিয়া পরিচিত এবং সেই শিশু প্রসূত জড় বিজ্ঞান অনাদি-কালের তুলনায় দিনকয়েক মাত্র আমাদের নয়ন পথের পথিক হইয়াছে, যদিও ঐতিহাসিকগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আয়ুর্ব্বেদের পৌত্র আখ্যা দিয়া থাকেন, যদিও কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার চার্লস, ভারতের ভূত পূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সারজন্ লিকুইস্, আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ফ্রান্সিস্কো সহরের জগৎ বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টারস্ এম্ ডি, বহুদর্শী ডাক্তার জর্জ ক্লার্ক এম, এ, এম, ডি, প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ মেক্‌লাউড, ডাঃ গার্ব্বি, ডাঃ জেক্‌বি, বার্থ সেণ্টহেনিয়ার প্রভৃতি আমেরিকা, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ডাদি দেশের বহু নিরপেক্ষ গুণগ্রাহি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া নানাভাবে আয়ুর্ব্বেদের গুণগান করিয়াছেন, যদিও বেদ অপৌরুষের দৈববাণী বলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে এবং আয়ুর্ব্বেদকে সেই বেদেরই অন্তভম অথর্ব্ববেদের একটী অংশ বিশেষ বলিয়া আমরা জানি ও তাহার উপযোগিতা প্রত্যহ শত শত স্থলে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তথাপি যে বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আমাদের তাদৃশ ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয় না, তাহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। আমরা রোগ হইলে প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের অবমাননা করতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসার স্মরণ লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না! ভারতের গৌরব স্তম্ভ আয়ুর্ব্বেদ আজ ভারত বাসী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করি না, ইহা দেশের দুরদৃষ্ট নহে তো কি!

আমাদের দেশবাসী সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা তো ছাড়িয়াছে, কিন্তু কেহ কি বুকে হাত দিতে বলিতে পারেন যে, বিদেশীয় চিকিৎসা পুরাকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের অধিকতর উন্নতি করিয়াছে? এখন চিররোগীর সংখ্যাও যে বৃদ্ধি হয় নাই—এ কথাও কি কেহ বলিতে পারেন? কায়চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ অপেক্ষা এলোপ্যাথিতে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায়। অথবা যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতং—এই শাস্ত্রীয় বচনটী অবৈজ্ঞানিক বা মিথ্যা,—সেই জন্য বৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইতেছে। অথবা অন্য কোন কারণ এই আত্ম বঞ্চনার মূলে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এ বিষয়ে বহু জনের বহু মত বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান শিক্ষাই আমাদিগের আত্মবোধ ভুলাইয়া পাশ্চাত্য প্রীতি করাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য জাতীয় বিজ্ঞানের আদর আমরা শিখি নাই, এমন কি দেশীয় চিকিৎসক ও না হইলে ভাল হয়, সাহেব ডাক্তার যদি অজ্ঞও হন, তথাপি তাঁহার পদার্পণে আমরা নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করি, দেশের অবস্থা এইরূপই না দাঁড়াইয়াছে।

অপরে বলেন, অলসতাই আমাদিগকে বাসক পাতা থেঁতো করার হাঙ্গামা অপেক্ষা ৷৹ বার আনা খরচ ক'রে একশিশি এক্‌ষ্ট্রাক্ট অফ্‌ বাসক ক্রয় করাটাকেই সুবিধা ব'লে মনে করিয়ে দেয় এবং সেই সুবিধার মোহেই আমরা আয়ুর্ব্বেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। অপর একদল বলেন, নূতনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতিই পুরাতনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেয়, বিদেশীয়ের নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়া আমাদিগকে এমন এক নূতন আলোক দান করিতেছে যে, ঐ চিরকেলে বাঁধি বুলি আর ভাল লাগে না, বুনো ঋষিদের কাচকলাথেঁগো জ্ঞানে আর কুলাইবে না, পাতা থেঁতোর কাল আর এখন নাই, এখন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির কাল, এখন নিত্য নূতন একটা কিছু চাই—নতুবা চলিবে না। আর একদল আছেন—তাঁহারা মনে করেন; রাজশক্তি পশ্চাতে না থাকাই দেশীয় বিজ্ঞানের অবনতির মূল কারণ। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে যাহা কিছু প্রয়োজন—রাজশক্তির অভাবে তাহা হইতেছে না। অনেকে আছেন যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অফিসে ছুটী না পাওয়ার ভয়ে বাধ্য হইয়া ডাক্তারের আশ্রয় লইয়া থাকেন। রাজ শক্তির সহায়ে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে যে বিজ্ঞান আমাদের জাতীয় বিজ্ঞানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে—তাহার সহিত প্রতি যোগিতায় অর্থহীন শিক্ষায়তন বিহীন পরাধীন কবিরাজগণ এখনও যে বড় বড় ডাক্তারের সহিত সমান দর্শনী লইতেছেন, এখনও যে কবিরাজগণ ডাক্তারির ফেরৎ রোগী লইয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন—ইহা তাঁহাদের 'সত্যং হি কেবলং বলং'—ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অনেকে বলেন, স্বদেশিকতার অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এ দেশে তাদৃশ একজনও স্বদেশ প্রেমিক নাই —যিনি সার্‌ডন্‌ উড্‌বর্ণ সাহেবের মত বলিতে পারেন যে, আমি আমার সামান্য জীবনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞানের অবমাননা করিয়া বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে চাই না। কেহ কেহ কাল প্রভাব, ধর্ম্মহীনতা, দুরদর্শিতার অভাব, অনুকরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি নানা কারণ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষের মূলে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন। হাইকোর্টের জর্জ্জ মাননীয় উড্রফ সাহেব ভারতবাসীকে নির্ব্বোধ বলিয়া নির্দ্দেশ থাকেন। সার্‌জন তাঁহার ভারতশক্তি নামক পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন, যে দেশে—ঘরে-বাহিরে, বনে বাগানে চারিদিকে শত শত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ ছড়ান, সে দেশের লোক ভগবানের অপার করুণাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ভারতবাসী পয়সাগুলি বোকার মত তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া ভারতের প্রকৃতির অনুপ-যোগী উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দরিদ্রতার বৃদ্ধি ও জাতীয় অপ-মানকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। ভারতবাসী উষ্ণবীর্য্য ঔষধ ব্যবহারের ফল স্বরূপ নিজেরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। তিনি অতি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন যে, আমি নিজে স্থায়ি ফলের লোভে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা করাই, কিন্তু আমার চাকর ভারতবাসী হইয়াও কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে রাজী নয়।

যদি কোন সদাশয় ইংরাজ এদেশের গাছ বিলাতে লইয়া সেখান হইতে ঔষধ প্রস্তুত করতঃ ভাল লেবেল লাগাইয়া এখানে পাঠাইতে পারেন,তাহা হইলেই এদেশে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা, নতুবা ঘরের দরজার ঘাস গরুতে খাইবে না। যাঁর প্রাণে একটুও স্বদেশ প্রেম আছে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা একটুও অবগত হইতে পারিয়াছেন, ঋষিদের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিতে যাঁহার বিশ্বাস আছে, কোন ভারতবাসীকে বিলাতি ঔষধ কিনিতে দেখিলে তাঁহার চক্ষুতে জল না আসিয়া থাকতে পারে না। নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের যে একটা স্বাভাবিক প্রীতি, আয়ুর্ব্বেদের বেলায় তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় কেন? এ বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলগণের অভিমত ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের বুঝিবার ক্রটিই ইহার কারণ। যতদিন আয়ুর্ব্বেদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না ততদিন আয়ুর্ব্বেদের উপর অবিশ্বাসের কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই, অতএব ইহার উন্নতির কোন ব্যাঘাতও ঘটে নাই। যখনই নূতন বিজ্ঞান আসিয়া তাহার সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ রেল ষ্টিমার প্রভৃতি কতকগুলি চমকপ্রদ বাহিরের দৃশ্য আমাদের সম্মুখে ধরিল, অমনি আমাদের হৃদয়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইতে লাগিল। এই জড় বিজ্ঞানকেই একমাত্র সত্যের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়া গেল। বিজ্ঞানই যে জ্ঞানের চরম, প্রজ্ঞান বলিয়া যে আর একটা জিনিষ আছে, সে কথা বিস্মৃতির জ্ঞান গর্ভে ডুবিয়া গেল। প্রজ্ঞানের সফলতা যথা,—বিনা যানে শূন্য পথে বিচরণ, বিনা তারে সুদূরের সংবাদ লওয়া ক্ষণ মাত্র ধ্যানস্থ হয়ে ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করা, একবিন্দু কোশার জলে মৃত ব্যক্তির জীবন দান প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইয়া যোগ বলের মাহাত্ম্য প্রচার করার মত লোক বর্ত্তমানে বিরল। কাজেই বিজ্ঞানের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকিলেও সে যে প্রজ্ঞানের নীচের ধাপের জিনিস, একথা অনুভব করার সুযোগ আমাদের ঘটে না।

সুদূর অতীত কালের শিক্ষা-প্রণালী বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সহিত খাপ খায় না, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে জড় বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না। প্রত্যক্ষের পথ দিয়া জড় বিজ্ঞানকে বোঝা যত সহজ,অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বোঝা তত সহজ নয়। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্যক বুঝিতে হইলে যোগ বল চাই, কিন্তু আমাদের সে সাধনা নাই। অথচ জড় বিজ্ঞান অন্ধের মত শাস্ত্রের কথা শুনিতে দেয় না। আর আমাদের শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদ চিকিৎসিতং
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

এই খানেই ঋষিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদীর প্রথম বিরোধ। এমন কোন যুক্তি প্রত্যক্ষবাদীরা পান না—যাহার দ্বারা যথোক্তানুগমনকই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অতএব ঋষিদের এইরূপ উপদেশকে চিন্তার স্বাধীনতাপহারক বলিয়া মনে করে ও তজ্জন্য গালিবর্ষণেরও ক্রটি করেন না। বিজ্ঞান—জ্ঞানকে ক্রম বিকাশশীল বলিয়া স্বীকার করেন। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ নাই। আমরা এ যুগেও যে সকল উন্নততর জ্ঞানের প্রকাশ হইতে দেখিতেছি তাহাও ক্রম বিকাশের ফলে হয় নাই, হঠাৎ

হইয়াছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া যে সকল সত্য—জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকলের টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা সমালোচনা প্রভৃতি হইয়াছে মাত্র, আসল সত্যগুলির কোনই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। কেন এ দেশের মনীষীগণ সত্যকে ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেনই বা বেদকে অপৌরুষের ভগবদ্ বাণী বলেন এবং ভগবৎ বাণী কিরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়—এ সকল কথা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না বলিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। চরক খুলিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ভরদ্বাজমুনি অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। মানুষ স্বশরীরে দেবতার কাছে যাইতে পারে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র অদ্যাবধি সৃষ্ট হয় নাই। অতএব এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হয়, অমর নাথ সম্বন্ধে আমাদের যে একটা বড় রকম ধারণা আছে—সেটাকে ছোট ক'রে আধুনিকের মতানুযায়ী মঙ্গোলিয়াকেই স্বর্গ রাজ্য বলিয়া মানিয়া হইতে হইবে, নতুবা স্বীকার কর্ত্তে হবে—বিজ্ঞান শক্তি অপেক্ষা কোন বড় শক্তি সেকালে ঋষিদের ছিল—যার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইতে পারিত। শাস্ত্রকার জ্বরোৎপত্তি বিষয়ে বলিতেছেন,—

"দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ রুদ্র নিশ্বাস সম্ভবঃ"

ক্রুদ্ধ রুদ্রের নিশ্বাস থেকে জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছিল;—ইহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা? শারীরিক ক্লেশকর কতকগুলি লক্ষণ সমন্বিত অবস্থা বিশেষকে আমরা জ্বর বলিয়া জানি। সে কিরূপে রূপ ধারণ করিয়া করযোড়ে মহাদেবে কাছে দাঁড়াইল? "জ্বরস্ত্রিপাদঃ ত্রিশিরা ষড়্‌ভুজো নবলোচনঃ, ভস্মপ্রহরণঃ রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ॥" শাস্ত্রকারগণ এই যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—উহা কাল্পনিক অথবা জ্বরের যে জীবাণু বর্ত্তমানে বাহির হইয়াছে তাহার রূপ ঐ প্রকার? মহাদেবই বা কে? ইনি কি প্রাচীন কোন্ ভীল, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির পুরুষ, অথবা জগতের সংহার কর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব? এই সকল অলৌকিক ব্যাপার আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদের যাহা মূল উপাদান—বায়ুপিত্তকফ, কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এখনও তাকে ধর্ত্তে পারে নাই। অতএব যদি প্রত্যক্ষবাদীর জড়বিজ্ঞানকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর্ত্তে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদকে বিশ্বাস করা চলে না। যার আধুনিক বিজ্ঞানে যত বেশী প্রীতি জন্মাইবে, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তার তত বেশী অবিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উভয়ে পরস্পর বিভিন্ন পথ দিয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে চলিয়াছে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই আমাদের দেহে বায়ুপিত্ত কফরূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ঋষিরা আমাদের চিত্ত বৃত্তিকে ভগবদভিমুখী করাইয়া জড়ের মধ্যেও চেতনের অস্তিত্ব অনুভব করাইতেছেন। তাই তাঁহারা বলিতেছেন—

সহি ভগবান্ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ ভূতানাং ভাবাভাবাকরঃ সুখাসুখঃ

বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতি
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ
সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রানাং বিধাতা ভাবানামনুর্বিভু
বিষ্ণুঃ ক্রান্তা লোকানাং বায়ুরেব ভগবানিতি।

• আর পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জীবাণু লইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছেন, এই প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করিয়া প্রাচীন অসভ্য যুগের ঋষির কথামত অপ্রত্যক্ষকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করার মত ভক্তি আমাদের নাই। জীবাণু যে নীচের ধাপের জিনিস, জীবাণুর দিকে দৃষ্টি করিলে যে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, ভগবানের দিকে দৃষ্টি যায় না, প্রকৃত স্বাস্থ্য যে আমাদের মতে কেবল শরীর সংরক্ষণ নয়; মুক্তিই যে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং তাহার বিঘ্ন স্বরূপ বলিয়া জরাদির প্রতিকার আবশ্যক,—সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে বক্তৃতা কালে কেন বলিয়াছিলেন যে দি ইষ্টারন্ সায়েন্স বিগিন্‌স্ হিয়ার দি ওয়েষ্টারণ সায়েন্স এণ্ডস্", পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যেখানে শেষ,প্রাচ্য বিজ্ঞান সেইখান থেকে আরম্ভ, সে কথা ভারতের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব না জান্‌লে বোঝা যায় না। "মুনয়ো হি তপোযোগর্দ্ধি বলাৎ ত্রৈকালিক নিখিল জ্ঞান শালিনঃ পুরুষাতিশয়া উচ্যন্তে"—এই কথাটীকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করি। আমাদের শক্তি বর্ত্তমানে এত কম যে, অত বড় কথা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। আমরা বুঝিতে পারি না যে, তপস্যা ও যোগবলে মানুষ কি করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হইয়া অলৌকিকশক্তি লাভ কর্ত্তে পারে। আমাদের ধারণা সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, বার্ড সাহেব প্রভৃতির মত বিজ্ঞ লোকগণই পরবর্ত্তী যুগের লোকের কাছে ঋষিতে দাঁড়ায়। যাঁহারা একালের যোগী ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে দেখিয়াছেন, তাঁর অলৌকিক কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই যোগবল বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন। আর যোগবল বিশ্বাস করেছিলেন—কর্ণেল অলকট সাহেব। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে,একজন সামান্য সন্ন্যাসীর মধ্যেও কি অদ্ভুত ক্ষমতা থাকিতে পারে।

"যদি হাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ" ঋষির এই কথা শুনিয়া যাঁরা অন্ধ ভক্ত, চরক খানা ভাল করে পড়ায় উৎসাহ তাঁদের বাড়তে পারে, কিন্তু যাঁদের বিবেক আছে, নবীন জ্ঞানালোক যাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাঁদের ঐ দম্ভোক্তি দেখে ঘৃণায় চরকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে হয়, চরক খুলবার প্রবৃত্তিও আর থাকে না। এই মিথ্যা প্রবঞ্চনার যুগে প্রত্যেক অণু পরমাণু যাদের মিথ্যা দ্বারা কলঙ্কিত, তারা কেমন করে বিশ্বাস কর্ব্বে যে, ঋষিরা কোন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া বেশী বই বিক্রয় হওয়ার আশায় এরূপ অলীকের অবতারণা করেন নাই। অতএব বেদ কি? আপ্তঋষি কাহাকে বলে, বেদে ও বিজ্ঞানে বিরোধ স্থলে কার কথা সত্য বলে মাথায় পাতিয়া লইব? বায়ুপিত্ত কফ জিনিষটা কি? কেনই বা ঋষিরা বায়ুপিত্ত কফের উপর আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন? যদি কোন বিজ্ঞ কবিরাজ এ সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশদ ভাবে উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ দেখিয়ে আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়ে দেন তাহা হইলে আশা করি স্রোত ফিরলেও ফিরতে পারে।

জ্ঞান আমরা দুই ভাবে লাভ করি,—স্বভাবজাত জ্ঞান ও বাহিরের সংগৃহীত জ্ঞান। দেখে শুনে অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান জন্মে—তাহা বাহিরের জ্ঞান, তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক প্রমাণের আবশ্যক হয় এবং সে জ্ঞানের কিছু স্থিরতা নাই, যিনি যখন যত বেশী যুক্তি দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কথাই তখন সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। এইরূপে ক্রম বিকাশের পথে এই বাহিরের জ্ঞান চলিতেছে, ইহাকেই বিজ্ঞান বলে।

ভিতরের যে জ্ঞান সে কেবল যুক্তি তর্কের অপেক্ষা করে না; যেমন মনে করুন, আপনার ক্ষুধা পাইয়াছে কোন বাহিরের অভিজ্ঞতা এ ক্ষুধাকে আনে নাই, যে মুহূর্ত্তে আপনার শরীরে আহার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ক্ষুধারূপী ভগবান আপনাকে আহারের জন্য বলিতেছেন; বাহিরের শতযুক্তিও ক্ষুধাকে মিথ্যা কর্ত্তে পারবে না।

জ্ঞানরূপী ভগবান্ সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ জ্ঞান দান করিতেছেন, সেই ভগবৎদত্ত স্বয়মুদ্ভুত জ্ঞানই বেদ। যাঁর চিত্ত যত স্থির, মলিনতা শূন্য, তিনি অন্তরাত্মার বাণী তত বেশী স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারেন। যখন আমরা একটী পাত্রে জল রাখিয়া চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করি, তখন যদি সেই পাত্রের জল মলিন অথবা চঞ্চল হয়, তাহা হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঠিক ভাবে পড়ে না, সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন চিত্তের উপর সত্যের শাশ্বত মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য নিজের বিবেকের দোহাই দিয়া কোন ঋষির শাস্ত্রের উপর কলম চালাইবার পূর্ব্বে নিজের চিত্তশুদ্ধি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। মনে করুন, আপনি আহার করিতে বসিয়াছেন, সে সময়ে যদি আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে অথবা আহার্য্য বস্তুর প্রতি লোভ বেশী জন্মায়, তাহা হইলে ঐ রজো ও তমো গুণের কার্য্য বিক্ষেপ ও লোভ দ্বারা চিত্ত আচ্ছন্ন থাকায় আপনি আহারের যথার্থ পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ফলে অধিক আহার জন্য ব্যাধি আপনাকে কষ্ট দিবেই, যেমন স্থূল বিষয়ের জ্ঞানেও চিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক, সেইরূপ সমস্ত জ্ঞানেরই সত্যতা নির্ভর করে—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনাক্রান্ত চিত্তের উপর এবং সেই রজস্তমো গুণ থেকে মুক্ত হতে হইলে চাই কঠোর সাধন। সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্ত্তে পারলেই আপ্ত পুরুষ হওয়া যায়, তিনিই সত্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাঁর সেই নির্ম্মল চিত্ত কোন বিচার বিতর্ক ব্যতিরেকে আপনা হইতে যে জ্ঞান উত্থিত হয়, তাকেই আপ্ত বাক্য বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, আসল কথা ঋষিরা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁদের অবিশ্বাস ক'র না। অসত্য রজস্তমো গুণের কার্য্য, রজস্তমো শূন্য স্থানে অসত্যের স্থান নাই।

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপো জ্ঞান বলেন যে,—
"যেষাং ত্রৈকালং অমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা
আপ্তা শিষ্টা বিবুদ্ধা স্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাৎ অসত্যং নীরজস্তমা" ॥

এই দার্শনিক সত্যটীর উপর নির্ভর করিতেছে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রীতি এবং এই প্রীতির উপর নির্ভর করিতেছে তাহার প্রতিষ্ঠা। ইংরাজীতেও একটা কথা আছে যে, "কন্সেন্স ইজ্ দি ভয়েজ অফ্ গড্" কিন্তু রজস্তমো

গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারিলে যে ঈশ্বরের বাণী সম্যক উপলব্ধি করা যায় না--একথা আমাদের ঋষিরাই ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আমাদের সাধারণ গোড়ার কথা হচ্ছে সংযম। অনেকে মনে করেন বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মত আয়ুর্ব্বেদও বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ঋষিরা যে স্বানুভূতি ও জগতের পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন—একথা দার্শনিকগণ স্বীকার করিবেন। আত্মানুমেয় জ্ঞান যেমন বসন্তে 'নিম্বভোজনং' বসন্ত কালে নিম্ব ভোজন করিবে। কেন? এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ উত্তর আসার পূর্ব্বেই আমাদের দেশে ঘরে ঘরে নিমের ঝোল রাঁধিতে আরম্ভ করে। বসন্ত কালের কচি কচি নিম পাতা যেন সন্দেশের চেয়েও মুখরোচক হয়। কেন হয়? আত্মার প্রকৃতিগত বৈষম্য নিবারণের উপাদান সংগ্রহের জন্য নিম্ব চায়, সেই জন্য বসন্তে তিক্ত নিমও মধুর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধজ্ঞান, এই জ্ঞানই ত্রিকালে অব্যাহত আপ্ত ঋষির জ্ঞান, বিজ্ঞান এরূপ জ্ঞানের আমল দেয় কিনা জানিনা।

"জ্বরস্তু পূজনৈর্ব্বাপি সংসৈবোপশাম্যমি বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুং স্তবন নাম সহস্রেন জ্বরান্ সর্ব্বান ব্যপোহতি।

মহাদেবের পূজায় বা বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তনে জ্বর বন্ধ হইতে পারে—এরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এখনও পাওয়া যায় না বলিয়া কি আমরা ঋষির এরূপ উপদেশ শুনিব না? আয়ুর্ব্বেদে দৈব ব্যপাশ্রয় বলিয়া যে চিকিৎসা আছে, তাহার দ্বারা আমরা অনেক সময়ে অনেক রোগীর রোগ মুক্ত হইতে দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও দৈব ব্যপাশ্রয় চিকিৎসার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 'পূর্ব্ব রূপ' বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে একটী উপাদেয় রোগ জ্ঞানের উপায় আছে, যাহার দ্বারা রোগ জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব থেকে ভাবি রোগের বিষয় অবগত হওয়া যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতকালের গবেষণায় তাহার অনুসন্ধান পাইয়াছেন কি? যে মেহ রোগের প্রবল অবস্থায় প্রস্রাবের 'সুগার' দেখাইয়া তাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, ঋষিরা মেহ জন্মাইবার বহু পূর্ব্বে মুখে সুগার পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন।

দন্তাদীনাং মলাচ্যত্বং প্রাক্‌রূপং পানি পাদয়োঃ।
দাহ শ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

যে সকল চিকিৎসা-তত্ত্ব অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বাহির করিতে পারেন নাই, ঋষিরা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে সকল বিষয় যোগ বলে অবগত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির ফলে আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্ধারিত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এত দিন পরে শোথে লবণ জল নিষেধ—এই সত্যটী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাইয়াছেন। ছাগ মাংস যে যক্ষার জীবানুনাশক তাহা আবিস্কৃত হইয়াছে, ঋষিরা কি প্রকারে এই সকল সত্য অবগত হইয়াছিলেন—তাহা ভাবিলে কাহার না মস্তক আপনা থেকে ঋষিদের পায়ে নামিয়ে পড়ে। ঘরের ঝুল, বিড়ান বিষ্ঠা, নরমূত্র প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে—যাদের নাম শুনিলে ঘৃণায় আমাদের চক্ষু কপালে উঠিয়া যায়, ঋষিরা তাদের মধ্যেও জীবনী শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। অবস্থা বিশেষে ঐ সকল দ্রব্য দ্বারাও যে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন

হইতে পারে—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

গুরুজনের সম্মান রক্ষার মধ্যেও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে, তাই নিদান বলিতেছেন"প্রধর্ষনং দেব গুরু দ্বিজানাং" দেবগুরু বিপ্রের অবমান নায় উন্মাদ রোগ জন্মে। একথা কেবল ঋষির মুখেই শোভা পায়, প্রত্যক্ষবাদীরা ইহা বুঝিতে পারিবেন না।

স্বপ্নও যে ভাবি রোগের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, এ জ্ঞান একমাত্র ঋষিরাই লাভ করিয়াছিলেন।

> স্বপ্নেষু কাক শুক শল্লকী নীলকণ্ঠা
> গৃধ্রাস্তথৈব কপয় কৃকলাসকাশ্চ
> তং বাহয়ান্তি সনদী র্বিজলাশ্চ পশ্যেৎ
> শুস্কাং স্তরুন্ পবন ধুম দবার্দ্দিতাংশ্চ॥

যদি কেহ এইপ স্বপ্ন দেখে—যেন কাক শুক সজারু, ময়ুর, শকুনি, বানর ও কাঁকলাস ইহারা প্রাপ্ত হইতেছে অথবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং নদী সকল যেন জল শূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষগণ ঝড় বাতাস ধুম ও দাবাগ্নি দ্বারা যেন আকুলিত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—ঐ ব্যক্তি শীঘ্রই যক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হইবে। আয়ুর্ব্বেদের অরিষ্ট জ্ঞান কিরূপ সুন্দর একটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। কোন একজন কবিরাজ রোগী দেখিতে যাইতেছেন, আমি শিক্ষার্থীরূপে তাঁহার সহিত ছিলাম। রোগীর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গিয়া একজন পুরোহিতকে নারায়ণ হস্তে বাহির হইতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় একটু ভীত ভাবে তথায় দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহাকে এইরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী শুনাইলেন,—

> প্রবেশে পূর্ণ কুম্ভাগ্নি মৃদ্বীক্ষ ফল সর্পিষাং
> বৃষ ব্রাহ্মণ রত্নানাং দেবতানাং বিনির্গতিং
> অগ্নিপূর্ণানি পাত্রানি ভিন্নানি বিশিখানিচ
> ভিষঙ্মুমূর্ষতাং বেশ্ম প্রবিশন্নেব পশ্যতি॥

যাহা হউক রোগী দেখিয়া মৃত্যুলক্ষণ কিছুই পাওয়া গেলনা। সামান্য জ্বর হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চরকের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাও আসিল এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া কবিরাজ মহাশয় নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলেন। হঠাৎ রাত্রি ৮ টার সময় রোগীর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া বলিল, "কবিরাজ মহাশয় শীঘ্র আসুন রোগী কেমন করিতেছে।" তখন গিয়া যাহা দেখা গেল তাহাতে চরকের প্রতি অপরিসীম ভক্তি জন্মাইয়া দিল,—ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতি বহির্গমনের সহিত রোগের, রোগীর ও মৃত্যুর কি সম্বন্ধ আছে—কেনইবা তাহার অরিষ্ট লক্ষণ সূচিত করে, এ সকল কথা পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান প্রত্যক্ষের পথ দিয়া বুঝাইতে পারুক আর না পারুক, এই ব্যাপারে ঋষির অলৌকিক জ্ঞানের প্রতি আমাদের যে অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কোন যুক্তিই আমাদের সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেনা। তাই বলি বাহ্যাড়াম্বরে মুগ্ধ হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়িওনা, বিদেশী ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে ভারত তোমার জন্মভূমি, প্রাচীন আর্য্যগণ তোমারই পূর্ব্বপুরুষ—একথাটী একবার স্মরণ করিও। আর ভাবিয়া দেখিও যাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি চলিতেছ, ঋষিরা তোমারই কল্যাণের জন্য কঠোর সাধনায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

বৈদ্যের কথা।

[শ্রীভোলা পদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।]

(১)

রথযাত্রার দু'দিন বাকী;
যাত্রীরা সব পুরী চলে।
পুণ্য তা'দের বৃদ্ধি পা'বে,
শ্রীজগন্নাথ দর্শন-ফলে॥

(২)

মহেশপুরের যাচ্ছে নিতাই
বিন্দু, মাখন, সর্ব্বানী,
বিদ্যারত্ন দিচ্ছেন সাহস,
হ'য়ে সবার অগ্রণী॥

(৩)

এমন সময় মধু বৈদ্য
একটী অনাথ রোগীকে
ঔষধ-পথ্য প্রদান করি,
চলেন সবার অলক্ষ্যে।

(৪)

বিদ্যারত্ন বড়ই চতুর,
বলেন ওহে কবিরাজ!
উপার্জ্জন তো খুব ক'রেছ,
কর কিছু ধর্ম্ম কাজ।

(৫)

প্রতি বৎসর বল কেবল
হাতে এখন আছে রোগী,
পথের সম্বল চাইত কিছু,
(নচেৎ) ভুগবে শুধু কর্ম্মভোগই॥

(৬)

বৈদ্য আসি সসম্ভ্রমে
গ্রহণ করি পদধূলি।
(বলেন) আদেশ তোমার হে ব্রাহ্মণ
নিলাম আমি শিরে তুলি॥

(৭)

এবার আমার মহাভাগ্য,
পল্লীবাসী সুস্থ সবে।
দর্শন ক'রে শ্রীজগন্নাথ
জীবন আমার ধন্য হ'বে॥

(৮)

বিদ্যারত্ন পূর্ণানন্দ
হেরি বৈদ্যের ধর্ম্মমতি।
শুভক্ষণে যাত্রা করেন
উৎকলীয় তীর্থ প্রতি॥

(৯)

যথাকালে বাষ্পীয় যান
যাত্রিগণে বক্ষে ধরি'।
তুরগগতি হ'ল আসি—
প্রাপ্ত হয়ে পুণ্যপুরী॥

(১০)

পুরীর গগন সাগর তপন
আজি কেমন মধুর উজল।
গন্ধবহ মৃদুমন্দ
জল-গগনের পরাণ উতল॥

(১১)

আজি ওগো শুভক্ষণে
শ্রীজগন্নাথ জগৎ শরণ।
সসুভদ্রা বলভদ্র
কর্‌বেন ওগো রথারোহণ॥

(১২)

বিদ্যারত্ন সাথী সহ
চলেছে ঐ সসত্বরে।
বর্ত্মে তাদের একটী শিশু
যাচিছে জল করুণস্বরে॥

(১৩)

রাক্ষসী ঐ বিসূচিকা
গ্রাসি তাহার জননীরে।
করাল দৃষ্টি নিক্ষেপিছে
ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণোপরে॥

(১৪)

বিদ্যারত্ন সম্বোধিয়া
বলেন আপন সঙ্গীগণে,
"শীঘ্র চল, শীঘ্র চল
রথের ধ্বনি পাই শ্রবণে॥"

(১৫)

মধু বৈদ্য বলে "প্রভো
রথের ধ্বনি নাহি শুনি।
অনাথ আতুর মাগে ঐ জল—
বালক বলে অনুমানি"।

(১৬)

বিদ্যারত্ন বলেন "মধু,
এই কি তোমার বুদ্ধি ঘটে!
শীঘ্র চল, সময় যে যায়
ক্রোশের অধিক রাস্তা বটে।"

(১৭)

বৈদ্য বলেন,—"পাপী আমি
দেবের দর্শন হ'লনা আর।
যন্ত্রণাতে কাঁদছে বালক,
আশ্রয়ে হায় দে'ব কা'র॥

(১৮)

বিদ্যারত্ন ক্ষুব্ধ মনে
লয়ে আপন সঙ্গীগণ।
অগত্যা যে গেল চলি
যথায় রথে নারায়ণ।

(১৯)

যথাকালে মোহনবেশে
শ্রীজগন্নাথ রথোপরে,
আরোহিলেন, ভক্তবৃন্দ
হর্ষে জয়ধ্বনি করে।

(২০)

বিদ্যারত্ন নির্নিমেষে
হেরিছেন ঐ সবার আগে—
মধুবৈদ্য বসে আছে
রথেরি ঠিক পুরোভাগে॥
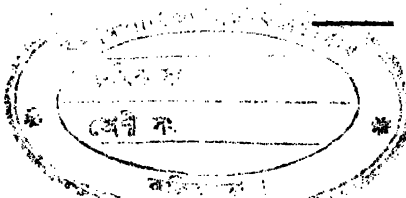
ম্যালেরিয়া।

[কবিরাজ শ্রীতারিণীচরণ সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন]

উৎপত্তি।—সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া-বিষ তৃণপর্ণাদিযুক্ত ভূমি হইতে উদ্ভূত হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ক্ষেত্রস্থ, লতা, গুল্ম, তৃণপর্ণাদি, বৃষ্টি কিম্বা নদীর বন্যাতে ডুবিয়া পচিতে থাকে এবং তৎপরে জল অপসারিত হইলে সূর্য্যের উত্তাপে এই সমুদায় গলিত দ্রব্য হইতে এই ম্যালেরিয়া-বিষ উৎপন্ন হয়; এই সময় যতই সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, ততই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ হইয়া থাকে। স্থানীয় উত্তাপ ৬০ ডিগ্রীর (ফেরেন হীট) কম হইলে, কদাচিৎ ম্যালেরিয়া-বিষ জন্মাইতে পারে। এই ম্যালেরিয়া-বিষ জলীয় বাষ্প (moisture) সাহচর্য্যে প্রসারিত হয়; জলীয় বাষ্প অতিরিক্ত হইলে, এই বিষ শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পারে না। আবার যদি এই জলীয় বাষ্প না থাকে, তাহা হইলেও ম্যালেরিয়া-বিষ জন্মাইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম তৃণপর্ণাদিযুক্ত ভূমি; দ্বিতীয় কিছুকাল স্থায়ী সূর্য্যের কিরণ; তৃতীয়, যথাপরিমাণ জলীয় বাষ্প, এই তিনটীর সমবায়ী কারণে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই বিষ নিঃশ্বাসের সহিত ফুসফুস ও পাকাশয় এবং সম্ভবতঃ লোমকূপের ভিতর দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে; পরে রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত।—১৯০০ খ্রীঃ অঃ লণ্ডন স্কুল অবট্রপিকেল ডিজিজেস (London School of Tropical Diseases) স্থির করিয়াছেন যে, এক প্রকার জীবাণু বিশেষ (parasite) এই রোগের সৃষ্টির কারণ; এই জীবাণু কোন ক্রমে মনুষ্য দেহে প্রবেশ লাভ করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। এনোফিলিস (Anopheles) জাতীয় মশক এই ম্যালেরিয়া বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করে। যে কোন কারণে এই মশককুলবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণেই ম্যালেরিয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মশককুলেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ম্যালেরিয়া জীবাণু দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে জ্বর উৎপন্ন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে; ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা জীবাণু সমূহ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে অল্প বা বহুদিনের মধ্যে পুনরায় জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এদেশে সচরাচর দুই জাতীয় মশক দেখিতে পাওয়া যায়; এক জাতীয়কে কিউলেক্স্ (culex) এবং অপর জাতীয়কে এনোফিলিস (Anopheles) কহে। এই এনোফিলিস মশকের দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু পরিপুষ্ট হইয়া ইহার মুখাভ্যন্তরে লালা-নিঃসরণকারী গ্রন্থিতে অবস্থিতি করে। এই মশকের দংশনে ম্যালে-

রিয়া জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর জাতীয় এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ; উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, কিউলেক্‌স্ দেওয়ালে বসিলে তাহার দেহের সহিত দেওয়ালের সমান্তরাল রেখা সংস্থাপন করে; কিন্তু এনোফিলিস দেওয়ালে বসিলে দেহের সম্মুখ ভাগ নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাগ উন্নত হইয়া থাকে; ইহাদিগকে স্থির জলাভূমি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে দেখা যায় এবং তথায় ইহারা বংশ বৃদ্ধি করে।

এনোফিলিস। কিউলেক্স।
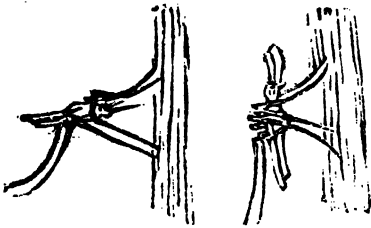
গত ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই নগরে মেডিকেল কংগ্রেসে প্রফেসার রোনাল্ড রস্ যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

Malaria is due to miasma given off by marsh; but the maisma is not a gas or vapour—it is a living insect. The germs of malaria do not live in the marsh; it is carriers of the germs which live there. The anophelines themselves are the malarial miasma.

অর্থাৎ জলাভূমি হইতে উত্থিত ম্যায়স্মাই ম্যালেরিয়ার কারণ, (ম্যায়স্মা শব্দের অর্থ বায়ুতে ভাসমান সংক্রামক বিষ); কিন্তু এই ম্যায়স্মা, গ্যাস বা বাষ্প বিশেষ নহে—ইহা জীবন্ত কীটাণু। এই ম্যালেরিয়া-বীজ জলাভূমিতে অবস্থিতি করে না, তাহাদিগের বাহকসমূহই এই স্থানে বাস করে। এনোফেলিস মশককুলই যে ম্যালেরিয়া বিষের মূলস্বরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ম্যালেরিয়া জ্বর পাঁচ প্রকার।

ইণ্টারমিটেণ্ট, এগু (Ague) বা সবিরাম জ্বর।—ম্যালেরিয়া-বিষ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার তিন সপ্তাহ মধ্যে জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু বিষ প্রবল হইলে এক বা দুই দিনের মধ্যে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে পূর্ব্বরূপের বা প্রচ্ছন্ন অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে; এই সময়ে অস্বচ্ছন্দতা অবসাদ, কোন কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা, শ্রান্তিবোধ, ক্ষুধামান্দ্য ও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় তৎপরে শৈত্যাবস্থায় পরিণত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে হস্ত পদাদিতে, পরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত শীতবোধ করে ও কাঁপিতে থাকে, শরীর বিবর্ণ হয়, এবং এই সময়ে দেহের বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি অনুভূত না হইলেও গুহ্যদেশে থার্ম্মোমিটার দিলে ১০৫ বা ১০৬ ডিগ্রী উত্তাপ লক্ষিত হয়। কটিদেশ, মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়; ক্ষুধা কিছুই থাকে না, পিপাসা অত্যন্ত অধিক ও পেটভার, জিহ্বা ঠাণ্ডা ও ভিজা থাকে ও অল্প বিবর্ণ হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় না; বমনেচ্ছা হয় অথবা বমি হয়, শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নাড়ীর গতি দ্রুত কঠিন ও বিষম হইয়া থাকে; এ অবস্থা দশ বা পনর মিনিট হইতে এক ঘণ্টাকাল।

উত্তপ্ত অবস্থা—এখন কম্প কমিয়া আসে, কিন্তু গাত্রের উত্তাপ ১০২ হইতে ৪ ডিগ্রী হয়। ত্বক ঈষৎ রক্তাভ, মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল হইয়া থাকে; পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি, মুখ শুষ্ক ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, ক্ষুধা থাকে না, বমনেচ্ছা হয় বা বমি হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসে; হৃৎপিণ্ড ও প্রধান প্রধান ধমনীসমূহ ধড়্ ফড়্ করে; বার বার মূত্রত্যাগেচ্ছা হয়, নাড়ী কঠিন, পূর্ণ ও ভার বলিয়া বোধ হয়, মস্তকে বেদনা থাকে, দপ্ দপ্ করে। কেহ কেহ ভুল বকিয়া থাকে, এ অবস্থা অর্দ্ধ হইতে তিন বা চারি ঘণ্টাকাল।

ঘর্ম্মাবস্থা—প্রথমে কপালে তৎপরে সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়; কোন কোন রোগী এত ঘামে যে বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায় এবং এক প্রকার দুর্গন্ধ (জ্বোরো গন্ধ) বহির্গত হয়। জ্বর ক্রমশঃ ত্যাগ হইতে থাকে, পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সমূহ থাকে না, রোগী সুস্থ বোধ করে এবং নিদ্রা যায়; কেহ কেহ এসময়ে অধিক পরিমাণে তরল মল মূত্র ত্যাগ করে।

বিরাম অবস্থা—অর্থাৎ একবার জ্বর ত্যাগের পর পুণরাক্রমণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জ্বরমুক্ত অবস্থাকে বিরাম অবস্থা কহে। প্রথম জ্বর ত্যাগের পর শরীর বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হয়, ক্ষুধা-নিদ্রা-বল প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে; কিন্তু পুনরাক্রমণের পর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল, বিবর্ণ, ও রক্তহীন হয়, যকৃৎ ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; নানারূপ বেদনা, অবসাদ ও অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়।

সবিরাম জ্বরের প্রকার ভেদ—

(১) **কোটীডিয়েন** (Quotidian) অন্যেদ্যুক জ্বর। অহোরাত্রে একবার জ্বর আক্রমণ করে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রায় আসিতে দেখা যায়; শৈত্য অবস্থা অল্পক্ষণ কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়। কখন কখন এক অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার জ্বর আক্রমণ করিতে দেখা যায়; ইহাকে **দ্বৈকালিক** Double Quotidian জ্বর কহে।

২ **টার্যিয়ান** Tertain বা তৃতীয়ক জ্বর, এক দিন অন্তর জ্বর আসে, আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। আর এক প্রকার জ্বর প্রত্যহ হইতে দেখা যায়, ইহাতে প্রথম দিনের জ্বরের সহিত তৃতীয় দিনের এবং দ্বিতীয় দিনের জ্বরের সহিত চতুর্থ দিনের জ্বরের সৌসাদৃশ্য থাকে; অর্থাৎ যদি কাহারও সোমবারে বেলা এগারটার সময় প্রথম জ্বর হয় এবং যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, বুধবারে ঠিক ঐ সময়ে জ্বর আসে এবং ঐ প্রকারই জ্বরভোগকাল হয় এবং বৃহস্পতিবারের জ্বর মঙ্গলবারের জ্বরের ন্যায় হইয়া থাকে। কোন কোন তৃতীয়ক জ্বরে প্রথম দিনে দুইবার এবং তৃতীয় দিনে দুইবার জ্বর হয়, মধ্য দিনে জ্বর হয় না এবং রোগী বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এই দুই প্রকার জ্বরকে দ্বিত্র্যাহিক Double Tertain কহে।

(৩) **কোয়ার্টান** (Quarrtan) বা চাতুর্থক জ্বর, প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর জ্বর আক্রমণ করে, ইহা কদাচিৎ দেখা যায়।

২। **রেমিটেণ্ট ফিভার।** (Remittent fever) **স্বল্পবিরাম বা সন্তত জ্বর।**—এই জ্বর প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৃদ্ধি বা হ্রাস অনিয়মিতরূপে হইয়া থাকে, বিরাম অল্প ও প্রাবল্য অধিককাল স্থায়ী হয়; জ্বর প্রবল হইলে বিরাম অবস্থা প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। জ্বর প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে উপর পেটে বেদনা, অবসাদ, অসুস্থতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। কাহার কাহার সর্দ্দি হয়, তৎপরে শীতবোধ হয় এবং কম্প আসে। এই শৈত্য অবস্থা অল্পক্ষণ থাকিয়া উত্তপ্ত অবস্থায় পরিণত হয়; শীঘ্র দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ হয়, দেহের জড়তা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, বমনেচ্ছা, প্রলাপ, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে ভুক্তদ্রব্য সমূহ, তৎপরে জলবৎ এবং সর্ব্বশেষে পিত্তাদি বমন করে। যে সকল রোগীর কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণের বমি হয়, তাহাদিগের এই জ্বর বিপজ্জনক। পিপাসা অধিক হয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় শুকাইতে থাকে, জিহ্বা খরস্পর্শ (কাঁটা কাঁটা বলিয়া বোধ) হয় এবং পেটভার থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, কোন কোন স্থলে প্রবল বেগবিশিষ্ট বা ক্ষীণ হয়। দৈহিক উত্তাপ ১০৫ বা ৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই সকল লক্ষণ প্রায় ছয়ঘণ্টা হইতে বারঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া কমিয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এক, দুই, তিন বা অধিক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। অল্প ঘাম হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্বর ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিতেছে। বিরাম অবস্থা অত্যল্পক্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে পুনরাক্রমণ হয় এবং পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই প্রাতঃকালে একটু জ্বরের বিরাম দেখা যায়, মধ্যাহ্নে পুনঃ প্রকোপ হয় এবং অর্দ্ধ রাত্রি হইতে জ্বর কমিতে থাকে; কোন কোন স্থলে মধ্যরাত্রে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। প্রবল জ্বরে দুইবার (মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে) প্রকোপ অনুভূত হয়। যকৃৎ, প্লীহা বেদনাযুক্ত ও বর্দ্ধিত হয়, এই জ্বর কিছুকাল স্থায়ী হইলে চক্ষু ও ত্বক হরিদ্রাবর্ণ হয়, ইহার ভোগ কাল পাঁচদিন হইতে প্রায় চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত। ইহার পরিণাম—(১) সচরাচর অধিক ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়, কোনও কোনও স্থলে অল্প ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমশঃ জ্বর ত্যাগ হয়, (২) অধিকাংশ স্থলে পুরাতন জ্বরে পরিণত হয়, (৩) অত্যধিক দুর্ব্বল ও রক্ত বিষাক্ত হইয়া কতিপয় রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩। **পার্নিসস** (Pernicicus) **বা ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর।**—এই প্রকার জ্বর অতিশয় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রথমে সামান্য জ্বর হইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে কোন কোন দিন প্রবল জ্বর হয়। প্রত্যেক পক্ষে, মাসে কিম্বা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় জ্বর হইয়া থাকে এবং ইহার শৈত্য, উত্তাপাদি অবস্থা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না; কোনও কোনও স্থলে বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারা যায়। এই জ্বর কখন কখন আক্রমণের প্রথম হইতে হয়।

ইহার প্রকার ভেদ—

(১) **নার্ভাস** (Nervous বা

স্নায়বিক—এই জ্বর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং এ দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অত্যন্ত ভুল বকে, গাত্র ঘর্ম্মহীন, শুষ্কবৎ এবং অধিক উত্তপ্ত হয়, কখন কখন আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হয়; রোগী হঠাৎ পড়িয়া যাইতে পারে এবং সাধারণতঃ অজ্ঞান হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বার ঘণ্টা হইতে চব্বিশ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে; যদি প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে চৈতন্যলাভ হয়, তাহা হইলে জীবনের আশা করিতে পারা যায়, কিন্তু পুনরাক্রমণে সে আশা থাকে না।

অ্যাল্‌জিড্ (Algid)—এই জ্বরে পাকাশয় ও অন্ত্র সমূহের অর্থাৎ পেটের দোষ ঘটিয়া থাকে; প্রথম হইতে বমি, পেটে বেদনা, তরল মলভেদ, কখন কখন আমাশয় রোগ হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। এই জ্বরে রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করে এবং গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক বা তদপেক্ষা, হ্রাস হয়; কিন্তু মলাশয়ের উত্তাপাধিক্য হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও সামান্যরূপ অনুভূত হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়; মূত্র অল্প পরিমাণে হয় অথবা বন্ধ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থা কতিপয় দিন পর্য্যন্ত থাকে; এ সময় জ্বর বৃদ্ধি হয়; কখন কখন কামলা (ন্যাবা) অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হয়, উদরাময় ও বায়ুবিকার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়, অবশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(৩) হিমোরেজিক (Hæmorrhagic)—এ প্রকার জ্বরে নাসা ও মলদ্বার হইতে, এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয়, এমন কি কোন কোন রোগীর লোমকূপ দিয়া রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, এ পীড়া সাংঘাতিক। হিমোগ্নোবিনিউরিক (Hœmoglobinuric Fever) কিম্বা ব্লাক ওয়াটার (Black watet Feves জ্বর বা কালা জ্বর অস্মদ্দেশে আসাম, টেরাই প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জ্বরের ন্যায় ইহার আক্রমণ, দৈহিক উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সঙ্গে সঙ্গে কম্প আসে এবং বমির সহিত পিত্ত নির্গত হয় ও পিত্তমিশ্রিত তরল মলভেদ হয়, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা হয় এবং তাহা কৃষ্ণ রক্তাভ হয়, এবং মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ বশতঃ কোমরে বেদনা হয়। যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং চক্ষু ও ত্বক্ অল্প হরিদ্রাভ হয়। জ্বরত্যাগ হইলে এ সকল লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু পুনরাক্রমণে আবার দেখা যায়। এই দুঃসাধ্য রোগে মূত্রাবরোধ, আক্ষেপ অথবা সংজ্ঞানাশ হইলে রোগী প্রাণত্যাগ করে।

৪। মাস্কড্ ইণ্টারমিটেণ্ট Masked Intermittent —এই প্রকার জ্বর অতি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে, জ্বর বুঝিতে পারা যায় না, তৎপরিবর্ত্তে অন্য লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। ইহা অধিককাল স্থায়ী ম্যালেরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন হয়; রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সময়ে সময়ে অস্বচ্ছন্দতা ও স্থানে স্থানে বাতিক বেদনা অনুভব করে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে ও জঙ্ঘাদেশে S§iatica চর্ম্মরোগে বিশেষতঃ হার্পীজ Herpes রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উদরাময় প্রভৃতি শ্বাসরোগে, দৃষ্টিশক্তির দোষ অথবা দৃষ্টিলোপ' শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, মধ্যে মধ্যে রক্ত

নির্গমন, পক্ষাঘাত, আক্ষেপাদি উপসর্গ দৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। **ম্যালেরিয়েল ক্যাকেক্সিয়া** (Malarial Cachexia)—অধিক দিন পুনঃ পুনঃ সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে ভুগিলে ম্যালেরিয়েল ক্যাকেক্সিয়াতে পরিণত হয়; সুতরাং ইহা পুরাতন রোগের এক প্রকার অবস্থান্তর মাত্র, ও অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশে দেখা যায়; ইহার প্রধান লক্ষণ রক্তহীনতা, ত্বকের কৃষ্ণ হরিদ্রাভ বর্ণ (হলীমক), প্লীহার কাঠিন্য ও সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে বড় হয় এবং রক্তহীনতাবশতঃ পদদ্বয়ের গাঁইট দুইটী ফুলিয়া থাকে এবং সচরাচর অনিয়মিত রূপে জ্বর হইতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে অন্যান্য দৈহিক পরিবর্ত্তন—

(১) **রক্ত।**—ম্যালেরিয়া জীবাণু কর্ত্তৃক রক্ত শীঘ্র দূষিত হইয়া থাকে, অথবা বহুদিন এই জ্বর ভোগ করিলে রক্ত দূষিত হয়। এ অবস্থায় রক্তে জলীয় পদার্থ অধিক, রক্তের লালকণিকা নষ্ট, এবং বর্ণ্যদ্রব্য (Pigment) প্রস্তুত হওয়ায় রক্তহীনতা বা পাণ্ডুরোগ (Anæmia) উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ অত্যধিক রক্তহীন হইলে তৎসঙ্গে কামলা রোগ (Jaundice) বা ন্যাবা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন যন্ত্রের কৈশিক শিরাসমূহ এই সকল জীবাণু দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও আবদ্ধ হয়। শরীরে নানাস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে পারে, তাহা প্রায় সাংঘাতিক হয়।

(২) **প্লীহা।**—ইহা সচরাচর বা শুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়, জ্বরের প্রথম অবস্থায় সামান্য বা বিশেষরূপে বড় হইতে দেখা যায়। সবিরাম জ্বরে, জ্বরত্যাগ কালে, ইহার আয়তন কমিয়া যায়, কিন্তু পুনরাক্রমণে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন প্লীহার অভিবৃদ্ধি হয়, তখন আকারে বৃহৎ ও কোমল হয়, এইরূপ প্লীহা সামান্য আঘাতে ফাটিয়া যাইতে পারে। এই সুবৃহৎ প্লীহা নিয়মিতরূপ সুচিকিৎসায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ জ্বর আক্রমণে ও অধিককাল ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে বাসহেতু ইহা চিরস্থায়ী ভাবে বৃহৎ ও কঠিন হইয়া যায়।

(৩) **যকৃত।**—প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাদৃশ নহে। সাধারণতঃ সবিরাম জ্বরে প্রথমে কোনরূপ যান্ত্রিক বৈলক্ষণ্য ঘটে না; কিন্তু পার্ণিবস্ জ্বরে সুবৃহৎ এবং পৈশিক শিরা সমূহ বর্ণ্যদ্রব্য সংযুক্ত রক্ত কোষ সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। পুরাতন রোগে যকৃৎ চিরস্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, অত্যন্ত কঠিন ও বর্ণ্যদ্রব্য সংযুক্ত হয়, ইহার কারণ এই সকল বর্ণ্যদ্রব্য (pigment) প্রদাহ উপস্থিত করিয়া ইহাকে সঙ্কোচক পরিবর্ত্তনে (cirrhosis) আনয়ন করে।

(৪) **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রযন্ত্র জ্বরে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রবল রোগে ইহাদের কৈশিক শিরাসমূহের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পুরাতন রোগে ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণ্যদ্রব্য যুক্ত হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই সকল বর্ণ্যদ্রব্য মূত্রযন্ত্রস্থ কোষ ও নল সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবল জ্বরে সচরাচর

মুত্রযন্ত্রের প্রদাহ হইয়া থাকে, কিন্তু সামান্য জ্বরে কদাচিৎ হয়। পার্ণিবস ম্যালেরিয়াতে যে রক্ত প্রস্রাব হয়, তাহা মুত্রযন্ত্র হইতে নির্গত হয়।

(৫) ফুস্ ফুস্।—শ্বাসনলীর সামান্য প্রদাহ হয়, সে কারণ সর্দ্দি, কাস এই জ্বরের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়; চিকিৎসাবিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে, নিউমোনিয়া নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়ার সহিত প্রায়ই দেখা যায়, সে কারণ এই প্রকার নিউমোনিয়াকে ম্যালেরিয়া-দুষ্ট বলিয়া বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়ার উপসর্গ মাত্র, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশবাসী হঠাৎ শীতপ্রধান দেশে আসিলে প্রায়ই নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে অধিকাংশ বিষয় বর্ণিত হইল; এখন কোন্ কোন্ স্থানে এই রোগের প্রকোপ হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে —(১) যে সকল জলাভূমি সর্ব্বদা জলে প্লাবিত থাকে না; (২) গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষাদি বহুল উপত্যকা, পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নদেশ সমূহ এবং নদীখাত ও যে সকল নদীতট বন্যায় নীত পলিমাটী ও বালুকারাশির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং কখনও কখনও বন্যায় প্লাবিত হয়, (৩) তৃণ পর্ণাদি সঙ্কুল ভূমি যাহা কখন কখন বন্যায় বা বৃষ্টির জলে ডুবিয়া যায় এবং জল নির্গত হইলেও আর্দ্র থাকে; (৪) যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী বা হ্রদের জল বহির্গত হয়; (৫) জৈবপদার্থবিশিষ্ট বালুকাময় সমতল ভূমি যদি তাহার নিম্নে মৃত্তিকাস্তর থাকে (৬) যে সকল স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার নিমিত্ত বনজঙ্গলাদি ছেদন করিয়া উহা স্তূপীকৃত করা হয় ও পচিতে থাকে। (৭) যে স্থানে খাল (canal) কাটান হয় কিম্বা রেলওয়ের মাটীর কাজ হয়। (৮) গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ বদ্বীপ সমূহ—যথা গঙ্গার বদ্বীপ (Gangetic Delta)।

গ্রীষ্মের অবসানে ও বর্ষার প্রারম্ভে এই রোগের প্রকোপ অনুভূত হয় এবং হেমন্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে, (অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত); শীতকালে ইহার প্রকোপ কমিয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ম্যালেরিয়া-বিষ দমনে সমর্থ, কারণ ইহা বিষ শোষণ করিয়া লয়; সে কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টি কিম্বা প্রবল বন্যা হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকাংশে কম হয়।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলে অনেকাংশে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়;—

১। **সর্ব্বাগ্রে মশক-দংশন হইতে শরীরকে রক্ষা করিবেন।** দেহ সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখা এবং রাত্রিকালে মশারি খাটাইয়া শয়ন কর্ত্তব্য। কৃষক ও কুলী মজুরগণকে (বিশেষতঃ মাঠে কার্য্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে) বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল মাখিতে উপদেশ দিবেন। যেখানে এই প্রকার তৈলের অভাব, তথায় তার্পিন তৈল (এক তোলায় ত্রিশ ফোঁটা তার্পিন) সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। কেরাসিন কিম্বা তার্পিনতৈল মশক

ষ্ট স্থানে কিয়ৎক্ষণ ঘর্ষণ করিলে ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হইতে পারে।

সম্প্রতি বোম্বাই নগরের মেডিকেল কংগ্রেস, ম্যালেরিয়া দমনার্থে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়াছেন (১) মশককুলের সংখ্যাহ্রাসকরণ; (২) মনুষ্যদেহস্থ জীবাণু কুইনাইন * সেবন দ্বারা ধ্বংসকরণ; (৩) অন্যান্য উপায় অবলম্বন, যথা সুক্ষ্মতার নির্ম্মিত জাল দ্বারা গৃহপথাদি আচ্ছাদন, রোগীকে পৃথক করণ, সাধারণ লোকের ম্যালেরিয়া বিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। পয়ঃ প্রণালী দ্বারা আবদ্ধ জল সমুহ বহিস্কৃত করিয়া দিলে, মশককুলের সংখ্যা অনেকাংশে কম হইতে পারে; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য, সে কারণ সহর অঞ্চলেই এ সকল ব্যবস্থা চলিতে পারে; গ্রামালোকদিগের মধ্যে কুইনাইন বিতরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

২। রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষের প্রকোপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময় গৃহ হইতে বহির্গমন ও অনাবৃত অবস্থায় থাকা উচিত নয় এবং লঘু ও সুপাচ্য আহার কর্ত্তব্য। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, বর্ষা শেষে, শরৎ ও হেমন্ত কালে সন্ধ্যার পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভূমির দশ বা বার ফিট উর্দ্ধদেশ, কুয়াসার ন্যায় এক প্রকার বাষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, এবং ইহা চন্দ্রালোকে সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হয়; ইহা ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ বাষ্পরাশি। এই বাষ্পরাশি অধিক উর্দ্ধে প্রসারিত হইতে পারে না এবং বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্য দিয়া গমন কালে নাসাপথ দ্বারা শরীরের মধ্যে বিষ প্রবেশ করিতে পারে; সুতরাং এই সময় নাসিকা ও মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া গমনাগমন কর্ত্তব্য। দ্বিতল গৃহে শয়ন করিলে ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ বাষ্প হইতে অনেকাংশে রক্ষা করা যাইতে পারে।

৩। পানীয় জলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। ম্যালেরিয়া প্রকোপ কালে পরিস্রুত জল ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। অতি সহজ উপায়ে জল পরিস্রুত করা যাইতে পারে, যথা—কলসী বা হাঁড়ি কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রাখিয়া উপর উপর সংরক্ষিত করিতে হয়; সর্ব্বোপরি পাত্রে তৃতীয়চতুর্থাংশ কাষ্ঠের কয়লা দ্বারা পূর্ণ ও তন্নিম্ন পাত্র ঐ রূপে বালি দ্বারাপূর্ণ করিতে হয় এবং সর্ব্বনিম্ন পাত্রের মুখকাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হয়, প্রথম দুইটী পাত্রের নিম্নে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিবে। প্রথমে কয়লার পাত্রে ফুটিত গরম জল ঢালিয়া দিবেন, ঐ জল ক্রমশঃ চোঁয়াইয়া বালির পাত্রে পড়িবে, এবং তাহা হইতে, তৃতীয় পাত্রে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে; এই তৃতীয় পাত্রের জলই পরিস্রুত জল, ইহা নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। কলেরার প্রকোপ কালে এই প্রকার জল ব্যবহার করা উচিত। যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে আয়াস বোধ করেন, তাঁহারা ফুটিত গরম জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন; এই জল বার ঘণ্টা

* আয়ুর্ব্বেদের মতে কিন্তু কুইনাইন অপেক্ষা হরিতাল ঘটিত ঔষধ কম নহে, এজন্য এরূপ অবস্থায় আমরা হরিতাল ঘটিত ঔষধ ব্যবহারেরই পরামর্শ দিতেছি।

—আং সং

কাল ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহার পর দূষিত হয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ একটী ফিল্টার দ্বারা অনায়াসেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

স্রোতস্বতী নদীতে, পরিষ্কার জলে অথবা গরম জল শীতল করিয়া স্নান করা উচিত; যে স্থানে বিশুদ্ধ জলের অভাব, গৃহস্থ মাত্রেই কূপ খনন করাইয়া তাহার জলে স্নান পান ও রন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন; কারণ ইহার জল বাহিরের সংক্রামক দোষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কূপখনন ও স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উপদেশ।—(১) সমতল স্থান অপেক্ষা একটু উচ্চস্থান; (২) পাইখানা বা নর্দ্দমা নিকটে না থাকে; (৩) বৃক্ষাদির তলদেশে না হয়। প্রত্যেক কূপ দোহারা পাটের (অর্থাৎ বড় পাটের মধ্যে ছোট পাট বসাইয়া) নির্ম্মাণ করা উচিত; এবং এই দুই পাটের ব্যবধান, কেবল মাটী দিয়া ভরাট না করিয়া ঘুটিঙ ও বালি মিশ্রিত করিয়া ভরাট করিলে জল অতি নির্ম্মল হয়।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ, পুষ্করিণী বা দীঘি খনন বা সংস্কার করাইবেন এবং ইহার জল কোন প্রকারে দূষিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ইহার চতুষ্পার্শ্ব এরূপ ভাবে সুরক্ষিত করা আবশ্যক—যেন বাহিরের ময়লা জল প্রবেশ করিতে না পারে। সন্নিকটস্থ বৃক্ষাদি ছেদন করা উচিত, কারণ ইহাদের পত্রাদি জলে পড়িয়া পচিতে পারে; নচেৎ পুষ্করিণী জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। প্রত্যেক গ্রামে, অন্ততঃ একটী স্বতন্ত্র পুষ্করিণী পানীয় জলের নিমিত্ত রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে স্নান, কাপড় ধৌতকরণ, ইত্যাদি উচিত নহে; কেবল জল তুলিয়া ব্যবহার করা হইবে।

৪। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের খিড়কীতে প্রায়ই একটী পচা পুকুর বা ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলির সংস্কার বা ভরাট করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সেই সকলই ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধান স্থান; যাঁহারা এই সকল ভরাট করিতে স্বার্থের হানি বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহাতে অধিক পরিমাণে উকল ("তে-চোখো" বা "পাঁচ-চোখো") এবং চেলামাছ জন্মাইতে পারে—তাহার বন্দোবস্ত করিবেন।

Bengal Fisheries,—Commissioner's Report—These fish (three-eyed or five-eyed) cat up the larvœ both of culex and anopheles mosqitoes with great avidity and if proper attention be giveh to them they may serve the same purpose here for both culex and anopheles &.................…

সরকারী মৎস্য বিভাগীয় কমিসনারের মন্তব্য:—এই সকল (তেচোখো ও পাঁচ-চোখো) মৎস্য এনোফিলিস ও কিউলেক্স জাতীয় মশক সমূহের সদ্যঃ প্রসূত দিগকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে, এবং যদ্যপি ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকাংশে ম্যালেরিয়া-বাহক মশকদিগের সংখ্যা হ্রাস করা যাইতে পারে।

৫। গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টি কিম্বা বন্যার জল শীঘ্র বহির্গত হইয়া যায়

তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, এই জল অবরুদ্ধ থাকিলে ম্যালেরিয়া প্রকোপের সহায়তা করে। জলাভূমি এবং যে সকল স্থানের জল বহিষ্করণের উপায় না থাকে, সেই জলে কেরোসিন তৈল নিক্ষেপ করিয়া ম্যালেরিয়া-বীজ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু সাবধান থাকিবেন—যেন কোন গৃহপালিত পশ্বাদি ইহা পান করিতে না পারে।

৬। গৃহাদি সমতল অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চস্থানে নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভাল হয়; এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি শুষ্ক থাকে বা জল দাঁড়াইতে না পারে—এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন। গৃহ মধ্যে রীতিমত আলোক ও বায়ু আগমনের পথ রাখিবেন।

৭। শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম প্রত্যহ করা উচিত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শীঘ্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় না।

৮। যাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে নূতন আগমন করেন, স্থানীয় লোক অপেক্ষা তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ স্থানীয় লোকদিগের জল বায়ু এক প্রকার সহ্য আছে, আগন্তুক ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে বিশেষরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভুগিয়া থাকেন।

কালাজ্বর।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

—:o:—

পূর্ব্বে Malariaর তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট এবং ইহারই অবস্থান্তরভেদে যে জ্বর Malarial cachexia বলিয়া অভিহিত হইত ও যাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় তাৎকালীন যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য্যকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ নিজেদের দেশীয় ঔষধের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া অধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগের উপদেশ দিতেন, —সেই জ্বর আজ আবার Malaria হইতে পৃথক রোগ বলিয়া দেশের প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ কর্তৃক অভিহিত হইতেছে। এখন তাঁহাদের মতে ইহা Malaria হইতে একটী স্বতন্ত্র ব্যাধি। Malaria রোগে যে জাতীয় বীজাণু রক্তে পরিদৃষ্ট হয়, এই জ্বরে তজ্জাতীয় বীজাণু দেখা যায় না। ইহার বীজাণু স্বতন্ত্র এবং তাহাকে Laishman Donovan bodies বলে। কুইনাইন এই সকল Parasitesএর উপর কোন কার্য্য করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই এই জ্বর উৎপন্ন হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে Malariaর পুরাতন অবস্থায় ঐ বীজাণুগুলি শরীরের

ভিতর প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করে; তখন Malariaর বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া সেই Malaria এই জ্বরে পরিণত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, Malaria এবং কালাজ্বরের উভয় জাতীয় বীজাণুই একত্র (side by side) অবস্থান করে।

এই জ্বরকে তাঁহারা Black Fever কহেন। Black Fever কথাটী বাংলা "কালাজ্বরের" ইংরাজী অনুবাদ।

"কালাজ্বর" কথাটী উর্দ্দু—কালা (deadly) এবং আজর্ (পীড়া) হইতে উৎপন্ন; কিম্বা এই রোগে রোগীর বর্ণ কাল হয় বলিয়া কালা (Black) এবং আজর্ (পীড়া) কহে Leishman সাহেব এই রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহার অপর নাম 'Leishmaniasis'

এই রোগের চিকিৎসায় এ কাল পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কারণ কুইনাইন এ ক্ষেত্রে কোনই কার্য্য করে না। তাঁহারা কুইনাইন খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া রোগীর শেষ করিয়া ছাড়িতেন।

পাশ্চাত্য দেশে Antimony লইয়া যে পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহার ফলে রুসিয়ার Martin & Laboeuf ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে Trypanosomiasis রোগে Tartar Emetic প্রয়োগ (Intravenous) করিয়াছিলেন। Vianna and Machado ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে ইটালীদেশে 'American Muco cutaneous Leishmaniasis' রোগে Antimony প্রয়োগ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে caronia and Dicristina ইটালীতে Infantile Kala Azar এ ইহার Injection প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সংবাদ অবগত হইয়া জুলাই মাসে Sir Leonard Rodgers কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে, অক্টোবর মাসে কলিকাতার School of Tropical Medicine এ E. Muir এবং ১৯২০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে শিলংস্থিত Pasteur Instituteএ Knowles কর্তৃক কালাজ্বরের রোগীর উপর এই ঔষধের Intravenous Injection পরীক্ষিত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে এই Injection চলিয়া আসিতেছে।

ডাক্তারগণ বলেন যে, কালাজ্বরে রোগীর অঙ্গুলির রক্ত পরীক্ষা করিলে রোগ অনেক সময় সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় না। প্লীহা কিম্বা যকৃৎ Puncture করিয়া রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু প্লীহা বিদ্ধ করিয়া রক্ত পরীক্ষা অতি বিপজ্জনক এবং অনেক সময় চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বেই পরীক্ষার মহিমাতেই রোগী প্রাণত্যাগ করে।

বর্ত্তমানে ইহাই যখন স্থির সিদ্ধান্ত, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী ডাক্তারগণ কি জন্য এই রোগকে Malarial cachexia বলিতেন এবং কেনই বা ইহাতে অত্যধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত—এবম্প্রকার উপদেশ দিতেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন; এখন আবার তাঁহারাই বলিতেছেন,—Antimony salts এর Injection ভিন্ন আরোগ্য হয় না। আবার কিছুকাল পরে তাঁহারা কোন্ তথ্য আবিষ্কার করিবেন তাহা ভগবান্ জানেন।

তখনকার দিনের ডাক্তারগণ যেমন আয়ুর্ব্বেদের মুণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে এই রোগে

কুইনাইনকে সারাৎসার ও পরাৎপর বলিয়া প্রচার করিতেন, এখনকার দিনের ডাক্তারগণ আবার Antimony Injectionকে ঠিক সেই রকম মনে করিতেছেন।

Dr. Rodgers কিম্বা Dr. Muir—ইঁহাদের কথা ধরিনা, কারণ যদিও তাঁহারা এদেশে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা বিদেশী, নিজেদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া এ দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ সমূহ যে পরীক্ষা করিবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না। কিন্তু এ দেশীয় লোক যাঁহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজেদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকলের সুফলতা উপলব্ধির করিবার চেষ্টা না পাওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহাদের নিকট এরূপ আশা করিতে পারি। মাইকেলের ভাষায় আমরা তাঁহাদিগকে বলি—

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?"

কিন্তু তাঁহারা কি ইহা করিবেন?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারগণ পাশ্চাত্যভাবেই মজগুল্। যদিও ইঁহাদের মধ্যে ২।১ জন আয়ুর্ব্বেদে প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তথাপি বাল্যকাল হইতে আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতে সাহসী হন না। তাঁহাদের পাশ্চাত্য প্রীতি এত অধিক যে, তাঁহারা দেশীয় পথ্য পর্য্যন্ত রোগীকে ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। দেশ-নায়ক, খোদার বান্দা মহম্মদ আলী একবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে, বৎসরে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার যে বিদেশী ঔষধ ও পথ্য এদেশে আমদানী হয়, প্রধান প্রধান ডাক্তার গণ হইতে সাধারণ কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত সকলেই তাহার দালাল। তাঁহারা নিজেদের লক্ষ্মী, এই ভাবে পায়ে ঠেলিতেছেন, কিন্তু ইহার যে পরিণাম কি—একবারও ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহাদের এমনই পাশ্চাত্য-প্রীতি যে মায়ের সুরন্ধিত অন্ন অপেক্ষা পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টে অধিকতর আশক্তি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শিক্ষার প্রচলন হয়। কিন্তু কই আজ পর্য্যন্ত এমন কোন চিকিৎসকের আবির্ভাব হইল না—যিনি চিকিৎসা, জগতে কোন নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিদ্যা ধার করা এবং আয়ুর্ব্বেদের কুৎসা রটান। আজ-কাল কালাজ্বরে তাঁহারা যে Antimony Salts এর Intravenons Injection দিতেছেন, তাহা বড়ই বিপজ্জনক। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী স্থল দেখান যাইতেছে।

১। Antimonyর Intravenons Injection দেওয়া কালে যদি কোনও কারণে ঔষধ একটুও শিরার বাহিরে লাগে, তবে সেই স্থান পাকিয়া পূঁয় ও ক্লেদ উৎপন্ন হয় এবং রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। শিরায় বায়ু প্রবেশ করিলে আরও বিপদ, তাহাতে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুরই সমধিক সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ডাক্তার বাবুদের অসতর্কতার জন্যই উক্ত বিপদ ঘটিয়া থাকে এবং অস্থির প্রকৃতির লোক বিশেষতঃ চঞ্চল বালকবালিকার শরীরে ইহা প্রয়োগ করা একপ্রকার অসম্ভব।

২। রক্ত তাহার স্বাভাবিক গতি লইয়া চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে দ্রব পদার্থ শিরার ভিতর প্রবেশ করাইলে রক্তের গতি এবং স্বভাব ব্যাহত হয়। সুতরাং Injectionএর ফলে শরীরে যে ঝাঁকানি লাগে, তাহাতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই কাসিতে কাসিতে রোগীর দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়, চক্ষু লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং রোগী বমন করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে গর্ভিণী ও কোমল প্রকৃতি লোকের শরীরে Injection দেওয়া চলে না।

৩। কালা জ্বরে অত্যন্ত রক্তহীনতা উপস্থিত হয়। সেই জন্য রক্ত সঞ্চালনী যন্ত্র সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। Antimony Salfsএর স্বভাব এই ইহা Blood Pressure কমাইয়া দেয়, সুতরাং যেখানে Blood Pressure কমিয়া আইসে, সে স্থলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ অপকার সাধিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহার Injection লইতে থাকিলে Fatty Degeneration of the Heart হইয়া থাকে।

৪। ইহা ফুস্‌ফুস্‌, শ্বাসনলী এবং পাকস্থলীর উগ্রতাসাধক (Irrifant) বলিয়া যেখানে কালাজ্বরের উপদ্রবরূপে Pneumonia, Bronchitis, Broncho Pneumonia, আম অতীসার (Dysentry) এবং অতিসার বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে ইহা প্রয়োগ করা চলে না।

৫। ইহার Injection লইলে রোগীর প্রথম প্রথম অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সেই সময় যদি রোগী ক্ষুধার তাড়নায় আহার করে, তাহা হইলে প্রবল অতীসার আইসে।

৬। মাত্রা নির্দ্ধারণ ইহার আর একটী গুরুতর ব্যাপার। সামান্য মাত্রাধিক্য ঘটিলেই ইহার দ্বারা শারীরিক যন্ত্রগুলি অনাবশ্যক ভাবে উত্তেজিত হইয়া থাকে ও নানাপ্রকার উপসর্গ আনয়ন করে।

৭। Injection লইতে আরম্ভ করিলে কালাজ্বরের বীজাণুগুলিকে হীনবল করিয়া রক্ত হইতে সরাইয়া দেয় এবং বীজাণুগুলি তখন মজ্জা প্রভৃতি আভ্যন্তর ধাতু আশ্রয় করে। এই জন্য রোগী প্রথম প্রথম কতকটা সুস্থতা বোধ করে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ Injection লইতে থাকিলে বীজাণুগুলি Injection-সাত্ম্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে হেত্বন্তর সেবন জন্য কিম্বা কালপ্রভাবে লব্ধবল হইয়া পুনর্বায় রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে রোগের পুনরাক্রমণ আনয়ন করে। তখন Injection দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যায় না।

৮। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দীর্ঘকাল কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া রোগীর বৃক্কের প্রদাহ (Injlammation of Kidneys) উপস্থিত হয়। অনেকে বলেন ইহা Antmony Iujectionএর ফল। এই সকল কারণে এই Injection দুর্ব্বল এবং কোমল প্রকৃতি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ডাক্তারগণ বলেন, Antimony Injection কালাজ্বরের বিশিষ্ট ঔষধ (Specifie), যদি তাহারই হয় তবে রোগীর আরোগ্য লাভ করিতে এত বিলম্ব

হয় কেন? ৩২টী Injectionএর কমে কোনই ফল হয় না—ইহাই তাঁহাদের অভিমত অধিকন্তু প্লাগা প্রভৃতি কমাইবার জন্য T. C. C. O. (Terpentine, creosote camphor of oline oil) র Intramuscnlar Intramuscnlar Injectionএর প্রয়োজন হয় কেন?

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।—কলিকাতা এবং মফঃস্বল—বাঙ্গালার সকল স্থানের স্বাস্থ্যই এবার অনেকটা ভাল বলিতে পারা যায়। এসময় শরৎকালে জগন্মাতার আগমনের সময় মফঃস্বল বাসী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর প্রপীড়নে যে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, এবার অনেক স্থানেই তাহার কথা শুনা যাইতেছে না। তবে বলা যায় না ইহার পর কি হইবে।

ডেঙ্গু জ্বর।—এবার ম্যালেরিয়া কম থাকুক, ডেঙ্গু জ্বরটা কিন্তু বাঙ্গালা জুড়িয়া অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ একটু বেশী। এই ডেঙ্গু জ্বরের আকার এক জাতীয় ও নহে,—নানা মূর্ত্তিতে এই জ্বর দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তবে এই জ্বরে মৃত্যুর পরিমাণ কম—এই যা মঙ্গল।

মায়ের পূজা।—বিশ্বমাতার পূজার আয়োজনে আগে যেরূপ দেশের সমগ্র অধিবাসীর মনেই একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যাইত, এবার তাহা বড় লক্ষিত হইতেছে না। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ দেশবাসীর দারুণ অর্থাভাব। বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল নাই, মনে শান্তি নাই, প্রাণে সুখ নাই, আগের মত বাঙ্গালী পূজার উৎসবে মাতিবে কেমন করিয়া! রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা, সর্ব্বাপেক্ষা অর্থের জ্বালাই বাঙ্গালীর এখন যে প্রবল, বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল আসিবে কোথা হইতে! হৃদয়ের বল না থাকিলে মনের স্বস্তি অসম্ভব। দাও মা দুর্গতি হারিণী অন্নপূর্ণা জননী আমার! বাঙ্গালীর সকল দৈন্য অপনোদন করিয়া তাহাকে দু'বেলা দু'মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে দাও, সারা বৎসর পরে তোমার পূজায় ভক্তি অর্ঘ্য প্রদানে সে আত্মহারা হইবে।

পূজার বাজার।—অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পূজার বাজারেও যেন লোক জমিতেছে না। ক্রেতা নাই, অনেক বিক্রেতাই কেবল বিপণী সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেছে। বড় বড় কাপড়ের দোকানে অন্যান্য বৎসর ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেরূপ কাপড় কেনা শক্ত হইত, এবার সে গণ্ডগোলই নাই। ফলে এবৎসর দারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতায় অনেক বিক্রেতাকেই বিষম চিন্তায় কাটাইতে হইতেছে। শুধু কাপড়ের দোকান নহে, মনোহারি দোকান, পুস্তকের দোকান—সকলের অবস্থাই প্রায় একরূপ।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩৩০ সাল। | ২য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:*:—

কালের কুটিল আবর্ত্তনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উত্থান ও পতন যতই হইতে থাকুক,—এ চিকিৎসার মূলে যে দৈবীশক্তি নিহিত রহিয়াছে—তাহা অবিসম্বাদিত সত্য কথা। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ হইতে এই চিকিৎসা উদ্ভূত হইয়াছিল। এজন্য দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী আমাদের রুচি বিপর্য্যয় ঘটিলেও, এ চিকিৎসার অস্তিত্ব লোপ কখনই হইতে পারে না। ঋষিযুগে এ চিকিৎসার গৌরব বিলক্ষণ বৃদ্ধি, পাইয়াছিল তখন অন্যবিধ চিকিৎসা আবিষ্কৃতও হয় নাই। আর্য্যঋষি ইন্দ্রের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যবাসী জীবদিগকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টার সাফল্য-সাধন বিশেষ ভাবেই হইল। সমগ্র জগদ্বাসী তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইল। আর্য্যঋষির অমূল্যরত্ন চরক ও সুশ্রুত—আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইল। আরবীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ ইহা ভাষান্তরিত করিলেন। গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইল। গুড় বল, মিছরি বল—সকল বিষয়েরই মূলে যেমন একমাত্র ইক্ষু রসই নিহিত, অ্যালোপ্যাথি বল, হোমিওপ্যাথি বল—আর হাকিমিই বল—সকলেরই মূলে কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদরূপ ইক্ষু রসই নিহিত রহিয়াছে। এই রসকে যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন, সেই ভাবে ভিয়ান করিয়া নানাবিধ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ভিয়ান করিতে গিয়া মূল পদার্থের রূপান্তর করিবার ব্যবস্থায় হয়তো গুণ, বীর্য্য, বিপাকের কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। মিছরি ভিজান জল ও মিছরি ভিজান জলকে পাক করিয়া গাঢ় করিলে উভয়ের মধ্যে যেরূপ গুণের তারতম্য ঘটিয়া

থাকে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমগ্র চিকিৎসার মূল ভিত্তি হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সহিত অন্যান্য চিকিৎসার এইজন্য সময় সময় গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কালমেঘের তরল সার ও কালমেঘের পাতার রস ; অশোকছালের কাথ এবং এক্সট্রাক্ট অশোক, ধুতুরার পাতার রস ও এক্সট্রাক্ট বেলাডোনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা—কোনো দ্রব্যের স্বরস, কাথ এবং এক্সট্রাক্টে বিস্তর প্রভেদ। কেহ ইচ্ছা করিলে একই রোগাক্রান্ত দুইটি রোগীকে স্বরস, কাথ এবং এক্সট্রাক্টের বিভিন্নভাবে প্রয়োগে কিরূপ ফল হয়—দেখিতে পারেন,--আমরা ইহা বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্সট্রাক্ট অপেক্ষা স্বরস বা কাথে সত্যই অনেক অধিক উপকার পাওয়া যায়। দেশের লোকে একথা বুঝেন না—বলিয়াই তাঁহারা এত রোগ প্রবণ।

“যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জৌ তদৌষধমহিতম্।” যে দেশের প্রাণী সেই দেশজাত ঔষধ সকলই যে তাহার পক্ষে অধিক উপকারী—সে কথা আর্য্য ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য যুগে যে দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত অপেক্ষা সেলি-বায়রণের অধিক আদর—সে দেশে এ কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিবার লোক কই। মধ্যযুগে সনাতন আয়ুর্ব্বেদের অবনতি এমনই করিয়াই ঘটিয়াছিল। সাম্রাজ্যপতির নিকটও আয়ুর্ব্বেদ সাহায্য পাইল না, দেশবাসীর প্রবৃত্তিও অন্যভাবে ধাবিত হইল, কাজেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আর দেশে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে সে বেগ সামলাইতে ইহার কয়েকজন উপাসককে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইল। অ্যালোপ্যাথি পাস করিয়াকয়েকজন কৃতবিদ্য ডাক্তার ইহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখ আমরা পরলোকগত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর করিতে পারি। ইনি বিশ্ববিদ্যাল বি-এ ও মেডিকেল কলেজের এল, এম, এস, পাস করিয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিলেন, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া সনাতন আয়ুর্ব্বেদেরই শরণাপন্ন হইলেন। তাহার পরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় ইহার শরণ গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের দেখাদেখি এখন অনেক এল, এম, এস, এবং এম্ বি ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে দেশবাসীর পক্ষে সম্যক উপযোগী—ইহা বুঝিয়া আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নষ্টপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উপর আস্থা স্থাপন ইহাঁদের দ্বারাই ঘটিতেছে- একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

ঋষি বাক্যের দোহাই না হয় নাই দিলাম, কিন্তু যে সকল ডাক্তার, ডাক্তারি না করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়াও তো কোন চিকিৎসা আমাদের দেশবাসীর উপযোগী তাহা আমরা নির্ণয় করিয়া লইতে পারি। অধুনা ইংরাজ সমাজেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমাদৃত

হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য রত্ন "মকরধ্বজ' এখন সকল দেশই মহামূল্য রত্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সারজন উড্‌রফ তাঁহার "ভারতশক্তি" নামক গ্রন্থে সকল চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদেরই অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। যে সকল ভারত সন্তানের ভাগ্যে সে পুস্তক দেখা ঘটে নাই, আমরা তাঁহাদিগকে উহা এক এক খানি কিনিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। তাঁহার সেই পুস্তক পড়িলে বুঝা যায়, তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ স্থানই পায় না। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষি শ্লোক নিচয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলেও এযুগে সাহেবদের মুখ হইতেও আমরা যে সকল কথা শুনিতেছি, তাহাতেও তো আমাদের এই চিকিৎসারই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। সারজন লিকুইসের মত একজন খাস ইংরাজ ডাক্তারের উক্তি—"চরকের চিকিৎসা যদি পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে দেশে শব-বাহকের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইত।" কেবল মাত্র এই কথাটি শুনিয়াও আমাদের এই চিকিৎসার প্রতিই একান্ত নির্ভর করা উচিত।

আমরা বহুবার বলিয়াছি—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মুল উদ্দেশ্য—রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা দেশে যাহাতে রোগ না হইতে পারে—তাহারই উপায় করা। চরকের প্রথম শ্লোক হইতেই আমরা সে পরিচয় পাই। চরকের প্রথম আরম্ভ এইরূপ—

"অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।"

অর্থাৎ আমরা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিলেন।

তাহার পরেই—

'দীর্ঘঞ্জীবিতমন্বিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্র মুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্।"

অর্থাৎ কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ—ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয় স্থান বলিয়া যখন আত্রেয়—'চিকিৎসা স্থান' আরম্ভ করিলেন, তখনও এই 'রসায়ন' চিকিৎসার কথাই তাঁহার বক্তব্যের সূচনা হইল। কারণ তিনি বলিলেন রসায়ন শব্দের অর্থ—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয় বলং পরম্।
বাক্‌সিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্॥

অর্থাৎ মানুষ রসায়ন হইতে দীর্ঘআয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাক্‌ সিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ করিয়া থাকে। রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহার নাম রসায়ন।

ফল কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শুধু রোগীর চিকিৎসা পুস্তক নহে, মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, সনাতন আয়ুর্ব্বেদের তাহাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের

সহিত, সমাজের সহিত, সংসারের সকল কর্ম্মের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সকল সূত্র জড়িত। যে দিন হইতে আমরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সমাজের অবমাননা করিয়া, সাংসারিক কর্ম্ম সকলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই যে আমরা সনাতন আয়ুর্ব্বেদের সকল উপদেশ ভুলিয়া অস্বাস্থ্য ও অল্পায়ুকে বরণ করিয়া লইতেছি—এ কথা ধ্রুব সত্য, এই সত্যের সন্ধানে আমরা যতদিন না আকুল হইব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোনা ক্রমেই মঙ্গল নাই। স্বদেশ ও স্বরাজ প্রয়াসী দেশের নেতৃবৃন্দ সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল তত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীনিত্যনিরঞ্জন সেন গুপ্ত)

:o:

সংযমহীনতাই যে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হানির মূল নিদান এ তত্ত্ব আয়ুর্ব্বেদ পত্রে বহু লেখক ও সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, সে সকলের পুনরালোচনা না করিয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক নীতি বন্ধন, ধর্ম্মনীতি শাসন ও পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সমূহের আলেখ্যগুলি, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজরূপ রঙ্গমঞ্চের তত্ত্‌দ্বিষয়ক দৃশ্যপটগুলির এতই পশ্চাতে ও এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে ও এতদুভয় কালের ব্যবধান মধ্যে এত অধিক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট আছে যে, উভয় কালের চিত্রগুলিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক বিশ্লেষণ করা, বা তাহাদের সকল গুলির তন্ন তন্ন করিয়া গুণাগুণ সমালোচনা করা বহু আয়াস সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এ কার্য্যে যাঁহারা পথ দেখাইয়াছেন, তাহারা সমাজের প্রকৃতই হিতৈষী মহাত্মা তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহাদেরই মহান্ উদ্দেশ্য পথ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদেরই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র লেখক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

আমরা নিয়ত শুনি ও দেখি, বাঙ্গালী জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় দুর্ব্বল জাতি। যে বাঙ্গালীর ধন আছে, তিনি স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অসুখী। যে বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক আছে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহাও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য। বাঙ্গালী কৃতবিদ্য হইয়াও জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেনা, তাহার কারণও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হীনতা।

এখন দেখা যাউক, এই স্বাস্থ্যহীনতার

প্রকৃত নিদান কি? পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সম্পদে ধনী ছিল, আজই বা কেন তাহার স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ঘটিতেছে?

সংযম বিমুখতা এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে পীড়াদি ঘটিলে, স্বাস্থ্য নীতির পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাই অধুনা বাঙ্গালীর পতন ও অকালমৃত্যুর কারণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গললনাগণ, শিশু পালনে এতই নিপুণা ছিলেন, গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুশাসনগুলির মধ্য দিয়া নিজ নিজ শিশুগণকে এরূপে লালন পালন করিতেন যে, তখনকার দিনে বাঙ্গালী দুর্ব্বল বলিয়া জগতে পরিচিত ও অনাদৃত ছিল না। প্রথমতঃ দেখুন, শিশুকে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া রৌদ্রে শোওয়াইয়া রাখা হইত। তাহাতে শিশুর কান্তি পুষ্টি বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে, বাতাতপ সহিবার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইত। তখন শিশুকে প্রত্যহ কাজল পরাইয়া দেওয়া হইত। মনসা সিজ পত্র, রশুন প্রভৃতির কজ্জলে শৈশব হইতেই চক্ষুর্দীপ্তি অব্যাহত থাকিয়া চক্ষুঃ ক্ষেত্রস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলি (retina) পরিপুষ্টি লাভ করিত। ফলে, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের পরম সহায় চক্ষু দুটিতে চাল্‌শেও ধরিতনা। যদিও কদাচিৎ কাহারও চাল্‌শে ভাব হইত, প্রাণান্তেও তিনি চশ্‌মা পরিতেন না—কয়েক দিন, বই পড়িতে বা লিখিতে একটু কষ্টবোধ হইলেও, ক্রমশঃ আপনিই তাহা সারিয়া যাইত। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, শৈশবাবস্থাতেই অনেকের চক্ষে চশমা উঠিয়াছে। আমরা জোর পূর্ব্বক বলিতেছি যে, অধুনা মা লক্ষ্মীরা, শিশু পালনই যে মাতৃরূপিণী নারী জাতির প্রধান কর্ত্তব্য ও বিশ্বস্রষ্টার জীব প্রবাহ রক্ষার প্রধান সহায়তামূলক পরম পবিত্র ব্রত, একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুযোগ করাও বোধ হয় অন্যায়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় পুরুষ সমাজ যেরূপ অভিনব শিক্ষা দীক্ষার অনুপ্রাণনায়, সাধ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ঋষিগণানুমোদিত পরম হিতকর বিধি নিষেধগুলি উঠাইয়া দিয়া, নিতান্ত ধর্ম্ম ও সমাজবিরোধী উপায়গুলির তাহাদের স্থলে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, সেই সমস্তই, তাঁহাদের স্বাস্থ্যনীতি পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা। বড় বড় সংসারে, পাশ্চাত্য গার্হস্থ্যনীতির অনুকরণে মহিলাগণ আজকাল নিজ নিজ শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ভার বহিতে অসমর্থা হইয়া, নিজ নিজ শিশুগণকে আয়া বা ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকেন। ঐ সকল বড় ঘরের মহিলাগণ শিশুগণের চক্ষুতে কজ্জল পরানো বা তৈল হরিদ্রা ম্রক্ষণ করাইয়া শিশুগণের বাতাতপ সহতার গুণে অভ্যাস করাইবার প্রাচীন রীতিনীতির আবশ্যকতা আদৌ স্বীকার করেন না—এরূপ প্রসঙ্গ ঐ সকল উচ্চ ঘরে হাস্যকর অসভ্যতারই নামান্তর বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু প্রায় দেখা যায়, একটু বাতাসে বাহির করিলেই শিশুর সর্দ্দি হয়, একটু আতপ তাপ লাগিলেই তাহার চক্ষুঃ লাল হয়। পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না—এ সকলের কারণ কি? শিশুগণকে অন্ততঃ পঞ্চম ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত কাজল পরাইয়া দিলে যে তাহার দৃষ্টিশক্তি

আজীবন তীক্ষ্ণ ও অব্যাহত থাকে, কখনও যে তাহাকে চক্ষুরোগাক্রান্ত হইতে হয় না, ইহা পরীক্ষিত মহাসত্য। প্রাচীন কালে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীগণেরও অঙ্গ সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধনার্থ চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জন রেখাঙ্কিত না করিলে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। প্রাচীনকালের যুবতী মহিলাগণের নেত্রাঞ্জনের সহিত নানা প্রাকৃতিক শোভার তুলনা করিয়া কত কত মহাকবি অপূর্ব্ব বর্ণনাদ্বারা নিজ নিজ কাব্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এহেন উত্তমাঙ্গের প্রধান প্রত্যঙ্গ যে, নয়ন, তাহার দীপ্তি ও পরিপুষ্টি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যত্নবান হওয়া উচিত নহে কি?

সংপ্রতি একদিন আমি পূর্ব্ব বঙ্গ রেল পথে, শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাজদিয়া যাইতেছিলাম। আমি যে কামরায় ছিলাম সেখানে একটী কিশোর বয়স্ক পরম সুন্দর চশমাধারী বালক আরোহী ছিল। ছেলেটী অভিনিবেশ সহকারে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল, অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রমপূর্ব্বক গাড়ী বারাকপুরে পঁহুছিল, তথাপি বালকের ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় পাঠানুরাগ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম বালকটীর সহিত আলাপ করিবার কৌতূহল হইল। কি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছে জিজ্ঞাসায় স্বাভাবিক সরলতাপূর্ণ কথায় বালক বলিল, সে এবার কাঁকড়াপাড়ায় বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও পল্লীগ্রামের সখের থিয়েটার পার্টিতে দ্রৌপদীর ভূমিকার অভিনয় করিবে বলিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের দ্রৌপদীর অংশ আবৃত্তি করিতেছে। বালকটিকে এই সুকুমার কিশোর বয়সেই দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য চশমা পরিতে হইয়াছে দেখিয়া বস্তুতঃ বড় কষ্ট হইল। এইরূপ দৃষ্টিক্ষীণতার প্রধান কারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার ও স্বল্পায়ু হইবার কারণগুলি ক্রমশঃ দেখাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

কালাজ্বর।

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

কালাজ্বরে—Antimony salts ও খাওয়ান চলেনা, যেহেতু উহা খাওয়াইলে প্রবল বমি বা অতীসার আরম্ভ হয়, সুতরাং Injection ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদি বুঝিতাম যে ইহার প্রভাবে আরোগ নিশ্চিত, তাহা হইলেও না হয় এই বিপদসঙ্কুল চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লোককে উপদেশ দেওয়া যাইত। কিন্তু কই তাহাওত সর্ব্বত্র দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যখন দেখিতে পাই যে আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় এবং এই সকল ঔষধ প্রয়োগে কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন আমরা দেশবাসিগণকে কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। ইহা শুধু মুখের কথা নহে, আয়ুর্ব্বেদমতে কালাজ্বর অতি সুন্দর ভাবে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে প্রণালীতে চিকিৎসা করি তাহার ফল বেশ সন্তোষ জনক।

ডাক্তারগণ বলেন, "আমরা ছাতিম, গুলঞ্চ, নাটা, রসুন, দারুহরিদ্রা, চিরেতা প্রভৃতি ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কালাজ্বরে ইহাদের কোনটীই কার্য্যকরী হয় না।" তাঁহাদের এ পরীক্ষার কোনও মূল্য নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ শাস্ত্রীয় ঔষধই ব্যবহার করেন এবং এই সকল ঔষধ একাধিক ভেষজের সংমিশ্রনে প্রস্তুত। দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার যে গুণোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা অবিসংবাদী-সত্য। ঔষধের গুণ প্রসঙ্গে মহর্ষি-চরক বলেন—

"বহুতা—তত্র যোগ্যত্বমনেকবিধ কল্পনা।
সম্পচ্চেতি চতুষ্কোকহয়ঃ ভেষজানাং গুণাঃস্মৃতাঃ

বহুতা অর্থাৎ একাধিক দ্রব্য সংযোগ ভেষজের প্রথম এবং প্রধান গুণ—।

সংপ্রতি কলিকাতায় যে স্বাস্থ্য সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকজন ডাক্তার বারাসত, দত্তপুকুর, দোগাছিয়া প্রভৃতি স্থলে যাইয়া কালাজ্বরের Injectcion দিয়া আসিতেছেন এবং তৎসহ আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় সেখানে তাঁহাদের সহিত আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিয়াছেন। সেখানকার বিবরণীতেই প্রকাশ—Injection অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেই অধিকতর ফল পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ডাঃ বেণ্টলী সাহেব—স্বাস্থ্য

সমিতির কার্য্য পরিদর্শনার্থ সেখানে যাইয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য যাঁহারা Bovril Panopeptan প্রভৃতি খাওয়াইয়া একদিকে যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি কোটি কোটি টাকা প্রতিবৎসর বিদেশে পাঠাইয়া দরিদ্রের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই নষ্ট করিতেছেন, দেশবাসী তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন, না—ত্রিকাল-দর্শী লোকহিতপরায়ণ আর্য্যঋষিগণের সুচিন্তা-প্রসূত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অধিকতর—আস্থা স্থাপন করিবেন।

আমরা কালাজ্বরের উৎপত্তি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মতগুলি পাশ্চাত্য মতের সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব যে আয়ুর্ব্বেদের রোগ নির্ব্বাচন এবং ঔষধের ব্যবস্থা য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর সুচিন্তিত ও সুফলপ্রদ।

ক্রমশঃ

সিদ্ধ-প্রদ মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

—:•:—

চিকিৎসাতত্ত্বের বিষয় আমার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কয়েকটি রোগের সিদ্ধ-প্রদ মুষ্টীযোগ নিম্নে লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্ত প্রাচীন চিকিৎসক ও সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহারা যে যে সিদ্ধি-প্রদ মুষ্টিযোগ প্রয়োগে ফললাভ করিয়াছেন, সেই সেই মুষ্টিযোগই গৃহীত হইয়াছে। মুষ্টিযোগগুলি কিরূপ ফলপ্রদ, পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইবে। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

১। রক্তা-তীসার রোগে:—হরিদ্রাচূর্ণ, বালাচূর্ণ ও মধু প্রত্যেক দ্রব্য একআনা ওজনে একত্রে সেবন করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয়।

(ক) বটপাতা বাসিজলে বাটিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয়।

(খ) আমের ছাল ২ ভরি কাঞ্জির সহিত বাটিয়া প্রত্যে অর্দ্ধেক সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবারণ হয়।

২। আমাশয় রোগে:—কাঁচা আম্র লবণসহ খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

(ক) মাস কলাইয়ের দাইল বাটিয়া উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া কলাপাতা দিয়া জড়াইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলে আমাশয় রোগের শান্তি হয়।

(খ) অনেকদিনের পুরাতন তেঁতুল এক ছটাক, একপোয়া শীতল জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আমাশয় রোগের শান্তি হয়।

(গ) আমন ধান্যের চাউল কাটখোলায় ভাজিয়া ভস্ম করিবে এবং একপোয়া জলে উহা নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা শীতল হইলে উহার সহিত সামান্য চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

৩। গ্রহণী রোগে :—পাকাবেল, ভিজান চিঁড়ার সহিত সেবন করিলে, দুষ্ট গ্রহণী নিরাময় হয়।

(ক) ঘোলের সহিত পাকাবেল ও চিনি দিয়া সেবন করিলে গ্রহণী আরোগ্য হয়।

(খ) বক পুষ্পের মূল বাসি জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা ১ তোলা পান করিলে গ্রহণী রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ইহা পরীক্ষিত।

৪। ভেদ নিবারণ :—যে কোন কারণে হউক না কেন, অধিক পরিমাণে ভেদ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ভেদ নিবারিত হইবে। জায়ফল ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, গুজরাটী এলাচ অর্দ্ধ তোলা, মধু ২ তোলা,—এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা বাসি জলের সহিত বাটিয়া একটি বটিকা সেবন করিলে ভেদ নিবারিত হইবে। যদি এক বটিকাতে সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়, তাহা হইলে আর একটি বটিকা সেবন করিবে। ইহা বিসূচিকা রোগেও উপকার হয়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

৫। কর্ণে-তালা-লাগা :—আদা চর্ব্বণ করিয়া জলে ডুব দিলেই কাণের তালা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যায়।

(ক) কর্ণে চাপিয়া আড়াইটা মরিচ চর্ব্বন করিয়া মুখ বন্ধ করতঃ কাণের চাপা ছাড়িয়া দিলে তালা লাগা নিবারিত হয়।

(খ) সরিষা তৈল গরম করিয়া কর্ণে দিলে কাণের তালা লাগা নিবারিত হয়।

(৬) ফোড়া, কুচ্‌কী প্রভৃতি বসাইবার মুষ্টিযোগ :—রশুনের রস ও মেটে সিন্দুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া কুচ্‌কী, ফোড়া ও বাঘিতে দিলে বসিয়া যায়।

(ক) ছোট গোয়ালের পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া, কুচ্‌কী, বাঘি বসিয়া যায়।

(খ) ৭টা পাকা তেঁতুল বীজের শাঁস, চিনাবাসন ভাঙ্গার গুঁড়া ১ ছটাক, মনসা গাছের পাতা—অগ্নিতাপে উষ্ণ করতঃ তাহার রসে বাটিয়া ফোঁড়া কুঁচ্‌কী ও বাঘিতে প্রলেপ দিতে হইবে। পরে তাহার উপর ভেরেণ্ডার পাতা ও তদুপরি তুলা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। তাহা হইলে সমস্ত দূষিত রক্ত জল হইয়া প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হইবে।

৭। নাসা রোগে :—এক তোলা গেটীয়া-দুর্ব্বাঘাস, এক তোলা হরীতকী, এক তোলা বহেড়া, এক তোলা কাঁচা আমড়ার শাঁস, এক তোলা বটফল, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে নাসা রোগ নিবারণ হয়।

(ক) অর্দ্ধ পোয়া বাসক পাতা, অর্দ্ধ পোয়া মধু এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রাতে অর্দ্ধেক ও বৈকালে অর্দ্ধেক সেবন করিলে নাসা রোগ নিবারিত হয়।

(খ) তিলফুল চূর্ণ সরিষা তৈলের সহিত বাটিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া তাহা মস্তকের তালুতে প্রলেপ দিবে ও ঐ তৈলের নাস লইলে নাসা রোগ নিবারিত হয়।

৮। বালসা নিবারণ:—শিশুদিগের উৎকাশি, কণ্ঠনালী ঘড়ঘড়ানি, কফ প্রভৃতিকে বালসা বলে। ইহাতে শিশুরা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেবল কাঁদিতে থাকে, স্তন পান করিতে পারে না, ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও কাহিল হইয়া পড়ে।

একটা গোটাপান, একটা লবঙ্গ, এক আনা জায়ফল চূর্ণ, এক তোলা জলের সহিত বাটিয়া প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করাইলে শিশুর সমস্ত পীড়া নিবারণ হইয়া পূর্ব্বের মত দুগ্ধ পান ও হাস্য করিবে।

৯। বালকের সর্দ্দি:—বালকের সর্দ্দি বুকে বসিলে রামতুলসীর পাতার রস শম্বুকের খোলার মধ্যে পুরিয়া উষ্ণ করতঃ সেবন করাইলে সর্দ্দি উঠিয়া বা অধো হইয়া যায়।

(ক) কানোড় গাছের পাতার রস এক ঝিনুক পরিমাণ শিশুকে খাওয়াইলে বমির সহিত সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে এবং শিশু সুস্থ হইয়া নিদ্রা যাইবে।

১০। ঘুর্ণি রোগে:—যাহাদের সময়ে সময়ে মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তাঁহারা অন্নের সহিত প্রথম কচি দুর্ব্বাঘাস ভাজা এক তোলা, তৎপরে বীজহীন ডুমুর ভাজা এক তোলা খাইবেন এবং মস্তকে লাউয়ের তৈল মর্দ্দন করিবেন, তাহা হইলে ঘুর্ণি রোগ নিবারিত হইবে।

১১। মাথাধরা:—ময়দা পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া রগে লাগাইলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

(ক) মুথার রস রগে মালিশ করিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

(খ) হস্তের পেশী সকল রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলে তৎক্ষণাৎ মাথাধরার যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

(গ) পানের উলটা পিঠে চূণ লাগাইয়া দুই দিকের রগে বসাইয়া দিলে মাথাধরা নিবারণ হয়।

(ঘ) উনানের পোড়ামাটি ও গোলমরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলাইয়া নস্য লইলে মাথাধরার শান্তি হয়।

(ঙ) আলকুশীর মূল আমানির সহিত বাটিয়া দুই রগে প্রলেপ দিলে শিরঃশূল নিবারণ হয়।

(চ) মাথাধরায় অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে থাকিলে—একটু জলে কাশীর চিনি গাঢ় করিয়া গুলিয়া ইহার নাস লইলে বিশেষ ফল হয়।

১২। আধকপালে:—হরিণের শিং—রক্ত চন্দনের সহিত ঘষিয়া কপালে দিলে আধ কপালে আরোগ্য হয়।

(ক) শ্বেত অপরাজিতার শিকড় দক্ষিণ কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে সকল রকম শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

(খ) শিমুল তুলার ধূম—নাকে দিয়া টানিলে অথবা শিমুল ফুলের কুঁড়ি জল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালে ভাল হয়।

১৩। জিহ্বায় ঘা বা মুখের ঘায়ে:—আধ সের দুধ ও আধসের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ২ তোলা কাঁকড়ার পা সিদ্ধ

করিবে, আধসের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে বারংবার কুলকুচা করিলে সকল প্রকার মুখ রোগ আরোগ্য হইবে।

(ক) তুঁতে পোড়াইয়া সাদা হইলে, সেই ছাই ও গাওয়া ঘি একসঙ্গে মাড়িয়া জিহ্বায় দিলে সদ্য সদ্য উপকার পাইবে। দিনে ২ বার ব্যবহার করিবে।

(খ) রসাঞ্জন (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ইহা কিঞ্চিৎ মধুসহ পাথরে ঘসিয়া চন্দনবৎ হইলে জিহ্বায় দিনে ২ বার প্রলেপ দিবে, সদ্য সদ্য জিহ্বার ঘা আরাম হইবে।

১৪। গর্ভপাত নিবারণের উপায় :—আপাং-য়ের শিকড় তুলিয়া রমণীর কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহা পরীক্ষিত।

(ক) চাকে কাজ করিবার সময় কুমোরের হাতে যে মাটি লাগে, সেই মাটি আধ তোলা, এক পোয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া আধ তোলা মধুসহ খাইলে অকালে প্রসব বেদনা উঠিলে তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না। ইহা পরীক্ষিত।

১৫। সুপ্রসব :—নাগদানার মূল ও চিতার শিকড় সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে মৃত বা জীবিত গর্ভ শীঘ্রই প্রসব হইয়া যায়।

(ক) আফুলা তেঁতুলের শিকড় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিনীর সামনের চুলে বাঁধিয়া দিবে। প্রসব হইবামাত্র ঐ শিকড় চুল সহ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে। ইহা পরীক্ষিত। যদি কেহ পরীক্ষা করেন, তবে ফলাফল আমাদিগকে জ্ঞাত করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

১৬। স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায় :—চারি আনা কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত ৭ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিয়া স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

(ক) নীলশুঁদি ফুলের গেঁড়ো বাটিয়া এক আনা মাত্রায় তিন দিন সেবন করিলে স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

(খ) ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা আতপ তণ্ডুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এক ছটাক দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে।

১৭। সূতিকা রোগে :—ডাক পক্ষীর মাংস গোলমরিচের সহিত ঝোল রাঁধিয়া তিন দিন সেবন করিলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হইবে।

(ক) মাগুর কিম্বা কৈ মৎস্য, ধনিয়া ও পুঁইশাকের শিকড় বাটা দিয়া ঝোল রাঁধিয়া সূতিকারোগগ্রস্থাকে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। যতক্ষণ তিক্ত না লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাইতে দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সূতিকা রোগ নিরাময় হইবে।

(খ) কৃষ্ণ জীরা, হরিদ্রা, বিটলবণ, চই, সৈন্ধব, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) যমানী, শ্বেতজীরক, দারুহরিদ্রা এই সকল সম-পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে সূতিকাবস্থার অজীর্ণ ও আমবাত আরোগ্য হয়।

(গ) ঝাঁটি ফুলের মূল ২ তোলা—অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ দিয়া সেবন করিলে সূতিকা জ্বর আরোগ্য হয়।

(খ) একটী টিকটিকির ন্যাজের ডগের সামান্ত অংশ পাকা, কাঁঠালি কলার ভিতর পুরিয়া একটী দিন মাত্র একবার খাওয়াইলেই সুতিকার যাবতীয় উপসর্গ বিদূরীত হয়।

১৮। অর্শ রোগ :—ট্যাকশালে অর্থাৎ যে স্থানে প্রচুর রৌপ্য গালিত হয়, তথাকার ধুলা গলাইলেও তাহা হইতে রৌপ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই রৌপ্যের অঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

(ক) শনি কিম্বা মঙ্গলবারে শিরিষ বৃক্ষের সূক্ষ্ম মূল সংগ্রহ করিয়া তুলসী ক্ষেত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরদিবস প্রাতে রোগী স্নানান্তে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীশ্রী৺কালীকাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক বিশুদ্ধ তাম্র নির্ম্মিত মাদুলী মধ্যে উহা প্রবেশ করাইয়া কোমরে ধারণ করিবে। আরোগ্যান্তে কালীকাদেবীর পূজা দিবে। ঔষধ ধারণের দিবস হইতে প্রত্যহ অন্নাহার কালে যে কোন পোড়া দ্রব্য সংযোগে প্রথম তিন গ্রাস অন্ন ভোজনের বিধি আছে। এই ঔষধে লক্ষ লক্ষ অর্শরোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইহা কালিকাদেবীর স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ।

১৯। নালী ঘা ও পচা ঘা :—ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বার আনা, আপাং মূল চার আনা একত্রে বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিবে। নিম পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া দুই বেলা ঘা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উপরিউক্ত ঔষধ প্রত্যহ ২ বার ব্যবহার করিবে।

(ক) পাঁচ আঙ্গুলে নামক লতার মূল কুট্টিত করিয়া পরিমাণ মত বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে বেশ করিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে ভর্জ্জিত মূলগুলী ঘোর লাল বর্ণ ধারণ করিলে ঘৃত নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঘৃতে যাবতীয় বাতবেদনা, দুরারোগ্য কষ্টপ্রদ ক্ষত রোগ, দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, উপদংশ জনিত ক্ষত, অর্শক্ষত, খোষ, পাঁচড়া, নারাঙ্গা ঘা, কাণের ঘা, কাণে পূঁয হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষত রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ]

—:o:—

অনেকেই জানেন, আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা নাই, ছিলও না, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত যিনি বা যাঁহারা পরিচিত, তাহারা দেশীয় শাস্ত্রে শল্য চিকিৎসা উঠিয়া যাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। সুশ্রুতে শল্য চিকিৎসার বিবরণ ও দেহের অস্থি-স্নায়ুর নাম জানিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা আমাদের সমাজে প্রবেশ করার পর হইতে দেশীয় শল্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন প্রাচীন শল্য

চিকিৎসাকে ফিরাইয়া আনিবার উপায় কি নাই? আমি মনে করি দেশায়ের সঙ্গে বিদেশীয় অস্ত্র বিদ্যার মিলন করিয়া উভয়ের সংমিশ্রনে একটা নূতন অস্ত্র চিকিৎসার সৃষ্টি করিলে ভাল হয়, যদি এই পন্থাকে সকলে ভাল মনে করেন তবে ইহার দিকে সকলে মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

অধুনা আয়ুর্ব্বেদে ঔষধ দিয়া শল্য চিকিৎসার কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্ত ও বনজ ভেষজের প্রভাব দেখাইব। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার পেটে এক ফোড়া হইয়া কাতর হই। ফোড়াটা পেটের অর্দ্ধাংশ দখল করিয়া বসে। ফোড়া হইল, কিন্তু তাহারা বেদনা বা যন্ত্রণা নাই। আশ্চর্য্যের কথা নহে কি? ঐ সময় ময়মনসিংহ হইতে বাড়ী আসিব, আমার গুরুঠাকুরও তথা হইতে বাড়ী আসিবেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া রাম অমৃতগঞ্জ রেল ষ্টেসনে নামিলাম, এখান হইতে আমার বাড়ী তিন মাইল, তাড়াতাড়ি আসিয়াছি বলিয়া বাড়ী হইতে হাতী, পাড়ী বা পাল্কী আনিবার জন্য লিখিতে পারি নাই। হাঁটিয়া বাড়ী চলিলাম। অর্দ্ধেক পথ যাইতেই আমার ফোড়ার উপর যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া দেখি—উহা দ্বিগুণাকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রামের প্রাচীন প্রবীন ভাল ডাক্তার ডাকাইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, "আপনি হাঁটিয়া আসাতে ইহা যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে ও পাকিয়াছে, ইহা ভালর লক্ষণ, কিন্তু আমি ইহা কাটিতে চাই না। কারণ, আপনার ময়মনসিংহে বাসাবাটী রহিয়াছে, সেখানে গেলে বড় ডাক্তার দিয়া কাটাইবেন। যদি হঠাৎ কোন দোষ ঘটে তবে আমিও লজ্জিত হইব, আপনিও কষ্ট পাইবেন।" "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য"—করিয়া আমি পাল্কী ডাকাইয়া ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম, সঙ্গে গ্রামের বা বাড়ীর ডাক্তারকেও লইয়া গেলাম।

সহরে তখন ভাল ডাক্তার দুইজন। উভয়েই এল, এম, এস। বাবু পূর্ণচন্দ্র গুহ কায়েত সরকারী ডাক্তার আর বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস (আগে সরকারী ডাক্তার ছিলেন) বাহিরে ব্যবসা করেন, তাঁহাদের উভয়কেই ডাকিলাম। দুইজনেই বলিলেন "পাকিয়াছে, কাটিতে হইবে।" আমি কিন্তু সেদিন তাহাতে মত দিলাম না। দুই দিনে আরও ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলাম, তাঁহারাও কাটিবার উপদেশ দিলেন। ফলে কাটাই সাব্যস্থ হইল। যেদিন কাটিব, সেদিন পূর্ণবাবুকে পাইলাম না। পূর্ণ দাস কাটিলেন। উহাতে নালী ধরিয়াছে বলিয়া কাটিতে হইল। পূর্ণ বাবু বেশী করিয়া কাটিলেন না। তিনি যখন ছুরী উঠাইলেন আমি বলিলাম "যতটুকু কাটিবার দরকার একবারেই কাটিয়া ফেলুন, বার বার কষ্ট পাইয়া দরকার কি?" তিনি কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে ডাকিলাম, তিনি আসিয়া আবার কাটিয়া দিলেন। তারপরও যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া পুনর্ব্বার ডাকাইলাম। তিনি আবার কাটিতে হইবে বলিলেন। আমি লাউ, কুমড়ার মত আর কাটিতে দিব না বলিলাম।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক হাতুড়িয়া কবিরাজ নিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার

ঔষধ লাগাইয়া দিলাম—উহা একটা গাছের পাতা মাত্র। পরদিন সে আসিয়া ঘা দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। সকলেই দেখিলেন, আর কাটিবার প্রয়োজন নাই, নালীও অনেকটা ভরিয়া গিয়াছে। সেই দিন ডাক্তারকে আনিয়া দেখাইলাম, তিনি বলিলেন, "বেশ হইয়াছে।" কিসে এমন হইল তা, আর বলিলাম না, কারণ তিনি হাতুড়িয়ার এই ঔষধ দিতে বারণ করিয়াছিলেন। তারপর দিন দেখি ঘা খুব লাল হইয়াছে, নালীও নাই। আবার ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে এমন হইল?" আমি বলিলাম—সেই হাতুড়িয়ার ঔষধে এমন হইয়াছে।" তিনি "হুঁ" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, আমি যে হাতুড়িয়ার ঔষধ লাগাইতেছি, একজন কবিরাজ তাঁহাকে এই ঔষধ শিখাইয়া দিয়াছেন। সে আদালতে সব জজের চাপরাশী ছিল। এই ঔষধ পাইয়া চাকরী ছাড়িয়া এই চিকিৎসা করিয়া সে দুই পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতেছে।

বাবু প্রাণনাথ বসু ময়মনসিংহের প্রবল প্রতাপ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। তিনি আমার একজন বন্ধু। একদিন একজন দারোগা আসিয়া আমার বাসায় বলিয়া গেলেন "প্রাণনাথ বাবু ঘোড়া হইতে পড়িয়া হাতের হাড় ভাঙ্গিয়াছেন, আপনাকে দেখিতে চান।" আমি অনতি বিলম্বে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যায় পড়িয়া, তাঁহার পত্নী আমাকে ঐ হাতুড়িয়াকে আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম। সে কহিল—"আমার ঔষধে যে হাড় জোড়া—লাগিতে পারে তা জানি না। সে কবিরাজও আমাকে কিছু বলেন নাই।" আমি জানিতাম আমার বাড়ীর কাছে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাড় জোড়া লাগিতে পারে—এমন ঔষধ গাছড়া দিয়া দেয়। আমি বাড়ী আসিয়া তাহাকে ডাক দিয়া আনাইলাম। আমার কাছে শুনিয়া তিনি থানায় যাইতে চাহিলেন। থানার দারোগা চৌকিদার দিয়া সেই বৃদ্ধাকে ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিলেন। ফলে গাছড়ার ঔষধ দেওয়ায় তিনদিনেই হাড় জোড়া লাগিয়া গেল। সিভিল সার্জ্জন আসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, যে ঔষধ দেওয়া হইতেছে তাহাই দেওয়া হউক।" পরে যখন বৃদ্ধার কথা শুনিলেন, তখন সে বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া ঔষধের নাম ও প্রয়োগ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু সে স্ত্রীলোক ঔষধ জানাইল না, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া টাকা দিতে চাহিলেও সে অস্বীকার করিল। এই সকল ঔষধ ইংরাজী ভৈষজ্য-তত্ত্বে স্থান পায় না।

আমিও স্ত্রীলোকটিকে আনিয়া ডাক্তার সাহেবকে ঔষধটা বলিয়া দিতে চাহিলাম, সে বলিল না। এ দিকেও প্রাণনাথ বাবু সে স্ত্রীলোককে কিছু টাকা পুরস্কার আমার মারফতে দিতে চাহিলেন। সে স্ত্রীলোক বলিল, আমাদের বাড়ীতে রামমণী সেন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার কাছ হইতে এই ঔষধ পাইয়াছি। আমার ইহা কাহাকেও শিখাইতে উপদেশ নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, রামমণীর পুত্র বা পৌত্র কেহই সে ঔষধ জানেন না। ক্রমে এই সকল ঔষধ লোপ পাইয়া যাইতেছে।

আর একটা চিকিৎসার বিবরণ বলিয়া

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার এক জন ভৃত্যের পুত্রের পেটে বেদনা হইল, সঙ্গে জরও ছিল। ডাক্তার ডাকা হইলে ঔষধ ব্যবহারে কিছুই হইতেছে না দেখিয়া আমাদের গ্রামের একজন ভাল কবিরাজকে ডাকা হইল। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন, "ইহার পেটে ফোড়া হইয়াছে।" আমি শুনিয়া তাহাকে ময়মনসিংহ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব স্থির করিলাম। কবিরাজ বলিলেন, "আমি কয়েক দিন দেখিয়া লই।" ফলে তিনি কজ্জলী যোগ ও কৃষ্ণ চতুর্মুখ ব্যবহার করিতে দিলেন, আর ময়দা ও ঘিএর পুলটিশ উপরে দিলেন, তাহাতেই পেটের ভিতরকার ফোড়া পাকিয়া ভিতর দিয়া গলিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার আসিয়া গুহ্য দ্বার দিয়া পুয রক্ত নির্গম দেখিয়া কহিলেন—"উহার আমাশয় হইয়াছে।" কবিরাজ বলিলেন,—ফোড়া গলিয়া পুয রক্ত পড়িয়াছে। নতুবা আমাশয় হইত তার নাভীর গোড়ায় বেদনা ও যন্ত্রণা এবং পুয নির্গমনের সময় কুন্থন থাকিত।" যাহা হউক, কয়েক দিন পরে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। রোগীকে উল্লিখিত সাধারণ ঔষধ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় নাই। অতি সহজে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই রোগীকে যদি হাসপাতালে বা ডাক্তারের হাতে দেওয়া হইত, তবে তাহারা হয়ত পেটের উপর দিয়া ভিতরকার ফোড়া কাটিতেন, তখন হয়ত রোগীর প্রাণ সংহার হইত বা ডাক্তারের হাতেই তাহার ইহলীলার সকল ভোগ টুটিয়া যাইত।

দ্রব্যগুণ।

(কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:০:—

চিকিৎসক মহোদয়গণ সমীপে সবিনয় নিবেদন—

বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভই চিকিৎসা কার্য্যে-সিদ্ধি লাভের প্রধানতম উপায়। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন যে, যিনি দ্রব্যের বাহ্যাভ্যন্তর প্রয়োগ ও সংযোগ বিয়োগ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইবেন। চিকিৎসকগণ ইহা জানিয়াও সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল এ যাবৎ দ্রব্যগুণ বিষয়ক বিশেষ সমালোচনা বা উহার উৎকর্ষ সাধনে একেবারে নিশ্চেষ্টই রহিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদের অবনতির ইহাই একমাত্র কারণ। মনুষ্য শরীরে বাহ্য ও আভ্যন্তর এমন কোন রোগ জন্মিতে পারে না—যাহা ভেষজ প্রয়োগে অনায়াসে আরোগ্য না হয়, এই ভেষজ প্রধান দেশে অস্ত্র চিকিৎসার কোন আবশ্যক হয় না। সুশ্রুত সংহিতা প্রণেতা কাশীর রাজা মহর্ষি দিবোদাস ধন্বন্তরিই জগতে অস্ত্র চিকিৎসার প্রথম প্রবর্ত্তক, তৎকালে কিছুদিন

অস্ত্র চিকিৎসার প্রধান্যও হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভেষজ প্রভাবে ক্রমশঃ উহা লয় হইয়া গেল। সুতরাং সুশ্রুত সংহিতাও মলিনতা প্রাপ্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে তো অস্ত্র চিকিৎসা উন্নতির চরম সীমাতেই উঠিয়াছে, তথাপি এখনও অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে, মহাপ্রাজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসকগণের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও যে রোগ আরোগ্য হইল না, সেই রোগ কোন সামান্য ব্যক্তি কোন গাছের পাতা বা ফুল দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য করিয়া দিল। আছে সবই, জানিতে চেষ্টা করে কে? যিনি যখন যে কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ উহা জানিবার যোগ্য কোন গ্রন্থ না থাকাতে দ্রব্য গুণের আলোচনাই একরূপ রহিত হইয়াছে এবং যে সমস্ত দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রচলিত আছে উহাও ব্যবহারে আসেনা।

অতএব আমি বহু চিন্তা চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে "দ্রব্যগুণ দর্পণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিয়াছি, এই খণ্ডে ভুমির গুণাগুণ পঞ্চভূতের গুণ, যে ভূতের আধিক্যহেতু যে রস ও যে গুণ জন্মে, এবং রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবাদির গুণ ও কার্য্যাদি এবং প্রত্যেক রস বিশিষ্ট, প্রত্যেক বীর্য্য বিশিষ্ট,প্রত্যেক বিপাক বিশিষ্ট, এবং প্রত্যেক দোষ নাশক ও জনক এবং প্রত্যেক রোগ নাশক ও জনক ইত্যাদি এক এক গুণ বিশিষ্ট যত দ্রব্য আছে তৎসমুদয় এক এক স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইয়াছে, ইহা ভিন্নও দ্রব্যগুণ সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখন যখন যিনি যে কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য জানিতে ইচ্ছা করিবেন তৎক্ষণাৎ ঐ গুণ বিশিষ্ট যত দ্রব্য আছে তৎসমুদয়ই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

আর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্লোকাকারে সংস্কৃত নাম, দেশ বিদেশের ভাষা নাম, ডাক্তারী নাম, দ্রব্যের স্বরূপ বর্ণন, জারণ, মারণ, শোধন প্রণালী, গুণাগুণ দ্রব্যগুণ সংগ্রহে লিখিত গুণ অপেক্ষা শাস্ত্র ব্যবহার দৃষ্টে বহু অধিক গুণ, বহু মুষ্টিযোগ, ব্যবহার প্রণালী মাত্রা, সংযোগ বিয়োগের প্রণালী. প্রভৃতি বহু বিষয় লিখিত হইয়াছে।

যাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান আছে—এরূপ ব্যক্তিগণও কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যে দেশীয় ভৈষজ্য দ্বারা চিকিৎসা কার্য্যে বহু অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন অনায়াসে অভ্রান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় নামক আর একখানি গ্রন্থও লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেরও প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের—অভিনবত্ব, ভূতপূর্ব্বত্ব ও মহোপকারিতা সম্বন্ধে (হস্ত লিখিত অবস্থায় দেখিয়া) মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত ও ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহামান্য চিকিৎসকগণ ভুয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এখন আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে,রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে ধন্বন্তরীয় নির্ঘণ্টুকার ও রাজ নির্ঘণ্টুকার প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা মত করিয়া রাখিয়াছেন, শাস্ত্রে এইরূপ নানা মত থাকা সঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে চিকিৎসা কার্য্যে যে বিষম অসুবিধা ঘটে তাহা

চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন, এ জন্য আমি বহুচিন্তা, চেষ্টা ও পরীক্ষা দ্বারা এক একটী দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ চিকিৎসক মহোদয় গণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিলাম। যদি কেহ এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। এই কার্য্যে চিকিৎসক মাত্রেরই যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য।

আলোচ্য বিষয়।

বিদারী ও ক্ষীর বিদারী, শাস্ত্রে যথার্থ বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) শব্দের প্রয়োগই বেশী দেখা যায়। বিদারী জাতীয় দুই প্রকার কন্দ আছে, এক প্রকার প্রায় কুষ্মাণ্ডাকৃতি, অপর প্রকার প্রায় মূলকাকৃতি। কোন কোন নির্ঘণ্টকার ক্ষীরবিদারীকে আকারে বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ, শুক্ল, ক্ষীর বিশিষ্ট ও অতিমধুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুষ্মাণ্ডাকৃতি কন্দেই প্রায় এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু অতি মধুরতা ঐ দুই প্রকার কন্দের মধ্যে কোনটীতেই নাই। বর্ত্তমানের শাকআলু জাতীয় কন্দই অতি মধুর এবং উহা আকারেও বৃহৎ দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো ঐ জাতীয় কন্দেই ক্ষীরবিদারী বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে।

বনৌষধি দর্পণকার লিখিয়াছেন যে; বরিশাল চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মূলকাকৃতি কন্দকেই ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এ কথা সত্য হইলে উহা অত্যন্ত বিগর্হিত বলিতে হইবে, কারণ ভূমিকুষ্মাণ্ড স্থলে কুষ্মাণ্ডাকৃতি কন্দ পরিত্যাগ করিয়া মূলকাকৃতি কন্দ লওয়া হয় কেন? ইহার যুক্তি কি?

যাহা হউক আমি গুণের পরীক্ষায় যাহা বুঝিলাম ও সহজ জ্ঞানে যাহা আসে—তাহাই লিখিলাম, কুষ্মাণ্ডাকৃতি বৃহৎ কন্দই বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) আর মূলকাকৃতি কন্দই ক্ষীরবিদারী।

তাহার পরে রাজনির্ঘণ্টকার লিখিয়াছেন,— ক্ষীর বিদারী দ্বিবিধ, বিনাল ও সনাল। এই বিনাল ও সনালের কোন লক্ষণ তিনি লেখেন নাই, সুতরাং ইহা লইয়াও বহু মতামত ঘটিয়াছে, কিন্তু স্থির নিশ্চয়ই কিছুই হয় নাই। বনৌষধি দর্পণকার লিখিয়াছেন যে, ইহা নিরূপণে আমি অজ্ঞ। আমি এ সম্বন্ধে বহু দেখিয়া শুনিয়া ও পরীক্ষা করিয়া যাহা স্থির করিলাম তাহা এই—মূলকাকৃতি কন্দের মধ্যে এক জাতির কন্দ একটু বড়, কিন্তু উহার নাল (লতা) ২॥ হাত বা ৩ হাতের উর্দ্ধ হয় না। উহার কন্দে সামান্য কটু- (ঝাল) রস অনুভব হয়। অন্য প্রকারের নাল (লতা) অত্যন্ত বিস্তৃত হয়,—এইমাত্র পার্থক্য।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদ।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

(১)

"আয়ুর্ব্বেদ" আজি চিত্তে আমার—
জাগা'ল আবার দারুণ-ব্যথা।
অশীতি বর্ষ গত তবু ওগো—
ভুলিনি একটী ভুলের কথা।

(২)

নবীন যৌবন ছিলগো যখন—
উদিত জীবন-গগনে মোর।
চিত অনুরত আছিল সতত,
প্রতীচ্য বিজ্ঞান দর্শনে ভোর॥

(৩)

পুরাণ কাহিনী সাংখ্য যোগ-কথা :—
হাসিয়া দিতাম উড়ায়ে যত,
কভু মনে মনে পাইতাম ব্যথা,
স্বদেশ দৈন্য স্মরিয়ে কত।

(৪)

এমন সময় একটী ঘটনা, —
সকল গর্ব্ব করিয়া চুর্ণ,
দে'খাল কা'দের জ্ঞান ভাণ্ডার—
নিখিল রতন রাজিতে পূর্ণ।

(৫)

পূত চরিত জনক আমার,
একদা আমায় আদরে ভাবি'—
বলিলা, মধুর বচনে "সুরেন্,
নিয়ে চল মোরে এখন কাশী।

(৬)

আয়ুর্ব্বেদ ঋষি শ্রীগঙ্গাধর,
নিরখি' আমার শরীর চিহ্ন।
বলেছেন, বাছা! পঞ্চদশ দিনে
হইবে আমার জীবন ছিন্ন॥

(৭)

চিরদিন আমি পূজিব শঙ্কর
তাঁ'রি পদে মোর অচলা ভক্তি।
নিয়ে চল, বাপ্! বারাণসী ধামে
প্রসাদে তাঁহার পাইবে মুক্তি॥

(৮)

শুনিয়া পিতার করুণ-বচন ;
হৃদয়ে হইল বিষম ক্রোধ।
বলিলাম শুধু "কে, সে গঙ্গাধর—
সমুচিত তা'রে দিব প্রতিশোধ।

(৯)

কবিরাজী ক'রে বেচে ঘৃত তেল—
সম্বল শুধু 'চ্যবনপ্রাশ'।
সুস্থ শরীরে অমঙ্গল কথা
শোনাতে তাহার নাহিক ত্রাস॥"

(১০)

পিতা কহিলেন, "মানব সমাজে—
গ্রহণ করিলা মানবমূর্ত্তি,
গঙ্গাধর সেই দেব ধন্বন্তরি—
মিথ্যা কভু নহে তাঁহার উক্তি।"

(১১)

দেখি পিতার অন্ধ বিশ্বাস,—
দুর করিবারে মনের ভ্রান্তি।
অবশেষে গিয়া লইয়া আসিনু
ডাক্তার শ্রেষ্ঠ গৌরকান্তি।

(১২)

হেরিয়া পিতার সুকঠিন বপু—
ডাক্তারবর প্রকাশি হর্ষ।
বলিলেন—"কিছু নাহি আছে ভয়,
বাঁচিবে এখনো পনেরো বর্ষ।

(১৩)

ক্রমে ক্রমে দিন গত চতুর্দ্দশ,—
সময় নহে তো কাহারো দাস।
শুধু বিভু বই, তাঁহারি আদেশ
যথাকালে সবে করে প্রকাশ॥

(১৪)

পঞ্চদশ দিনে হেরিনু প্রভাতে—
পিতৃ বদনে অপূর্ব্ব কান্তি,
হরষে আমার চিত পুলকিত
পাইনু একটা গভীর শান্তি।

(১৫)
সে সুখ শান্তি সহসা ডুবিল :—
শোকসিন্ধু এ জীবনে ঘোর,
পিতার কাতর আহ্বান ধ্বনি
পশিল যখন শ্রবণে মোর ॥

(১৬)
দিবসের শেষে ধাইনু ত্বরায়
তাঁহার চরণ প্রান্ত পাশে,
হেরিনু— নিষ্প্রভ বদন, তপন
যেন গো হ'য়েছে, দিবস শেষে ॥

(১৭)
বলিলেন তিনি—"দেখ্‌রে সুরেন্!
শিব জ্বর মোরে করিল স্পর্শ।
গঙ্গাধর বাণী নহেরে মিথ্যা
(তাই) মরণেও মম হতেছে হর্ষ ॥

(১৮)
বিদেশীয় জ্ঞান করিলি অর্জ্জন
তার ফলে শুধু দেখাস্ যুক্তি,
শুধু বাছা, তোর মায়ায় আমার
এ জনম গেল,—হ'লনা মুক্তি ॥"

(১৯)
জীবন প্রারম্ভের সে মহৎ ভ্রান্তি—
পারিনি এখনো ভুলিতে হায়।
যেই ভ্রম মম পিতৃ কামনা
দিলনা পূরণ করিতে তায়।

(২০)
আয়ুর্ব্বেদ ঋষি গঙ্গাধর বাণী—
সুজীব হৃদয়ে করিল উপ্ত।
আয়ুর্ব্বেদে তাই প্রগাঢ় ভক্তি—
ভ্রম জ্ঞান আজ হয়েছে লুপ্ত ॥

দম্পতী জীবন।

প্রসূতি চর্য্যা।

(পূর্ব্ব বৎসরের বৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকা নাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ তর্কতীর্থ]

প্রসবের পর গরম জল দ্বারা প্রসূতির ক্লেদাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চালন, গাত্রে হাত বুলান প্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রসব ক্লেশ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সুস্থ হইলে প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া মন্দ মন্দ অগ্নিস্বেদ দিবে। সূতিকা গৃহের অন্ন পানীয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

তাহার পর প্রসূতিকে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সহযোগে পান করাইয়া তাহার উদরে ঘৃত ও তৈল

একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং একখানি বড় কাপড় দ্বারা উহার উদর চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ করিলে প্রসব ক্লেশ জন্ত দূষিত বায়ু উদরে অবসর না পাওয়ার কোন রূপ বিকার জন্মাইতে পারে না। সূতিকা গৃহের অন্ন পানীয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রসূতি ক্ষুধিত হইলে প্রথমে তাহাকে যথাযোগ্য মাত্রায় ঘৃত পান করাইতে হয়। ঘৃত জীর্ণ হইলে উপরি লিখিত পিপুল প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উহা খাইতে দিবে। অন্ততঃ পাঁচ দিন এই ভাবে উক্ত চূর্ণ ও যবাগূ পান করাইয়া পরে ক্রমশঃ পুষ্টিকর দ্রব্য সমূহ ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত। যাহাদের ঘৃত পরিপাক করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহাদিগকে উক্ত ক্রমে কেবল যবাগূ খাইতে দিতে হয়।

সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রসূতিকে আর যবাগূ খাইতে দেওয়ার রীতি প্রায় দেখা যায় না, যে দিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন কোন দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় না, তাহার পর দিন দশমূল পাঁচন ও ঘৃত সহ উল্লিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ অথবা শুঠ, পিপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ খাইতে দিয়া থাকে। ক্ষুধার সময় ঘৃত যুক্ত চিঁড়াভাজা এবং কিছু দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয়। তিন দিন এই নিয়মে রাখিয়া চতুর্থ দিবসে পুরাণ মিহি চাউলের অন্ন, কিঞ্চিৎ ঘৃত, অল্প লবণ ও বেশী গোলমরিচের ঝাল যোগে, কলা, পটোল, বেগুন, মাগুর বা কই মৎস্য প্রভৃতির দ্বারা সম্পন্ন রসযুক্ত ঝোল, খাইতে দেয়। এইরূপে খাদ্য বিষয়ে কিছুদিন সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পরে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায়। প্রসব হওয়ার পর অন্ততঃ দেড়মাস পর্য্যন্ত প্রসূতি অতি লঘু পথ্য ভোজন, প্রত্যহ তৈল মাখিয়া স্বেদ গ্রহণ, হলুদ তৈল মর্দ্দন করিবেন। পরিশ্রমের কাজ বা বিহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের দেশে প্রসূতিরা কেহ নয়দিন, কেহ এগার দিন, কেহ তের দিন, কেহবা একুশদিন আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি বিশুদ্ধি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্তগৃহে প্রবেশ করেন।

শিশুচর্য্যা।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা নবকুমারের নিয়ম নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার খাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

চরক পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রথম দিন যেমন ঘৃত ও মধু যোগে সুবর্ণ ভস্ম বা অসম পরিমাণে ঘৃত ও মধু, শিশুকে পান করান হয়, তেমনি নারীদুগ্ধও পান করিতে দিতে পারা যায়। কিন্তু প্রসবের পর অনেক সময়ে তিন চারি দিন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বাহির হয় না, সেই কারণে হউক অথবা উপযুক্ত স্বজাতীয় ধাত্রীর অভাবেই হউক এখন অনেক স্থানে তিন দিন শিশুকে নারী দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয় না। এই তিন দিন পাতলা নেকড়ার পলিতা করিয়া তাহার দ্বারা গোরুর দুধ পান করান হয়। চতুর্থ দিন মাতৃ স্তন্যও পান করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু যদি স্বজাতিয়া স্নেহশীলা কোন ও স্ত্রীলোকের স্তন্য শিশুকে পান করাইবার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে জন্মের পর প্রথম তিন দিন ও

নারীদুগ্ধ পান করিতে দেওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু গর্ভে স্থিতিকালে যে সকল রসাদির দ্বারা শিশু বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় স্তনের দুগ্ধও তজ্জাতীয় রস, উহা পূর্ব্ব হইতে সাত্ম্য বলিয়া প্রসবের পর খাওয়াইলে ও হঠাৎ নূতন বস্তু খাওয়ার জন্য শিশুর কোন রূপ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নারী দুগ্ধের জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি সর্ব্বগুণ সম্পন্না স্বজাতীয়া ধাত্রী মিলেনা এবং তিন চারিদিন মাতার দুগ্ধের অভাব হয় বলিয়া অগত্যা গোদুগ্ধ পান করাইবার রীতি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। স্তন দুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করান উচিত। ছাগ দুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধে নারীদুগ্ধের অনেক সমান গুণ আছে। তবে ঐ সকল দুগ্ধ যেন ঘন না হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যত প্রকার কৃত্রিম দুগ্ধ আছে, তাহা শিশুশরীরের বিশেষ অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর।

কৃত্রিম দুগ্ধের যদি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধই প্রধান উপাদান হয়, তাহা হইলেও অপরাপর দ্রব্যের সংযোগ থাকাতে, তাহাতে যে গুণান্তর আসে না, তাহার কারণ কি? আহার্য্য দ্রব্যের সহিত প্রথম হইতে অনুপ-যোগী দ্রব্য খাওয়াইলে শরীরের স্বাস্থহানি অনিবার্য্য।

স্তনের দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় প্রথমে স্তনটী পরিষ্কার করিয়া লইয়া এবং কিছু দুগ্ধ গালিয়া বালককে খাইতে দিতে হয়। গালিয়া না ফেলিলে হঠাৎ বেশী পরিমাণে দুগ্ধ মুখে যাইয়া গলনলী বদ্ধ করিয়া দিতে পারে এবং সহসা বেশী দুগ্ধ পান করিয়া কাস শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে।

দুগ্ধ পান করাইবার একটী সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। ঠিক সময়ে আহার না করাইলে বিষমাশন জন্য অনেক ব্যারাম জন্মিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধারও বৃদ্ধি হয়। এই জন্য কেবল স্তনের দুগ্ধে উদর পূরণ হয় না। সে সময়ে ক্রমে গরু ছাগলের দুধ নিয়মিত সময়ে খাওয়াইতে হয়। অন্ততঃ ছয়মাস পর্য্যন্ত শিশুকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন রূপ দ্রব্য সাগু, বা বালি প্রভৃতি খাওয়ান উচিত নহে। ক্ষুধিতা, শোকার্ত্তা, অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া, গর্ভ ও জ্বরের অবস্থায় শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করাইতে নাই।' শিশু খাইতে না চাহিলে তাহাকে কোন ক্রমেই খাওয়ান কর্ত্তব্য নহে।

শিশুকে হরিদ্রা তৈল মাখাইয়া সহ্যমত রৌদ্রপক্ক জলে স্নান করাইবে, এবং প্রত্যহ চক্ষুতে কাজল দিতে হয়, কাজলে চক্ষুর জল শুকাইয়া নির্ম্মলতা আনয়ন করে। শিশুকে আলোকযুক্ত চারিধারে বাতাস শূন্য, অথচ একদিকে বাতাসযুক্ত গৃহে ঋতুর অনুরূপ মনোরম কোমল শয্যায় শয়ন করাইবে। শয্যা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। শিশুর ব্যবহৃত কাপড়ের জিনিসগুলি ময়লা অথবা মলমূত্রাদি সংযুক্ত হইলে তাহা উত্তমরূপে সাবান বা ক্ষারাদির দ্বারা ধুইয়া তাহাতে যব, সরিষা, তিসি, হিং, গুগ্‌গুল, বচ, হরীতকী, জটামাংসী, চোরকাঁটা, প্রভৃতির চূর্ণ এবং ঘৃত মিশাইয়া তাহার ধুম দিয়া লইতে হয়, ও সুগন্ধি বাষ্প দিয়া সৌরভ যুক্ত করিতে হয়।

বালকের শরীর দৃঢ় না হইতেই অনেকে আদর করিয়া উহাকে বসাইতে ও দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন, এরূপ আদরে যে বালকের অঙ্গ চিরদিনের মত বিকৃত হইতে পারে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। বসিবার উপযুক্ত শরীরের দৃঢ়তা না আসিলে শিশুকে বসাইলে যে কুব্জ ও বধির হইতে পারে, ইহা সকলেরই মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

কুমারের খেলনা সকল বিচিত্র শব্দযুক্ত, দেখিতে মনোহর। পাতলা অতীক্ষ্ণাগ্র এবং মুখের মধ্যে প্রবেশ বা ভয় উৎপাদন করিতে না পারে, এরূপ হওয়া উচিত।

শিশু কোনরূপ উৎপাত করিলে বা আহার করিতে না চাহিলে ভূত প্রেতের ভয় দেখাইয়া নিজের বশে আনিবার চেষ্টা করা আমাদের দেশে সচরাচর একটা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যে শিশুর মানসিক অবস্থার কত অবনতি ঘটিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা যায় না। মানুষের মনে সাহস থাকা নিতান্ত উচিত। প্রথম হইতে অযথা ভাবে যদি শিশুর মনে ভয় সঞ্চার করা হয়, তাহা হইলে উহার মন দৃঢ় ও সাহসপূর্ণ না হইয়া ভীরু হইবেই। বাল্যকালের এই কুসংস্কার বশতঃ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও অকারণ ভয় ত্যাগ করিতে না পারায় চিরকালের জন্য সাহসশূন্য হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

নিদানপরিশিষ্টং।

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

জ্বরঃ।

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥
স্বতে দেবমনুষ্যেভ্যো নান্যো বিষহতে তু তং।
শেষাঃ সর্ব্বে বিপদ্যন্তে তৈর্য্যকযোন্যা জ্বরার্দ্দিতাঃ॥
জন্মাদৌ নিধনেচৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ।
অতস্তমাদৌ বক্ষ্যামি স রোগানীকরাট্ স্মৃতঃ॥
তৈ*র্ব্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্ধ্‌তৈস্ত্রিমার্গগৈঃ।

দোষৈঃ।

বিক্ষিপ্যমাণোঽন্তরাগ্নির্ভবত্যাশু বহিশ্চরঃ ॥
রুণদ্ধি চাপ্যপাং ধাতুং যস্মাত্তস্মাজ্জ্বরাতুরঃ।
ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ নচ স্বিদ্যতি সর্ব্বশঃ ॥

দৌর্ব্বল্যমবিপাকশ্চ প্রলাপশ্চ ভ্রমঃ ক্লমঃ।
শীলবৈকৃতমঙ্গঞ্চ শরীরস্যাবসন্নতা ॥
প্রদ্বেষো মধুরেভ্যশ্চ স্বধর্ম্মেষু ন চিন্তনং।
গুরুবাক্যেঽভ্যসূয়া চ বালেষু দ্বেষ এবচ ॥
পরিক্লেশনমত্যর্থং ভোজ্যে মাল্যেঽনুলেপনে।
কট্বম্ললবণোষ্ণেষু প্রিয়ত্বং দীর্ঘসূত্রতা ॥
যুক্তস্য কর্ম্মণো হানিস্তথা কার্য্যে প্রতীপতা।
নিদ্রাধিক্যমনিদ্রা চ বিনামো দন্তহর্ষণং ॥
ভবন্ত্যেতানি লিঙ্গানি নরাণাং ভাবিনি জ্বরে ॥

ভবন্তি বিবিধা বাতবেদনাঃ পাদ সুপ্ততা।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্রকষায়তা।
উরুসাদো হনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজানুনোঃ।
শুষ্ককাসবমী লোমদন্তহর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ।
অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্প্রলাপোষ্ণকামিতাঃ।
নৃণামেতানি লিঙ্গানি জানীয়াদ্বাতিকে জ্বরে ॥

তীব্রোষ্মা রক্তকোঠাশ্চ শীতেচ্ছারুচিরেব চ।
পিত্তোদ্ভবে জ্বরে লিঙ্গং প্রাহুরেতন্মনীষিণঃ ॥

অত্যর্থং পিড়কা দেহে প্রসেকঃ শ্লেষ্মণো বমিঃ
শ্বসনং মৃদুতা বহ্নের্খাস্যাক্ষিষু শুক্লতা।
উষ্ণাভিলাষিতা চোপলেপো হৃদি কফজ্বরে ॥
অতিপ্রবৃত্তির্বাক্যানাং বাতপিত্তজ্বরে ভবেৎ ॥
কফপিত্তপ্রবৃত্তিশ্চ স্বেদস্তম্ভো মুহুর্মুহুঃ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে লিঙ্গান্যেতান্যপি ভবন্তি হি ॥

তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি।
সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহান্ স্বেদোঽথবা ন বা।
গীতনর্ত্তনহাস্যাদি বিকৃতেহাপ্রবর্ত্তনং।
লিঙ্গান্যেতানি মুনয়ঃ সন্নিপাতজ্বরে বিদুঃ ॥
দ্ব্যল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্ স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্।
সমৈশ্চৈকো বিকারাস্ত সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ ॥

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসো ব্যথা।
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে॥
শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা পিপাসাদাহরুগ্ব্যথাঃ।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং পিত্তাবরে বিদুঃ॥
ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।
মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে॥
সন্ধ্যস্থিশিরসঃ শূলং প্রলেপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশুষ্কতা॥
রক্তবিণ্মূত্রতাদাহঃ স্বেদস্তৃট্ বলসংক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গা পিত্তে গরীয়সি॥
আলস্যারুচিহৃল্লাসদাহবম্যরতিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রা কাসেন চাদিশেৎ॥
প্রতিশ্যাচ্ছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দ্দবং।
হীনবাতে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিক্যে মতং॥
হারিদ্রমূত্রনেত্রত্বং দাহস্তৃষ্ণা ভ্রমোঽরুচিঃ।
হীনবাতে মধ্যকফে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতং॥
শিরোরুক্ বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপশ্ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
হীনপিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকে মতং॥
শীতকো গৌরবংতন্দ্রা প্রলাপোঽস্থিশিরোঽতিরুক্।
হীনপিত্তে বাতমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকে মতং॥
বাতবর্চ্চোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণা দাহোঽরুচির্ভ্রমঃ।
কফহীনে বাতমধ্যে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতং॥
শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যায়ো মুখশোষোঽতিপার্শ্বরুক।
কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকে মতং॥

এতস্তালুকিতন্ত্রাদাবন্যথা পঠিতং যথা॥

বাতপিত্তাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য জ্বরেঽঙ্গমর্দ্দস্তৃট্ তালুশোষপ্রমীলকাঃ।
তাধ্মানতন্দ্রারুচয়ঃ শ্বাসকাসভ্রমশ্রমাঃ॥
পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
অন্তর্দাহো বহিঃ শীতং তস্য তন্দ্রা চ বর্ত্ততে।
তুদ্যতে দক্ষিণংপার্শ্বমুরঃশীর্ষগলগ্রহাঃ।
নিষ্ঠীবেৎ কফপিত্তঞ্চ তৃষ্ণা কণ্ঠশ্চদূয়তে।
বিড়্ভেদশ্বাসহিক্কাশ্চ বাধন্তে সপ্রমীলকাঃ।

বন্ধুকন্ধু চ তৌ নাম্না সন্নিপাতাবুদাহৃতৌ ॥
শ্লেষ্মানিলাধিকো যস্ত সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্ত শীতজ্বরো নিদ্রা ক্ষুত্তৃষ্ণা পার্শ্বসংগ্রহঃ।
শিরোগৌরবমালস্যমন্যাস্তম্ভপ্রমীলকাঃ।
উদরং দহ্যতে চাস্ত কটী বস্তিশ্চ দূয়তে।
সন্নিপাতঃ স বিজ্ঞেয়ো মকরীতি সুদারুণঃ।
বাতোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্ত জন্তোঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য তৃষ্ণাজ্বর গ্লানি পার্শ্বরুগদৃষ্টিসংক্ষয়াঃ।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং দাহ উরুসাদো বলক্ষয়ঃ।
সরক্তঞ্চাস্য বিন্মূত্রং শূলং নিদ্রাবিপর্য্যয়ঃ।
নির্ভিদ্যতে গুদঞ্চাস্য বস্তিশ্চ পরিশুষ্যতি।
আযম্যতে ভিন্ততে চ হিক্কতে বিলপত্যতি।
মূর্চ্ছতি ক্ষায়তে রৌতি নাম্না বিস্ফুরকঃ স্মৃতঃ ॥
পিত্তোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য দাহজ্বরো ঘোরো বহিরন্তশ্চ বর্দ্ধতে।
শীতঞ্চ সেবমানস্য কুপ্যতঃ কফমারুতৌ।
ততশ্চৈনং প্রবাধস্তে হিক্কাশ্বাসপ্রমীলকাঃ।
বিসূচিকা পর্ব্বভেদং প্রলাপো গৌরবং ক্লমঃ।
নাভিপার্শ্বরুজা তস্য স্বিন্নস্যাশু প্রবর্দ্ধতে।
স্বিদ্যমানস্য রক্তঞ্চ স্রোতোভ্যঃ সং প্রবর্ত্ততে।
অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে।
নহি জীবত্যহোরাত্রমেতেনারিষ্টবিগ্রহঃ ॥
কফোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য শীতজ্বরস্বপ্নগৌরবালস্যতন্দ্রয়ঃ
ছার্দ্দির্মূর্চ্ছা তৃষা দাহতৃপ্ত্যরোচকহৃদগ্রহাঃ।
ষ্ঠীবনং মুখমাধুর্য্যং শ্রোত্রবাগদৃষ্টিনিগ্রহঃ।
শ্লেষ্মণো নিগ্রহঞ্চাস্য যদা প্রকুরুতে ভিষক্।
তদা তস্য ভৃশং পিত্তং কুর্য্যাৎ সোপদ্রবং জ্বরং।
নিগৃহীতে চ পিত্তে তু ভৃশং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
নিরাহারস্য সোঽত্যর্থং মেদো মজ্জাস্থি ধাবতি।
অথাত্র প্লাতি ভুঙ্ক্তে বা ত্রিরাত্রং ন স জীবতি।
মেদোগতঃ সন্নিপাতঃ কপ্ফণঃ সমুদাহৃতঃ।

কামান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ ভয়াচ্চায়ং প্রপদ্যতে ॥
হীনমধ্যাধিকৈর্দোষৈঃ সন্নিপাতো যদা ভবেৎ।
তস্য রোগাস্তএবোক্তাঃ প্রায়ো দোষবলাশ্রয়াঃ ॥
ওজো বিস্রংসতে যস্য পিত্তানিলসমুচ্ছ্রয়াৎ।
স গাত্রস্তম্ভশীতাভ্যাং শয়নেপ্সুরচেতনঃ।
অপি জাগ্রৎ স্বপন্ জন্তুস্তন্দ্রালুশ্চ প্রলাপবান্।
সংহৃষ্টরোমা স্রস্তাঙ্গো মন্দসন্তাপবেদনঃ।
ওজো নিরোধজং তস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে বিদুঃ।
নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসং।
সংস্রস্তগাত্রং সংন্যাসং বিদ্যাৎ সর্ব্বাত্মকে জ্বরে ॥
নাত্যুষ্ণশীতোঽল্পসংজ্ঞো ভ্রান্তপ্রেক্ষী হতপ্রভঃ।
সাশ্রুনির্ভুগ্নহৃদয়ো ভক্তদ্বেষী হতস্বরঃ।
খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবিণ্মূত্রবর্জ্জিতঃ।
শ্বসন্ নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবৈর্যুতঃ।
তমভিন্যাসমিত্যাহুর্হতৌজসমথাপরে ॥
তত্রাভিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্।
সব্যথাশোথবৈবর্ণ্যং জ্বরমাপাদয়েদ্ভৃশং ॥
কামশোকভয়ক্রোধৈরভিষক্তস্য যো জ্বরঃ।
সোঽভিষঙ্গো জ্বরো জ্ঞেয়া যশ্চ ভূতাভিষঙ্গজঃ ॥
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাত্তথান্যৈর্বিষসম্ভবৈঃ।
অভিষক্তস্য চাপ্যাহুর্জ্জ্বরমেকেঽভিষঙ্গজং ॥
তত্রাভিচারিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্হূয়মানস্য তপ্যতে।
পূর্ব্বং চেতস্ততো দেহস্ততো বিস্ফোটতৃড্ভ্রমৈঃ।
সদাহমূর্চ্ছৈর্গ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ ॥
সর্ব্বাঙ্গদহনঞ্চৈব হ্রীর্নিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ।
ধ্যানং নিশ্বাসবহুলং লিঙ্গং কামজ্বরে স্মৃতং ॥
শোকজে বাষ্পবহুলং ত্রাসপ্রায়ং ভয়জ্বরে ॥
ক্রোধজে বহুসংরম্ভং ভূতাবেশে ত্বমানুষং ॥
বিষান্মোহমদগ্লানিভূর্ম্মিষ্ঠং ভবতি জ্বরে ॥
কেষাঞ্চিদেষাং লিঙ্গানাং সন্তাপো জায়তে পুরঃ।
পশ্চাতুল্যস্তু কেষাঞ্চিদেষু কামজ্বরাদিষু ॥

কামাদিজানামুদ্দিষ্টং জরাণাং যদ্বিশেষণং।
কামাদিজানামন্যেষ্যাং রোগাণামপি তৎ স্মৃতং॥
যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ॥
অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রসাতি স *।
ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য ঘোরং কুর্য্যাজ্জ্বরং নৃণাং॥
কফস্থানবিভাগেন যথাসংখ্যং করোতি হি।
সততান্যেদ্যুকত্র্যাখ্যচতুর্থান্ সপ্রলেপকান্॥
স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিদ্বিমুঞ্চতি।
গ্লানিগৌরকার্শেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে॥
বেগেঽতিসমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে।
ধাত্বন্তরস্থো লীনত্বান্ন সৌক্ষ্ম্যাদুপলভ্যতে॥
কফস্থানেষু বা তিষ্ঠন্ দোষো দ্বিত্রিচতুর্ষু বা।
বিপর্য্যয়াখ্যান্ কুরুতে বিষমান্ কৃচ্ছ্র সাধনান্॥
হীনমধ্যাধিকৈর্দোষৈস্ত্রিসপ্তদ্বাদশাহিকঃ।
জ্বরবেগো ভবেত্তীব্রো যথাপূর্ব্বং সুখক্রিয়ঃ॥
যথা বেগাগমে বেলাং ছাদয়িত্বা মহোদধেঃ।
বেগহানৌ তদেবাম্ভস্তত্রৈবান্তর্নিধীয়তে।
দোষবেগোদয়ে তদ্বদুদীর্য্যেত জরোঽস্য বা।
বেগহানৌ প্রশাম্যেত যথাম্ভঃ সাগরে তথা॥
শোথঃ সরক্তো নাসায়াং ব্যথা স্রাবো জ্বরস্তথা।
বাল্যেঽস্যস্থগুখানমাহকাখ্যং জ্বরং বদেৎ॥

---

* দোষঃ।

——:*:——

হরীতকীর আত্মপ্রকাশ।

(শ্রীসরোজকুমার মহলানবীশ)

—:০:—

সুরাসুরের সম্মিলিত শক্তিতে ক্ষীরদার্ণব মথিত হ'য়ে যে অমৃত উঠেছিল, যা'র প্রলোভনে স্বয়ং অনাদি কারণ দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ, যা'র জন্য পীত বসনধারী বনমালী মোহিনীরূপ ধারণ ক'রেছিলেন, যা'র প্রভাবে দেববৃন্দ অজর অমর, সেই দিব্য সুধারই আমি বংশ সম্ভূত। যেহেতু স্বয়ং দক্ষপ্রজাপতি পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রেছেন যে—

"পপাত বিন্দুর্ম্মেদিন্যাং শক্রস্য পিবেতোমৃতং।
ততো দিব্যাং সমুৎপন্না সপ্তজাতি হরীতকী"।

আমি কম কিসে? আমি অবতার, ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর আমরা, মানব যাহাতে নীরোগ হয়ে স্বীয় ধর্ম্মপথে বিচরণ ক'রতে পারে, সেজন্য স্মরণাতীত কাল হ'তেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

আমরা সাত ভাই—বিজয়া, রোহিণী,—পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। নাম শুনে হয়তো মনে করতে পার এবং জিজ্ঞাসাও ক'রতে পারে—তোমরা স্ত্রীলোক ভতো হ'তে পারনা। সে ভুলটা কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রকারও ক'রে গেছেন। তাঁরাও আমাদিগকে স্ত্রীলোক ক'রে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা আগেই জানতুম যে, এমন দিন আসবে, যে দিন বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র মনোমোহন,আসর ত্যাগ করবেন এবং জ্যোৎস্না যামিনী কামিনী আসর জমকাবেন। জ্যোৎস্না, যামিনী যখন পুরুষ হ'তে পারে, তখন, বিজয়া রোহিণী কোন্ হিসাবে পুরুষ হবেনা? আমাদের চেহারা যদিও বিভিন্ন রকমের এবং বেশ সুস্পষ্ট, তবুও তোমরা কেন যে বহু খুঁজেও আমাদের বের করতে পাচ্ছনা তা' তো বুঝতেই পাচ্ছিনা। যাহোক আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেরই দিতে হচ্ছে, কারণ তোমাদের কেউ আমাদের চেননা।

প্রথম বিজয়া। বেশ নাদুস্ নুদুস্ গোল-গাল চেহারা। তা'র শিরা উপশিরা খুঁজেও বের করতে পারবেনা। তা'র উপর তা'র গুণ গরিমাও সবার চেয়ে ঢের বেশী। তা'র সুদৃষ্টি হ'লে কোন্ রোগের সাহস যে সেখানে যায়! তার পর রোহিণী। সে এত গোল যে, কার এণ্ড মহলানবিশের ভাল ফুটবলও তার কাছে হার মানে, তার একটা বিশেষ গুণ এই যে,তা'র স্মরণ নিলে ব্রণ আসতে পারে না শ্রীমৎ ভাবমিশ্রই ব'লেছেন,—বিজয়া সর্ব্ব-রোগেষু রোহিণী ব্রণ রোহিণী। তাকে না পেয়ে না জানি ব্রণে কত কষ্টই পাচ্ছো—পুতনা বিংশ শতাব্দীর যুবকদের ন্যায় কঙ্কাল সার! তার হাড়গুলো যেন চামড়া ফেটে কলিযুগের নমুনাটা দেখবার জন্য উদগ্রীব। তার গুণ যে নেই তা' নয়। প্রলেপ কাজটা তার একচেটে। তারপর অমৃতা। সে তো কলির ভীম। মাংস বহুল চেহারা।

ম্যালেরিয়ার দেশে তা'র জন্ম, অন্যলোক এ কথা বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। তার কাজটাও বেশ! ঠিক যেন পাঠশালার গুরু মশাই! গুরুমশাই বেতের চোটে তাঁর ছাত্রগুলোকে ঠিক রাখেন. সে তা'র প্রভাবে তোমাদের দেহটাকে সংশোধন ক'রতে খুবই ওস্তাদ। অভয়া, সে তো পাচটা রেখা বিশিষ্ট অদ্ভুত জীব। গুণ কিন্তু তার বেজায়। সে একজন বড় Eye specialist। ডাঃ জে, এন্, মৈত্র বল, আর যাহারই নাম কর, তাঁরা তা'র কাছে কিছুই নন। (দোহাই তোমাদের যেন party feelings না জাগে। চোখের যে কোন রোগ হোক, তা'কে ডাকতে যেন ভুলো না। তার পর জীবন্তী। আমাদের ভেতর সেতো রাজপুত্র। এমন চেহারা মেলা ভার। টুকটুকে রং। কবির সুরে—

'বর্ণ জিনি স্বর্ণ চাঁপা—'

গুণও কিন্তু ঢের। একেবারে মণিকাঞ্চণ সংযোগ। সেতো common medicine of diseases over exist। তারপর চেতকী! সে তো অনেকটা অভয়ার মত। তবে রেখা-মাত্র তার তিনটে। তোমরা যেমন কেহ কৃষ্ণকায় ও কেহ শ্বেতাঙ্গ, চেতকীও সেরূপ কৃষ্ণ ও শ্বেত ভেদে দু'প্রকার। শ্বেত স্বাধীন—লম্বাও একেবারে ছয় আঙুল, আর কৃষ্ণ-পরাধীন—মাত্র এক আঙুল। আমাদিগকে তোমরা যেখানে চূর্ণরূপে ব্যবহার করবে চেতকী সেখানে হাজির—যেন ঠিক দধীচি মুণি; কিরূপ আত্মত্যাগ। চেতকীর একটু বিশেষ গুণ আছে, যা'রা তার ছায়া মাড়িয়েছে, কিম্বা হাতের মুটোয় তাকে নিয়েছে, তারাই কিন্তু টেরটা পেয়েছে বেশ। হাতেই নাও, আর ছায়াতেই বসে,—মলত্যাগ না করে কিন্তু থাকতে পারবে না, মনে থাকে যেন। শাস্ত্রকারেও বলেছেন, –

"চেতকী পাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবদ্বিরেচ্যতে বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥

আমরা কিন্তু রসিক কম নই! একেবারে পঞ্চরসের সমাহার! তবে নেহাৎ ঠেকে লবণ রসটাকেত্যা গ করেছি—কেন করেছি—নাই বল্লাম। সব রস কিন্তু এক জায়গায় থাকে না,সতর্ক পাহাড়াওয়ালাদের ন্যায় বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে আছে। মধুর রস বেশ চালাক, একেবারে মজ্জাগত হয়ে আছে। অম্লরস স্নায়ুতেই তা'র বাসস্থান ঠিক ক'রে নিয়েছে। তিক্ত, কটু, কষায় যথাক্রমে বৃন্তে, ত্বকে ও অস্থিতে বিচরণ কচ্ছে। আমাদের মটো হলো—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

তোমাদের জন্যই আমাদের পৃথিবীতে আসা। যখনই কোষ্ঠ-কাঠিন্য, তখনই চিবিয়ে খাও—সব ঠিক্। চোখ লাল হ'য়েগেল, আমাদিগকে একটু মধু দিয়ে চোখের চারদিকে লাগিয়ে দাও ব্যাস্। জন্মিয়ে শিশু মাই খাচ্ছেনা, জীবে আমাদের চূর্ণ একটু লাগিয়ে দাও বেশ হ'য়ে যাবে। বসন্তে দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে—আমাদের অস্থি কোমরে বেঁধে রেখো কোন ভয় নেই! আমার আবার ভয়

কিসের? যখনই জন্মেছি, তখনই জেনেছি, তোমরা আমাকে বৃন্তচ্যুত করবে—হামান-দিস্তায় ফেলে গুঁড়িয়ে দেবে, তারপর উদরসাৎ ক'রবে। আমার ভয় কিসের? কিন্তু বলি কখন কি ক'রে আমাদের খেতে হয় তাতো জান? আমারই সেটা ব'লে দেওয়া উচিত।

যদি আমাদের চিবিয়ে খাও, অগ্নি সন্দীপন হ'বে, আর পিশে খেলে মল শোধিত হ'বে। আর যদি সিদ্ধকরে খাও, তবে ধারক হ'বে। হরীতকী যদি ভেজে খাও, তবে ত্রিদোষ নাশক'র্‌বে অর্থাৎ কোন রোগই আর থাক্‌তে পারবেনা।

আর যারা ব্যাধি বর্জ্জিত হ'য়ে দীর্ঘ জীবন লাভ ক'র্‌তে চাও, তারা গ্রীষ্মকালে পিপুল, বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে চিনি, হেমন্ত-কালে শুঁঠ ও বর্ষার প্রথম ভাগ গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। আর একটা কথা পথক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাসী, পিত্ত প্রকৃতির লোক গর্ভবতী এবং যাদের রক্তস্রাব হ'য়েছে তাদিগকে কিন্তু আমরা মোটেই ভাল বাসি না। কাজেই তারা যেন আমাদিগকে গ্রহণ না করে। তোমাদের শাস্ত্রও বলে—

"অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ
কৃশোলঙ্ঘনক কর্ষিতশ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী নারী বিমুক্তরক্ত স্তভয়ান্ন খাদেৎ

তোমাদের দেশে ঢের ঢের ফল আছে আমি বেশ জানি। আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপুরী, বেল, তাল ইত্যাদি। আমি তো ভুলেও কোন দিন শুন্‌তে পাইনি যে, এগুলোকে তোমরা ফল বল। অবতার হিসাবে আমিই শ্রেষ্ঠ, আর ফল বলিলেও আমিই বড়। ফল বলা মাত্রেই আমাকে ও অপর দুটীকে বুঝাবে। যেই বল্‌বে ত্রিফলা, তখনই বুঝবে আমরা ও আমার দুটী জ্ঞাতি ভাই, কিন্তু আম,কাঁঠাল, জাম কাউকে বুঝাবে না। এত গুণ না থাক্‌লে কি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে শ্রীমতী বলেছিলেন—

'মরিলে বাঁধিয়ে রেখো হরীতকীর ডালে'। তোমরা হয়তো বল্‌বে এ কথাটাতো কোন দিন শুনিনি। আরে কি ক'রেই বা শুন্‌বে? তোমাদের মত পাপী যারা আমাদের মত উপকারীর আবাসস্থল হরীতকী গাছ কাট্‌তেও দ্বিধা বোধ করে না তারা কি ক'রেই বা শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝবে। অবশ্য তিনি বলেছিলেন 'মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালের ডালে'। বলার উদ্দেশ্য ইহা ছিল না, শুধু কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে বাহ্যশক্তি লোপ পাওয়ায় হরীতকীর স্থানে তমাল ব'লে ফেলে ছিলেন।

যাক্—এখন আমার ঠিকানাটা দিয়েই তোমাদের নিকট এ যাত্রা বিদায় নিচ্ছি। আমি নির্জ্জনতাই ভালবাসি। কাননই আমার আশ্রয়—তবে লোকের বিশেষতঃ কোন কোন কবিরাজ মশাইদের পোষা হয়ে যে না আছি-তাও নয়। তবে সেতো মরমে মরিয়া—। আমার অভিভাবকটী বেশ কিন্তু। তাকে পেয়ে খুবই সুখেই আছি। তিনি আর কেহই নন—স্বয়ং ভোলানাথ। কথিত আছে—

"হরীতকী বনে জাতা।
হরেন প্রতিপালিতা॥
সর্ব্বরোগ হরেন্নিত্যং।
তস্যানাম হরীতকী॥"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—পূজার ছুটীর পরে ২৭শে কার্ত্তিক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় খুলিয়াছে এবং পূর্ব্ববৎ উত্তমরূপে অধ্যাপনা চলিতেছে।

পরলোক। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগের নায়ক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি সাহিত্যের মায়া, সমাজের মায়া, সংসারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের চির সুহৃদ ছিলেন। ইহার উন্নতি কল্পে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া অনেক সময়ই অনেক কার্য্য করিতেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব যতকাল থাকিবে, ততকাল আমাদের নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে যেরূপ কষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, বিয়োগ বিধুরা সহধর্ম্মিণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, পুত্র দুইটীকে কি বলিয়া আশ্বাস বাণী প্রদান করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। পরম কারুণিক শ্রীভগবান তাঁহাদের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন। তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থ ১ দিন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘ।—এই সঙ্ঘ উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে অধিরোহন করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়-ভবনেই হইয়াছিল। তাহার পরে ইহার অক্টোবরের অধিবেশন ৫নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট শেঠেদের ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। দুইটী অধিবেশনেই পাগল হরনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সংপ্রতি গত ৪ কার্ত্তিক ৫৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে ইহার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহাশয়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন "বিজয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃতি করণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। মিলিটারী অ্যাকাউন্টেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বি, এল, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পীযুষকান্ত মজুমদার "জল বিহার" কীর্ত্তনে এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দত্ত তাঁহার রচিত কয়েকটি শিশু সঙ্গীত কয়েকটি বালক বালিকা দ্বারা গাহয়াইয়া সকলের পরিতৃপ্তি করিয়াছিলেন। সভায় অন্যান্য গীত বাদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। তিন শত পুরুষ এবং বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি।—গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে কলিকাতায় কয়েকজন উদ্যমশীল নবীন কবিরাজের চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত

হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুল বিহারী দত্ত বি, এ্য, সি এই সমিতির সম্পাদক ও প্রধান উদ্যোগী। আয়ুর্ব্বেদ জলধি মন্থন পূর্ব্বক নানারূপ গবেষণা করাই এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আগামী ৯ই অগ্রহায়ণ ওরিয়েন্টাল সেমিনারির বাটীতে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা কর্ত্তৃক তাঁহাদের চির প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিজয়া-সম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা ইহার অধিবেশনের পরে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিব। এই সভায় কলিকাতার সভাস্থ কবিরাজ এবং অনেকগুলি ডাক্তার ও আয়ুর্ব্বেদানুরাগী উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন। এই সভা মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেকগুলি সভা স্থাপিত হইয়াছিল।—কোনটিরই সাড়া শব্দ আর পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র এইটিই বহুকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন।—পাগল হরনাথের দ্বারা উদ্বোধিত "হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবনের" সংবাদ আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৫৪ নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজারে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহা স্থাপন করেন। আমরা পাঠকদিগকে বিশেষ আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, এই "আয়ুর্ব্বেদ ভবন" অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হইলেও উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই ধাবিত হইতেছে। শ্রীমান ইন্দুভূষণ অনেকগুলি জীর্ণ জটিল—রোগীর চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বড়বাজারে ঠাকুর হরনাথ এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই ঔষধালয়ে যাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও প্রবেশ করিতে না পারে—তজ্জন্য পত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেছেন,—তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছেন,—"চরিত্রবান হইয়া ভিক্ষা করাও শ্রেয়ঃ কিন্তু চরিত্র হীন হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তিও প্রার্থনীয় নয়। স্নেহের ইন্দু যেন কখনো চরিত্রহীন না হয়। সে দেবতা হউক।"—ঐকান্তিক ভাবে রোগীর রোগ নিবারণের চেষ্টা কর, রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে সংশয় রহিত না হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিও না,—ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে কখনও কৃত্রিমতা করিওনা—ইহাই ঠাকুরের উপরোক্ত উপদেশামৃতের উদ্দেশ্য। আমরা তাঁহার এই উপদেশ—আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে পালন করিতেছে দেখিলে সুখী হইব।

মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতানভিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন চৈনং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্॥
ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিমত্যার্থং সতাং গ্রহণমুত্তমম্।
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা॥

অর্থাৎ রোগী মাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধু সকলকে শঙ্কাকরে, কেবল চিকিৎসককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং নিঃসন্দেহে ও নির্ভয়ে তাঁহার নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করে। অতএব রোগীকে পুত্রবৎ বিবেচনা করিয়া তাহার রোগ প্রতীকারার্থ সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল থাকা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। বৈদ্য—চিকিৎসা ক্রিয়া দ্বারা লোকের হিতসাধন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, বিপুল কীর্ত্তি, সাধুগণের নিকট পরম আদরণীয়তা ও দেহান্তে স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস

৮ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল { ৩য় সংখ্যা।

কালা জ্বর।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

———:·:———

এক্ষণে দেখা যাউক যে কালাজ্বর বলিতে যে রোগ বুঝায়, তাহার উৎপত্তি ক্রম লক্ষণ এবং শারীর বিধানের কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

কালাজ্বরের উৎপত্তি ক্রম।

১। Malaria জ্বরের আবির্ভাব, অবিচ্ছেদী ভাবে জ্বরের স্থিতি, আরোগ্য লাভ, পুনরাক্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার এবং কদাচিত যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পাণ্ডুবর্ণতা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে রোগের প্রথমাবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করিলে Malariaর বীজাণু পাওয়া যায়, পরে পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করিলে স্থানবিশেষে Malariaর বীজাণুর সহিত কালাজ্বরের বীজাণু এবং কোথাও কোথাও মাত্র কালাজ্বরের বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থলে Malariaর বীজাণু গুলি নষ্ট হইয়া যায়।

২। Typhoid Symptoms রূপে কালাজ্বরের আবির্ভাব হয়। প্রথম Typhoid হইয়াছে কি কালাজ্বর হইয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের পর জ্বর মৃদু হইয়া আইসে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা—স্থল বিশেষে যকৃতের বিবৃদ্ধি, পাণ্ডু· বর্ণতা আসিয়া কালাজ্বররূপে প্রকাশিত হয়।

৩। প্রথম প্রথম কম্প দিয়া জ্বর আইসে, জ্বর ছাড়িয়া যায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। ক্রমান্বয়ে প্লীহা

এবং স্থল বিশেষে যকৃতের বৃদ্ধি ও পাণ্ডুভাব দেখা যায়।

৪। জ্বর ছাড়িয়াও আসিতে পারে কিম্বা নাও ছাড়িতে পারে, কিন্তু দিবসে দুইবার করিয়া জ্বর হয় সঙ্গে, সঙ্গে প্লীহা ও—স্থল বিশেষে যকৃতের বৃদ্ধি হয়।

৫। প্রথম প্রথম রোগী অসুস্থতা বোধ করিতে থাকে। কিন্তু কি যে হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, হঠাৎ দেখা যায় যে রোগীর প্লীহা বাড়িয়া গিয়াছে পরে ক্রমান্বয়ে কালাজ্বরের সকল লক্ষণ দেখা যায়।

কালাজ্বর লক্ষণ—দুইবার করিয়া জ্বর হওয়া কালাজ্বরের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, জ্বর অবিচ্ছেদী ভাবে আসিয়া যায়, কোথাও বা জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং পুনরায় দিবসে একবার বেগ হয়। কিন্তু কালাজ্বরের ভোগ কালের মধ্যে কোন সময় না কোনও সময় দিবসে দুইবার জ্বর আসিবেই। জ্বর যে কখন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, দিবা ভাগেই দুইবার আসিতে পারে, রাত্রে ও দুইবার আসিতে পারে, কিম্বা দিবসে একবার ও রাত্রে একবার আসিতে পারে। রোগীর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, শাদা কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিলে যেরূপ বর্ণ হয় রোগীরও সেইরূপ বর্ণ হয়। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং স্থল বিশেষে যকৃতেরও বৃদ্ধি দেখা যায়। রোগ যত পুরাতন হইতে থাকে, রোগীর শরীর ততই শুষ্ক ভাব ধারণ করে। বক্ষের নিম্নভাগে এবং পেটের উপরে নীল বর্ণের শিরাজাল দৃষ্ট হয়। গলদেশস্থ শিরাসমূহ স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর গাত্রে ময়ূরাকৃতি পিড়কা (Perpuric pafch) বাহির হয়। গলদেশে একপ্রকার ক্ষত দেখা যায় (Cancrum oris)। অনেক সময় ঐ ক্ষত এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়।

রোগীর জীবন বিপন্ন করে। রক্ত হীনতার জন্য পায়ের পাতার শোথ দেখা যায়। ঐ শোথ ক্রমশ: বর্দ্ধিত হইয়া উদরী রোগে পরিণত হয়। রোগী সর্ব্বদা ক্ষুধা অনুভব করে, কিন্তু সম্যক আহার করিতে পারে না। অনেক সময় অতীসার ও আমাশা বেথা যায়। রোগীর গাত্রের চামড়া সঙ্কুচিত হয়, চুল রুক্ষ হয় এবং উঠিয়া যায়। উপসর্গরূপে Pneomonia Bronchitcs আসিয়া উপস্থিত হয়।

কালাজ্বর উৎপন্ন হইলে শারীর দ্রব্য সমূহের যে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১। চুল—ইহা রক্ষভাব ধারণ করে এবং উঠিয়া যাইতে থাকে।

২। চর্ম্ম—ইহা পাণ্ডুবর্ণ হয়, সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। শাদা কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টানিলে যেরূপ বর্ণ দেখায় কালাজ্বরের রোগীর চর্ম্মে সেই প্রকার বর্ণ পরিলক্ষিত হয়।

৩। চর্ম্মেরও তন্নিম্নস্থ তন্তু সকলের ক্ষয় উপস্থিত হয় (Necro-biosis)। সাধারণতঃ গলদেশে ইহা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Cancrumoris। ইহা

একটী সাংঘাতিত উপসর্গ। এই ক্ষত হইতে এমন এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে যে, রোগীর কাছে থাকা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। এই ক্ষত অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে এই ক্ষত হইতে প্রভূত পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে।

৪। অন্যান্য জ্বরে জিহ্বা যে প্রকার অপরিষ্কার, থাকে কালাজ্বরে তাহা থাকে না। ইহাতে জিহ্বা বেশ পরিষ্কার থাকে।

৫। পরিপাক শক্তি কমিয়া গেলে ও রোগীর একপ্রকার দুষ্ট ক্ষুধার আবির্ভাব হয় বলিয়া রোগীর আহারের জন্য বড়ই ব্যগ্রতা দেখা যায়। পরিপাক যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া অনেক সময় অতিসার, আমশা, আমরক্ত প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়।

৬। প্লীহা—এই রোগে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নীচের দিকে প্লীহা ঝুলিয়া পড়িতে পারে, পার্শ্বে বাড়িতে পারে, কোন দিকে যে প্লীহা বাড়িবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না Malariaয় প্লীহা যে প্রকার শক্ত হয় এবং পার্শ্বে যে প্রকার পাতলা (sharp) দেখা যায়, এই রোগে সেইরূপ হয় না। ইহাতে প্লীহা নরম থাকে এবং নোড়ার আকার বিশিষ্ট হয়। রোগ পুরাতন হইলে প্লীহাও শক্ত হয়। প্লীহা এতদূর বাড়ে যে, একেবারে যকৃতের উপর গিয়া পড়ে।

যকৃত:—সাধারণতঃ প্লীহার ন্যায় ইহা তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন স্থলে কিন্তু যকৃত প্লীহা অপেক্ষা বাড়িতে দেখা যায়। কিন্তু প্লীহার ন্যায় যকৃতও নরম থাকে, কিন্তু ইহার পার্শ্বদেশ পাতা (sharp) হয় না। যকৃতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে না।

রক্ত:—(ক) এই জ্বরে রক্তের অবস্থা বিশেষ ভাবে বিকৃত হয়। প্লীহা, যকৃত এবং অস্থি মজ্জার দৌর্ব্বল্য বশতঃ রক্তস্থ লোহিত লালকণা উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া তাহাদের সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। সাধারণতঃ সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রতি মিলিমিটারে পাঁচ মিলিয়ন করিয়া দেখা যায় কিন্তু এই রোগে তিন মিলিয়ন বা ইহা অপেক্ষা আরও কম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

(খ) রক্তস্থ শ্বেত কণাসমূহ (Lancocytes) অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতকণা হ্রাস হয়। স্বাভাবিক রক্তে সাধারণতঃ প্রতি মিলিমিটারে ৮০০০ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রোগে ২০০০ হইতে ১৫০০ দেখা যায়। অনেক সময়ে শ্বেত কণার এত হ্রাস দেখা যায় যে মাত্র ৮০০ বিদ্যমান থাকে। এই জ্বরে পনিমর্কোনিউক্লিয়ার সেলস্ হ্রাস হয় এবং মনো নিউক্লিয়ার সেলস্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় Pneomonia আমা ; অতিসার বা গলক্ষত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে মনো নিউক্লিয়ার সেলস্ অপেক্ষা পনোনিউক্লিয়ার সেলস্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই জ্বরে রক্ত বিকৃত হয় বলিয়া গায়ে এক প্রকার লোহিত বর্ণের পিড়কা Perpuric patch) পরিদৃষ্ট হয় Can ru maris হইতে রক্ত ছুটিয়া রোগীর প্রাণ বিপন্ন করে। ইহাতে রক্তের ঘনত্ব (Coagulability) ও ক্ষারত্ব (alkalinity)

নষ্ট হইয়া যায়। রক্তকণার ক্ষয় জন্য পাণ্ডু বর্ণতা এবং পরিণামে কৃষ্ণবর্ণতা আইসে। রক্তহীনতার জন্য প্রথমতঃ পায়ের পাতায় এবং ক্রমে সর্ব্বশরীরে শোথ পরিদৃষ্ট হয় পরিশেষে উদরী রোগে পরিণত হয়।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র সমূহের বিকৃতি :—রক্তহীনতা জন্য শরীরের পোষণ ক্রিয়ার বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া শরীর দুর্ব্বল হয় সুতরাং হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনী প্রভৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে রক্তের স্বাভাবিক গতি কমিয়া যায় (Blood pressure becomes low)। এই অস্বাভাবিক গতির মৃদুতা নষ্ট করিবার জন্য হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য উপস্থিত হয় এইজন্য রোগীর হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (Dialatation the heart)। কালাজ্বরে জ্বরের বেগ কম থাকিলেও নাড়ী দ্রুত হইতে থাকে। গলদেশের দুই পার্শ্বে যে সকল শিরা আছে সেই গুলির দ্রুত স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়।

যন্ত্র :—কালাজ্বরের রোগী শ্বাস প্রশ্বাসে ক্লেশ অনুভব করে। শ্বাস যন্ত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না তবে অনেক সময় নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস্ এই দুইটী উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দুইটী রোগে শ্বাস যন্ত্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। শরীরে যখন শোথ উৎপন্ন হয় তখন সেই শোথ বিস্তারিত হইয়া ফুসফুসের তলদেশে Base of the lungs) উপস্থিত হয় এবং তাহার জন্য ও শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়।

অস্থি ও মজ্জা :-Leishman Donovan Parasites অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করে বলিয়া অস্থিদেশে একপ্রকার বেদনা অনুভূতি হয়।

মস্তিষ্ক :-বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর নাড়ী চক্রের শৈথিল্য দ্রুত পরিলক্ষিত হয় (Nervous prostration) রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, এবং স্থান বিশেষে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

মূত্রযন্ত্র :-এই রোগে মূত্রযন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সাধারণ জ্বররোগে মূত্রের যে পরিবর্ত্তন হয় ইহাতেও তদ্রূপ হয় শোথ হইবার পূর্ব্বে ও পরে প্রস্রাবের সহিত Albumen ক্ষরিত হইতে থাকে।

স্বেদন যন্ত্র :—বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না

ক্রমশঃ

পিত্ত।

[কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ]

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বায়ুর স্থান, গুণ, কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এখন পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। অবশ্য বায়ু, পিত্ত, কফ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করা যোগজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করিতে হইলেও সে একখানি বিশাল গ্রন্থ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাদৃশ জ্ঞান, মাদৃশ ক্ষীণ ব্যক্তির সম্ভবেনা। তবে সামান্য বুদ্ধি দ্বারা যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব।

পিত্তশব্দে আমরা দেহ সন্তাপ বুঝি, দেহ সন্তাপ বা শরীরোষ্মা পিত্তেরই স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। জ্বর বিজ্ঞানে ভ্রমণে কথিত হইয়াছে যে "উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরোনাস্ত্যূষ্মণা বিনা" ইত্যাদি। অর্থাৎ পিত্ত ভিন্ন শরীরে কোন অন্য উষ্মা বা তাপ নাই। দৈহিক তাপের যখন বৃদ্ধি দেখিতে পাই তখন পিত্তেরই বৃদ্ধি এবং তাপের হ্রাস দেখিলে পিত্তেরই হ্রাস বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি, এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা পিত্ত ও দেহোষ্মা যে এক ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

আবার সুশ্রুত পিত্তশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা তপ সন্তাপে তপ ধাতুর উত্তর কৃদ্বিহিত ক্ত প্রত্যয় করিয়া, নিপাতনে পিত্তশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ। তথাচ "গণপালা তপ ধূপ সন্তাপে" অতএব পিত্ত আর শরীরগত উষ্মা যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পিত্তের গুণ আলোচনা করিলেও পিত্তকে তাপ না বলিয়া উপায় নাই। পিত্তের গুণ চরক বলিয়াছেন "সস্নেহ মুষ্ণং দ্রবমম্লং সরং কটু"। দেহস্থিত দোষ ধাতু মলের মধ্যে কেবল মাত্র পিত্তেরই উষ্ণগুণ দেখিতে পাই। যদিও রক্তের উষ্ণ গুণ আছে কিন্তু সে উষ্ণ গুণ রক্ত বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হয় বলিয়া।

আবার যখন দেহের সন্তাপ বর্দ্ধিত হয় তখন পিত্ত বৃদ্ধি অনুমান করিয়া পিত্ত হ্রাসক ঔষধ অন্ন বিহারের প্রয়োগ করতঃ পিত্তক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সন্তাপের লাঘব দেখিতে পাই। পুনঃ দেহ সন্তাপের ক্ষীণতা দর্শন করিয়া পিত্তবর্দ্ধন দ্বারা দেহের তাপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া থাকি।

এই পিত্তের মৌলিকতা অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, পঞ্চমহাভূতান্তর্গত তেজ আর এই পিত্ত একই পদার্থ, আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে পঞ্চমহাভূতকে বৈশে-

---

*যদিও রক্তের উষ্ণগুণ আছে, কিন্তু সে উষ্ণগুণ রক্ত বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়।

ষিক দর্শন সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অর্থাৎ পরমাণু রূপ মহাভূতগণ সূক্ষ্ম এবং পরমাণু সমবায়রূপ পঞ্চভূত স্থূল। অতএব আমাদের আলোচ্যমান তেজোময় পিত্ত সূক্ষ্মরূপে একস্থানে থাকিয়া সর্ব্বত্র স্ব-ক্রিয় বিস্তার করে, তাই মহামতি সুশ্রুতাচার্য্য বলিয়াছেন, "তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানাং শরীরস চাগ্নিকর্ম্মানুগ্রহং করোতি," অর্থাৎ পক্কামাশয় মধ্যস্থ পিত্ত আত্মশক্তি দ্বারা অন্যান্য পিত্তস্থানে বল দান করে. এ স্থানে আত্ম শক্তি শব্দে পিত্তের সূক্ষ্মত্বই লক্ষিত হইতেছে। নতুবা স্থূল পিত্ত একস্থ থাকিয়া শরীরে সর্ব্বত্র তেজ বিধান করিতে পারে না। সূর্য্য যেমন এক গগনে অবস্থান করিয়া স্বকীয় অংশু দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র আলোক ও তেজ বিতরণ করে, তেমনিএক পিত্ত গ্রহণী নাড়ীতে থাকিয়া স্বীয় সূক্ষ্মাংশ দ্বারাদেহে তাপ বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মপিত্ত নিত্য ও অব্যয়, সুতরাং জন্মাদি অবসান পর্য্যন্ত দেহ অনুবর্ত্তন করে, পরন্তু মহাভুতে বিলীন হইয়া যায়। আর স্থূল পিত্তের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই, এবং সেই হ্রাস বৃদ্ধির সমতাই চিকিৎসা। সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদের এই বিরাট আয়োজন

মহর্ষি সুশ্রুত পিত্তকে 'অন্তরগ্নি' আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এই—"আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তেদহন পচনাদিষ্বভিবর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি," অর্থাৎ অগ্নির দহন পচনাদি গুণের সমতাহেতুক পিত্তকে অগ্নি বলিয়া উপচার করা হইল; এবং এই পিত্তকেই আবার অন্তরগ্নি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতের এই পাঠ পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, পিত্ত অন্তরগ্নি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পিত্তকে সরলভাবে অন্তরগ্নি না বলিয়া মহাত্মা সুশ্রুত ব্যপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলেন কেন? এখন তাহাই আমাদের অন্বেষ্টব্য। আমাদের মনে হয়, দ্রবতেজঃ সমুদয়াত্মকপিত্তের অন্তরগ্নি সংজ্ঞা সুশ্রুতের অভিপ্রেত নহে। তাই তিনি দহন পচনাদিরূপ অগ্নিগুণের সহিত তেজঃস্বভাব পিত্তেরই ক্রিয়াসাম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রবস্বভাব পিত্ত অগ্নিগুণের বিরোধিহেতু তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্যই ব্যপদেশ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মহামতি বাগ্‌ভট ও পিত্তের তৈজস অংশকে অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজসগুণোদয়াৎ। ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণানলশব্দিতং"। পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও তেজগুণের আধিক্যহেতুক সোমগুণ পরিত্যাগ করতঃ পাকাদি কর্ম্ম-দ্বারা অনল বলিয়া অভিহিত হয়। ত্যক্তদ্রবত্বং এই শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার অরুণ দত্ত বলিয়াছেন "পিত্তসোমগুণত্বেন ত্যক্তদ্রবত্বং'। তথা সংগ্রহকার মাধবকর গ্রহণীনিদানে বলিয়াছেন "আপ্লাবয়দ্ধত্যজলসন্তপ্তনিবানলং" তাহার টীকাকার বিজয়রক্ষিত টীকা করিয়াছেন "যথা উষ্ণগুণমপি জলং অনলং হন্তি তথা দ্রবাংশ পরিবৃদ্ধং পিত্তং উষ্ণরূপং অগ্নিং হন্তোন এই ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে দ্রবাত্মক পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উষ্মাত্মক পিত্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং মন্দাগ্নিই জন্মিয়া থাকে। এ বিষয়ে চরকাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ আছে তাহাআমার যথাসময়ে দেখাইব।

এই অগ্নিসংজ্ঞক পিত্ত ত্রয়োদশ প্রকারে

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা পঞ্চভূতাগ্নি পাঁচ প্রকার,রসাদিশুক্রান্তধাতুর অন্তর্গত সপ্তধাত্বগ্নি এবং পাচকাগ্নি একপ্রকার, এই মোট ত্রয়োদশ প্রকার উষ্মারূপ অগ্নি আমাদের দেহে বিরাজ করিতেছে। এখন আমরা ক্রমশঃ সেই ত্রয়োদশাগ্নির কার্য্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

চরক গ্রহণী চিকিৎসায় বলিয়াছেন "ভৌ মাস্মাগ্নেয় বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ। পঞ্চাহার গুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি॥ ইহার ভাবার্থ এই ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে যে পাঁচপ্রকার উষ্মা আছে, সেই পঞ্চোষ্মা পঞ্চভূতময় আহার্য্য দ্রব্য যথাক্রমে পরিপাক করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষিতিস্থ তেজ পর্থিব ভক্তাংশ, জলীয় তেজ, জলীয় ভক্তাংশ তৈজস তেজ, তৈজস ভক্তাংশ আকাশীয় তেজ, আকাশীয় ভক্তাংশ পরিপাক করিয়া থাকে। ধাত্বগ্নি সমন্ধে বলিয়াছেন "সপ্তভি দেহ ধাতরোধাত বো দ্বিবিধং পুনং। যথাস্বমাগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্ট প্রসাদতঃ॥ রসরক্তাদি সপ্তধাতু মনুষ্যদিগের দেহ রক্ষা করিতেছে, সেই সপ্ত ধাতুর অন্তর্গত যে সমস্ত তেজরূপ অগ্নি আছে তদ্দ্বারা ধাতু সকল পরিপক্ক হইয়া অসার ভাগ কিট্টরূপ মলভাবে এবং সারভাগ প্রসাদ রূপে পরিণত হয়, পাচকাগ্নির কথা বলিয়াছেন "অন্নস্যপ ক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৃণামধিকোমতঃ।" পাদ ক্রিয়া নিষ্পাদক অগ্নি সমূহের মধ্যে অন্নপাচক অগ্নিই প্রধান।

এই ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নিই অন্তরাগ্নি শব্দ বাচ্য। এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নির আবশ্যকতা কি? এবং ইহারা কেমনভাবেই বা পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। গ্রহণীস্থিত পাচক পিত্তকে পাচকাগ্নি বলে, এই পাচকাগ্নিই অন্যান্য অগ্নির মধ্যে প্রধানতম। তাহার কারণ চরক বলিয়াছেন "তন্মূলা তেহি তদ্‌ বৃদ্ধি ক্ষয় বৃদ্ধি ক্ষয়ত্মকাঃ" অর্থাৎ সেই পাচকাগ্নিই অন্যান্য অগ্নির মূল, এবং পাচকাগ্নি ক্ষয়ে অন্যান্য অগ্নিসমূহেরও ক্ষয় ও তথা বৃদ্ধিতে অপর অগ্নিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে চরকের এই কারণস্থ অধ্যয়ন করিয়া বুঝিলাম যে, ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নির মূলাধার পাচকাগ্নি, সেই জন্যই পাচকাগ্নিকে পক্তৃনামাধিক বলিয়া মহর্ষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন, এই পাচকাগ্নি অমাশয় প্রবিষ্ট ভুক্তদ্রব্য পপিপাক করিয়া রস উৎপাদন করে, রস পুনঃ পঞ্চভূতাগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইয়া রস ধাতুতে পরিণত হয়। এই ভুতাগ্নির পরিপাকে মলভূত শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয় বলিয়া মনে হয় ভুতাগ্নির পরিপাক • স্বীকার না করিলে, যথা ষড়রস দ্রব্য ভোজন করিলেও জঠরানলের সংযোগে অন্যান্য রস পরাভূত হ য়া মধুর রসেরই প্রাধন্য দেখা যায়, যথা পঞ্চভূতেরও কোন তারতম্য ঘটার আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু জঠরানলের পরেও যখন পঞ্চভূতাগ্নির পাক হয় তখন পঞ্চভূতের নির্ব্বিকারত্বই প্রতীত হয়, বস্তুতঃ ভূতাগ্নির প্রয়োজনীয়তা আছেই, পঞ্চ ভূতাত্মক দ্রব্য স্ব স্ব তেজদ্বারা পরিপক্ক হইয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে পাক শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে, নতুবা অগ্নির কার্য্য সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারেনা। পাক

শব্দের অর্থ অবস্থান্তর পরিণতি অর্থাৎ স্বভাবস্থিত পদার্থ বিশিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন গুণ কর্ম্মে পরিণত হওয়াকে পাক বলা যায়। দেখুন তণ্ডুল পক্ক হইয়া ওদনে পরিণত হয়। এক্ষণে তণ্ডুলের কাঠিন্য গুণের ধ্বংশ হইয়া কোমলতাগুণে পরিণতি হইয়াছে। অতএব পাঞ্চভৌতিক অগ্নি দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের পাক হয় বলিলে অবস্থান্তর পরিণতি বুঝিতে হইবে সেই অবস্থানান্তর কি তাহাই এখন চিন্তা, এ অবস্থান্তর বোধ হয় স্থূলত্বের সূক্ষ্মত্বে পরিণত। স্থূল পঞ্চ মহাভূত দ্রব্য সমূহ প্রথমে পাচকাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া মলমূত্রাদি রূপ অসারাংশ পরিত্যাগ করতঃ দ্রব রসরূপে পরিণত হয়, এই রস স্বযোনি দ্রব্য হইতে সূক্ষ্ম, তৎপরে পুনঃ সেই রস স্বকারণ পঞ্চভূতের তেজরূপ অগ্নিদ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মারূপ মলভাগ বর্জ্জন করতঃ বিশুদ্ধ রস ধাতুতে পরিণত হয়। এই রস ধাতু স্থূল দ্রব্য হইতে যে সূক্ষ্মতম তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। আবার এই সারভূত রস ধাতু ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সেই স্থূল ভাগ রস ধাতুতেই থাকিয়া যায়; এবং সূক্ষ্ম ভাগ রস ধাতুতে পরিণত হয়, এই প্রকারে রসাদি শুক্রান্ত সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, জঠরানল দ্বারা যেমন ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইয়া রস উৎপন্ন হয়, তেমনি আহার রসও পরিপক্ক হইয়া রস ধাতুতে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং ভূতাগ্নির আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে আমরা বলিব যে, পাচকাগ্নি ও ভূতাগ্নি স্বরূপতঃ একই পদার্থ, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সংজ্ঞা মাত্রের ভেদ। পাচকাগ্নি স্থূল পঞ্চমহাভূতাত্মক দ্রব্যকে পরিপাক করে, অতএব সেও স্থূল, ভূতাগ্নি তাহা হইতে সূক্ষ্ম রসকে পরিপাক করে, সুতরাং সে সূক্ষ্ম। অবার ধাত্বাগ্নি আহার রস হইতে সূক্ষ্মতর রসধাতুকে পরিপাক করে তাই সে সূক্ষ্মতর। লৌকিক পাকক্রিয়ার সহিত এই পাকক্রিয়ার সাদৃশ্য চিন্তা করিলেই স্থূল সূক্ষ্মের বেশ অনুমান হয়। পাকের প্রথম অবস্থায় যতটা তাপের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয় অবস্থায় তাহা হইতে অল্প, আবার তৃতীয় অবস্থায় বা আসন্ন পাকে তাহা হইতেও মৃদু তাপের প্রয়োজন হয়। তেমনি আমাদের কাঠিন্যাদি ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে যতটা তাপের প্রয়োজন, ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রসকে পরিপাক করিতে, তাহা হইতে মৃদু তাপের প্রয়োজন, পুনঃ রসধাতুকে পরিপাক করিতে মৃদুতর তাপেরই আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাই মহর্ষিগণও পাচকাগ্নি, ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি এই তিন প্রকারে তাপের তীক্ষ্ণত্ব ও মৃদুত্ব ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

নিদানপরিশিষ্টম্ ।

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

অতিসারঃ ।

কেচিৎ প্রাহুর্নৈকরূপপ্রকারং
নৈবেত্যেবং কাশিরাজস্তবোচৎ ।
দোষাবস্থা তস্য নৈকপ্রকারা
কালে কালে ব্যাধিতস্যোদ্ভবন্তি ॥
শরীরিণামতীসারঃ সম্ভূতো যেন কেনচিৎ ।
দোষাণামেব লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে ॥
স্নেহাজীর্ণনিমিত্তস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ ।
বিসূচিকানিমিত্তস্তু চান্যোঽজীর্ণনিমিত্তজঃ ।
বিষার্শঃ ক্রিমিসম্ভূতো যথাস্বং দোষলক্ষণঃ ॥
শ্যাবং বা বিট্‌সক্তমুত্রোঽল্পকূজী-
স্তব্ধাপানঃ সন্নকট্যূরুজঙ্ঘঃ ।
বাতোদ্ভূতো রোগ এষোঽতিসারো
বিজ্ঞাতব্যঃ সংপ্রদিষ্টশ্চ তজ্জ্ঞৈঃ ॥
দুর্গন্ধ্যুষ্ণং বেগবৎ বিট্ চ পিত্তা-
দিগ্ধাস্ত্রিন্নং স্বিন্নদেহোঽতিতীক্ষ্ণং ॥
তন্দ্রানিদ্রাগৌরবোৎ ক্লেশসাদী
বেগাশঙ্কীসৃষ্টবিট্‌কঃ কফাচ্চ ॥
তন্দ্রাযুক্তো মোহসাদাস্যশোষী
সর্ব্বোদে র্বৈর্বালিবৃদ্ধেষসাধ্যঃ ॥
ভয়জস্যাতিসারস্য চিহ্নং বাতাতিসারবৎ ॥

গ্রহণী রোগঃ ।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা ।
পক্কামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্গ্রহণী মতা ।
অপক্কং ধারয়ত্যন্নং পক্কং সৃজতি পার্শ্বতঃ

যশ্চাগ্নিঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টো রোগানীকে চতুর্ব্বিধঃ।
তঞ্চাপি গ্রহণীদোষং সমবর্জ্জ্যং প্রচক্ষ্মহে ॥

অর্শো রোগঃ।

অর্শঃসু দৃশ্যতে রূপং যদা বৈ দোষয়োর্দ্বয়োঃ।
সংসর্গং তং বিজানীয়াৎ সংসর্গঃ স চ ষড়্বিধঃ ॥
কানি দীর্ঘাণি হ্রস্বানি কানুণ্নি মহান্তি চ।
হিস্রমাণি চ বৃত্তানি কানিচিজ্জটিলানি চ।
অন্তর্ম্মুখানি কান্যেব চান্তর্বক্রাণি কানিচিৎ।
যথাস্বং দোষবর্ণানি সহজানি ভবন্তি হি ॥
অর্শোভিস্তৈরপি নরো জন্মপ্রভৃতিপীড়িতঃ।
ভবেদতিকৃশো দীনো বিবর্ণঃ ক্ষাম এব চ।
বিবদ্ধবাতবিণ্মূত্রশর্করাশ্মরি পীড়িতঃ।
ত্যজেন্নিয়তসম্বদ্ধশুষ্কপক্কামভিন্নবিট্।
তথান্তরান্তরাশ্বেতং হরিৎ পীতঞ্চ পিচ্ছিলং।
পাণ্ডুরক্তারুণতরং সান্দ্রং কুণপগন্ধি চ।
আমং বর্চ্চস্যপি স চ প্রভূতং গুদশূলবান্।
নাভৌ বস্তৌ বঙ্ক্ষণে চ তস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
পরিহর্ষঃ প্রমেহশ্চ ভবেচ্চাপি প্রবাহিকা।
বিষ্টম্ভাটোপান্ত্রকূজোদাবর্ত্তী হৃদি লেপবান্।
প্রভূতবদ্ধশুষ্কাম্লোদ্গারী হীনবলানলঃ।
দুঃখোপচারশীলশ্চ ক্রোধনশ্চাল্পশুক্রবান্।
সকাসশ্বাসতমকতৃষ্ণাহৃল্লাসপীনসৈঃ।
অবিপাকারুচিচ্ছর্দ্দিক্ষুস্তিশ্চ পরিপীড়িতঃ।
শিরঃকর্ণাক্ষিরোগী চ ক্ষামভিন্নাবলস্বরঃ।
শূনপাদাক্ষিকূটাস্যকরঃ সজ্বর এবচ।
সর্ব্বপার্শ্বাস্থিশূলী চ সাঙ্গমর্দ্দোহন্তরান্তরা।
পৃষ্ঠপার্শ্বকুক্ষিবস্তিত্রিকহৃদ্গ্রহপীড়িতঃ।
প্রধ্যানশীলশ্চ তথা স ভবেদ্ধি মহালসঃ ॥

অগ্নিমান্দ্যং।

অতিমাত্রমজীর্ণেঽপি গুরুচান্নমথাশ্নতঃ।
দিবাপি স্বপতো যস্য পচ্যতে সোঽগ্নিরুত্তমঃ ॥

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগং।
স্বোষ্মণা পাবকস্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি।
তদালব্ধবলো দেহং বিরুক্ষেৎ সানিলোঽনলঃ।
অভিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্মুহুঃ।
পক্ত্বান্নং সততো ধাতূন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি।
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরং।
ভুক্তেঽন্নে লভতে শান্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্‌কাসদাহমূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্যাধয়ো হত্যগ্নিসম্ভবাঃ॥

অজীর্ণং।

উদ্গারেঽপি বিশুদ্ধতামুপগতে কাঙ্ক্ষানভক্তাদিষু
স্নিগ্ধত্বং বদনস্য সন্ধিষু রুজা কৃত্বা শিরোগৌরবং।
মন্দাজীর্ণরসে তু লক্ষণমিদং তত্রাতিবৃদ্ধে পুন-
র্হৃল্লাসজ্বরমূর্চ্ছনাদি চ ভবেৎ সর্ব্বাময়ক্ষোভণং॥

বিসূচিকা।

বিবিধৈর্বেদনাভেদৈর্বায়্বাদিভৃশকোপতঃ।
সূচীভিরিব গাত্রাণি ভিনত্তীতি বিসূচিকা॥

অলসকঃ।

প্রয়াতি নোর্দ্ধং নাধস্তাদাহারো নচ পচ্যতে।
আমাশয়েঽলসীভূতস্তেনসোঽলসকঃ স্মৃতঃ॥
পীড়িতং মরুতেনান্নং শ্লেষ্মণা রুদ্ধমন্তরা।
অলসং ক্ষোভিতং দোষৈঃ শল্যত্বেনাবসংস্থিতং।
শূলাদীন্ কুরুতে তীব্রান্ ছর্দ্দ্যতীসারবর্জ্জিতান্॥

ক্রিমিরোগঃ।

সহজাঃ ক্রিময়ো জ্ঞেয়াঃ সূক্ষ্মাশ্চরককীর্ত্তিতাঃ।
উক্তসংখ্যাতিরিক্তাস্তে ন ভবন্তি বিকারদাঃ॥

পাণ্ডুরোগঃ।

দোষাঃ পিত্তপ্রধানাশ্চ যস্য কুপ্যন্তি ধাতুষু।
শৈথিল্যং তস্য ধাতূনাং গৌরবঞ্চোপজায়তে।
ততো বর্ণবলস্নেহা যে চান্যেঽপ্যোজসো গুণাঃ।

ব্রজন্তি ক্ষয়মত্যর্থং দোষদূষ্যপ্রদূষণাৎ।
সোঽল্পরক্তোঽল্পমেদস্কো নিঃসারঃ শিথিলেন্দ্রিয়ঃ।
বৈবর্ণ্যং ভজতে তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণং।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ।
বিদগ্ধেঽন্নে বিরুদ্ধান্নাৎ মৈথুনাৎ ক্ষারভোজনাৎ।
প্রতিকর্ম্মশ্চ বৈষম্যাৎ বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ।
কামচিন্তাভয়ক্রোধশোকোপহতচেতসঃ।
সমুদীর্ণং যথা পিত্তং হৃদয়ে সমবস্থিতং।
বায়ুনা বলিনা ক্ষিপ্তং সংপ্রাপ্য ধমনীর্দশ।
প্রপন্নং কেবলং দেহং ত্বঙ্মাংসান্তরসংস্থিতং।
প্রদূষ্যকফবাতাংশ্চ ত্বঙ্মাংসানি করোতি তৎ।
পাণ্ডুহারিদ্রহরিতান্ বর্ণাংশ্চ বিবিধান্ ত্বচি।
স পাণ্ডুরোগ ইত্যুক্তস্তস্য লিঙ্গং ভবিষ্যতঃ॥
হৃদয়াস্পন্দনং রৌক্ষ্যং স্বেদাভাবঃ শ্রমস্তথা॥
সম্ভূতেঽস্মিন্ ভবেৎ সর্ব্বঃ কর্ণক্ষ্বেড়ো হতানলঃ।
দুর্ব্বলঃ সীদনোঽন্নদ্বিট্ শ্রমভ্রমনিপীড়িতঃ।
গাত্রশূলজ্বরশ্বাসগৌরবারুচিমান্নরঃ।
মৃদিতৈরিব গাত্রৈশ্চ পীড়িতো মথিতৈরিব।
শূনাক্ষিকূটো হরিতঃ শীর্ণরোমা হতপ্রভঃ।
কোপনঃ শিশিরদ্বেষী নিদ্রালুঃষ্ঠীবনোঽল্পবাক্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টকট্যুরুপাদরুক্ সদনানি চ।
স্ফুরণারোহণায়াসৈর্বিশেষশ্চাস্য বক্ষ্যতে॥
আহারৈরুপবাসৈশ্চ বাতলৈঃ কুপিতোঽনিলঃ।
জনয়েৎ কৃষ্ণ পাণ্ডুত্বমঙ্গমর্দ্দং জ্বরং তথা।
বর্চ্চঃশোষাস্যবৈরস্যং শোথং পার্শ্বশিরোরুজং॥
পিত্তলস্যাচিতং পিত্তং যথোক্তৈঃ স্বৈঃ প্রকোপনৈঃ।
দূষয়িত্বা তু রক্তাদীন্ পাণ্ডুরোগায় কল্পতে।
স ভবেৎ হরিতাভো বা মূর্চ্ছাযেন নিপীড়িতঃ।
স্বেদনঃ শীতকামশ্চ নচান্নমভিনন্দতি।
কটুকাস্যো নচাস্যোষ্ণমুপশেতেঽন্নমেবচ।
উদ্গারোঽম্লো বিদাহশ্চ বিদগ্ধেঽন্নস্য জায়তে।

দৌর্ব্বল্যমস্য চাস্যস্য দৌর্গন্ধ্যং তম এবচ ॥
বিবৃদ্ধঃ শ্লেষ্মলৈঃ শ্লেষ্মা পাণ্ডুরোগং স পূর্ব্ববৎ।
করোতি লোমহর্ষঞ্চ সাদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং ক্লমং।
শ্বাসং কাসং তথা চ্ছর্দ্দিমরুচিং বাক্স্বরগ্রহঃ।
কটুরুক্ষান্নকামিত্বং লবণাস্যত্বমেবচ ॥
সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজং।
ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহং ॥
মৃদ্ভক্ষণাৎ ভবেৎ পাণ্ডুস্তন্দ্রালস্যনিপীড়িতঃ।
সশ্বাসকাসশোষার্শঃ সদারুচিসমন্বিতঃ।
শূনপাদাননকরঃ কৃশাঙ্গঃ কৃশপাবকঃ ॥
অন্তে শূনঃ কৃশো মধ্যোঽন্যথা বা গুদশেফসি।
শূনো জ্বরাতিসারার্ত্তৈর্মৃতকল্পস্তু পালকী ॥

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈল পাক বিধি।

(সমালোচনার-পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন]

—:০:—

বিগত ১৩২৯ সনের আশ্বিন মাসের "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈল পাক বিধি শীর্ষক সমালোচনাখানি আমি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথমে আমার আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র-মোহন দাসগুপ্ত ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ তিনি উল্লিখিত বিষয়ে সমালোচনা চলিতে পারে বলিয়া অনুমোদন করিলে উহা প্রকাশের জন্য "আয়ুর্ব্বেদে" প্রেরিত হইয়াছিল, অতঃপর বঙ্গীয় স্বনামধন্য কতিপয় কবিরাজ মহোদয়ের উল্লিখিত বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিমত অবগত হওয়ার জন্য কয়েকখানা পত্র লিখি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একমাত্র রাজসাহী নিবাসী মহামান্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিমত ভিন্ন অন্য কাহারও মতামত অবগত হইতে পারি নাই, যাহা হউক উক্ত কবিরাজ মহাশয় উক্ত বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত

মন্তব্য পোষ্টকার্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঙ

রাজসাহী

১লা কার্ত্তিক

"বিনয় পুরঃসরঃ নিবেদনমেতৎ

আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। ঘৃতে মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাকের কোন ব্যবহার নাই। তৈলের মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাকের কোন বিধি আছে বলিয়া জানি না অর্থাৎ উহা শাস্ত্রীয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। উহা প্রাচীন বৈদ্যগণ সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য গন্ধপাক দিয়া থাকেন। মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয় ইহাই আমার বিশ্বাস। গন্ধপাক দেওয়াতে কোন কোন তৈলের গুণ সামান্য কিছু কম হইলেও হইতে পারে।"

উপরোক্ত পত্র হইতে মৎকৃত সমালোচনার কতকগুলি বিষয়ের সমর্থন সূচীত হইতেছে যথাঃ—

১। ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছা বিধি ও তিল তৈলের গন্ধপাক বিধি প্রাচীন নহে। উহা আধুনিক, প্রক্ষিপ্ত ও অশাস্ত্রীয় (ঘৃতের কোন প্রক্ষিপ্ত গন্ধপাক বিধি ও প্রচলিত নাই সুতরাং উপরোক্ত পত্রের তদুক্তি বাহুল্য মাত্র)

২। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক তৈলে সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ উৎপাদনে বিলাস পরায়ণ রাজা মহারাজ এবং সম্ভ্রান্ত বড় লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কোন প্রাচীন বৈদ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে চিকিৎসক সমাজে উহা এতদূর বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা আয়ুর্ব্বেদের অন্তীভূত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে। উপরোক্ত পত্র হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

৩। "মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়" এই উক্তি হইতে পক্ষান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না কি যে স্নেহের "আমদোষ" কল্পনা অস্বীকার্য্য এবং সর্ব্বত্র মূর্চ্ছা পাকের প্রচলন জন্য অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপ মাত্র?

৪। উপরোক্ত পত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহের গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা তাহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং ঘৃতের মূর্চ্ছা বিধিতে লিখিত "বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ী এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দাঁড়ায়নাকি?

৫। তিল তৈলের গন্ধপাকে ক্ষেত্র বিশেষে গুণহানি হইতে পারে এ কথাও স্বীকার্য্য।

এইরূপ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে আমার লিখিত কবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিমত মৎকৃত সমালোচনার সর্ব্বাংশে অনুকূল।

আমার পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে প্রেরিত হওয়ার কিছুদিন পরে আমার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে মূর্চ্ছা বিধি প্রবর্ত্তনের কারণ এই যে মূর্চ্ছা পাক দিলে স্নেহে এমন একটা শক্তির সৃষ্টি হয় যে, সেই শক্তি প্রভাবে অতঃপর মূলোক্ত পাকের কাথ ও কল্কাদির গুণ সম্যক স্নেহে বর্ত্তাইতে পারে। আমি এই যুক্তির সারবত্তা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। উত্তরে আমার জিজ্ঞাস্য এই যোগবাহক শক্তি কি স্নেহের নিজস্ব সম্পত্তি না মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির অনুকম্পালব্ধ শক্তি মাত্র?

যদি বলা হয় ঘৃত তৈলাদি স্বভাবতই যোগবাহী তাহা হইলে উপরোক্ত মূর্চ্ছাপাক সমর্থন সূচক যুক্তি অসার ও ভিত্তিহীন ; আর যদি বলা হয় মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির দ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি অথবা স্নেহের স্বাভাবিক যোগবাহক শক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির এমন কি শক্তি আছে, যদ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হইতে পারে ? বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় কি ? What is theoratically true may or may not be practically so, but what is theoratically false must be practically false. এমন কি অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যদ্দারা মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় এই সত্য প্রমাণিত হইতে পারে ? যুক্তি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না কার্য্যতঃ তাহা সত্য হওয়া অসম্ভব। আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে মূর্চ্ছা পাকে ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রা বিপর্য্যয় জনিত দোষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপাদান বিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া স্নেহের গুণহানি বা গুণ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমার পুর্ব্বোক্তি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপাদন না করা হইবে সে পর্য্যন্ত "মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয়" এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি ? আরও আমার পুর্ব্বোক্ত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে মূর্চ্ছা বিধি আধুনিক এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি প্রাচীন, সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য এই মূর্চ্ছা বিধি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি অথবা বৃদ্ধির অভাবে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অথবা কিঞ্চিৎ আধুনিক বাগভটাচার্য্য, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীনিত্যনাথ শার্ঙ্গধর, শ্রীমিশ্র ভাব প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের প্রস্তুত ঘৃত তৈলাদি গুণহীন বা হীনগুণ হইত কি ? যাহা হউক মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় এই যুক্তি নিতান্তই অসার ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ঢাকা নিবাসী আমার কোন বন্ধু কবিরাজ আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে অধিক ফল লাভ হয় ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্বেও কথাটার প্রতিবাদ করে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। যাহা মাত্রা বিপর্য্যয় বা উপাদান বিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া স্নেহের গুণহানি কারক বলিয়া Theoretically প্রমাণিত হইয়াছে তাহা practically কি প্রকারে সর্ব্বত্র স্নেহের গুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে ? যুক্তি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না কার্যতঃ তাহা সত্য হইতে পারে কি ? স্নেহের গুণের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে মূর্চ্ছা পাক বাদ দিয়া স্নেহপাক সাধন করিয়া এবং পক্ষান্তরে মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণান্তে স্নেহ পাক সাধন করিয়া উভয় প্রকার স্নেহই একই অবস্থায় একই রোগীকে ব্যবহার করাইয়া ঔষধের গুণোৎকর্ষ পরীক্ষণীয়। এই পরীক্ষা ব্যাপার সহজ সাধ্য কি ? সত্ব-প্রকৃতি ভেদে

শারীর মানস দোষ ভেদে, আনূপ বা সাধারণ ও জাঙ্গলাদি দেশ ভেদে স্থৌল্য কৃশতাদি ভেদে ভৈষজ্য পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপ মানবদেহ বহুবিধ নয় কি? এমতাবস্থায় দুই চারি দশটী রোগীর উপর উভয় প্রকারে প্রস্তুত স্নেহ বিশেষের পরীক্ষা দ্বারা সোজাসুজি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ঘৃত তৈলাদির সম্বন্ধে একটা universal সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তি সঙ্গত কি? পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের নবাবিষ্কৃত ঔষধ ইঞ্জেকসন (Injeetion) প্রভৃতি পরীক্ষার্থ রাজশক্তির সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের হাসপাতালে ও অন্যান্য দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর পরীক্ষান্তে কোন কোন ঔষধের গুণ সম্বন্ধে সর্ব্বাদিসম্মত ক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না, আর আমরা কিনা দুই চারি দশজন রোগীকে ব্যবহার করিয়াই, ঔষধের ফল সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিয়া বা না করিয়াই উহার গুণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বসিয়া আছি। ইহা কি কম দুঃখের কথা? আমাদের উৎসাহদাতা কৈ, রাজশক্তির সাহায্য কৈ, অর্থ কৈ, দাতব্য চিকিৎসালয় কৈ, ঔষধ পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপ একই ব্যাধিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ রোগী কৈ? নাই বলিতে আমাদের কিছুই নাই! একজন কবিরাজের এক জীবনে স্নেহ প্রয়োগে চিকিৎসোপযোগী একই ব্যাধিগ্রস্ত রোগী কতজন পাওয়া সম্ভব। আর তাহাদের ভিতর কতজন রোগীর উপর বা উভয় প্রকারে স্নেহ প্রয়োগের প্রকৃষ্ট সুযোগ ঘটিয়া ঔষধের তারতম্য লক্ষিত হইতে পারে। শুধুই কি তাই। চিকিৎসকের নিস্বার্থ ভাবে আজীবন অদম্য উৎসাহের সহিত উল্লিখিত রূপে পরীক্ষা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঔষধের উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করা সহজ সাধ্য বা সম্ভবপর কি? পরীক্ষা ক্ষেত্রে আবও এক বিষম সমস্যা এইযে উভয় স্নেহ একই দিনে সময় ভেদে প্রয়োগ করিলে অথবা পর্য্যায়ক্রমে কিছুদিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিলে কোন্ স্নেহ অধিক ফলপ্রদ হইতেছে তাহার অনুমানও সহজ সাধ্য কি? একটী মাত্র ঔষধের ক্রিয়া ব্যাধি বিশেষে পরীক্ষা করা সহজ সাধ্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু একই ব্যাধিতে প্রায় একই প্রকারের দুইটী ঔষধের গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করা যে কি কঠিন ব্যাপার এবং কতদূর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিলে "মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে অধিক ফল লাভ হয়" সোজাসুজি এই universal সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের মত চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক নয় কি?

১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসের "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত মৎকৃত সমালোচনার একস্থানে টিপ্পনীর উল্লেখ দেখিলাম সুতরাং সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। "আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল সমূহ বিলাসের সামগ্রী নহে, কাজেই উহার গন্ধবর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই" আমার এই উক্তি "যদা ফেনোদগম তৈলে ফেন শান্তিশ্চ সর্পিষি, গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তিঃ স্নেহ সিদ্ধিস্তদা ভবেৎ॥" শার্ঙ্গধরোক্ত এই পরিভাষিক শ্লোকের বিরোধী বলিয়া টিপ্পনী করা হইয়াছে, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই—আমার পূর্ব্বলিখিত বাক্য কোন অংশে স্নেহ পাক সিদ্ধি সূচক শার্ঙ্গধরের পূর্ব্বোক্ত পরিভাষিক বিধির কোনই বিরোধী হয় নাই। কারণ, বর্ণগন্ধ রসোৎপত্তি স্নেহ পাক সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও তাই বলিয়া মূর্চ্ছা পাক দ্বারা তৈলকে

অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এবং গন্ধ পাক দ্বারা সুগন্ধের উৎপাদন করিয়া যে স্নেহ পাক সিদ্ধি পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার অর্থ কি ? যে সমস্ত স্নেহের গন্ধপাক নাই তাহাদের কি গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তি হয় না ? আমার উক্তির "উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়া" এই বাক্যাংশটী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। "গন্ধবর্ণের উৎপাদন" আর পাকে স্বাভাবিক ভাবে "বর্ণগন্ধের উৎপত্তি" এক কথা নয়, মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক দ্বারা বর্ণ ও গন্ধের উৎপাদন না করিলে কি শাস্ত্রোক্ত মূল পাক হইতে গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তি হয় না, এবং তদ্দ্বারাই কি স্নেহ পাক সিদ্ধি নির্ণয় করা যায় না, যে শার্ঙ্গধরের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার গ্রন্থে কিন্তু মূর্চ্ছা বা গন্ধ পাকের নাম গন্ধও নাই। যাহাহউক গন্ধপাক সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গেই উক্তবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং যেহেতু মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক দ্বারা যথাক্রমে বর্ণ ও গন্ধের উৎপাদন করতঃ স্নেহ পাক সিদ্ধি নির্ণীত না হইয়া ক্কাথ ও কল্ক দ্রব্যাদির সহিত পক্ক হইয়া তৈলে যে স্বাভাবিক গন্ধবর্ণের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে তদ্দ্বারাই স্নেহপাক সিদ্ধি নির্ণেয় সুতরাং আমার উক্তি অযৌক্তিক বা উক্ত পারিভাষিক বিধির কিছুমাত্র বিরোধী হয় নাই।

অতঃপর উপসংহারে বক্তব্য মৎকৃত মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকের প্রতিবাদ সূচক সমালোচনা আমার পরিচিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এবং কতিপয় বিখ্যাত ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ গণ বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকে স্নেহের গুণোৎকর্ষ হইবে না পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষে গুণহানি অথচ পাকের ব্যয় বাহুল্য মাত্র ঘটিবে, আবার অন্যপক্ষে মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধের গন্ধবর্ণের পার্থক্য লক্ষিত হইলে সাধারণে ঔষধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে এই সমস্ত ভাবিয়া বড়ই ইতস্ততঃ চলিতেছে। তাই এই সমস্যা ভঞ্জনের জন্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলী সত্বর পথ প্রদর্শন না করিয়া নীরবে থাকিলে আমার একমাত্র অরণ্যেরোদন সার হইবে না কি ? আমরা সকলেই নিরবে থাকিলে প্রক্ষেপ জালে জর্জ্জরিত বার্দ্ধক্যনিপীড়িত, বিকৃত লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান রসায়নসেবী বৃদ্ধের ন্যায় নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমোন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির সঙ্গে সঙ্গে সদর্পে অগ্রসর হইয়া আত্মগরিমা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইবেত ? কালক্রমে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া সাধারণের চক্ষে নিতান্ত অবহেলার পাত্র হইয়া দাঁড়াইবে না তো ? কথা প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে পড়িয়াগেল। আমার এক বন্ধু অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষের অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া দোহাই দিয়া বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদে প্রক্ষেপের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে বাদানুবাদ দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে না করিয়া পাঠকগণকে আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণের জন্য শ্রীমৎ চক্রপান দত্ত কৃত চক্রদত্ত নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে যাহাতে প্রক্ষেপে দোষ না ঘটে তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের শেষ ভাগে যে লিখিয়াছেন, 'যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগানত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধবেদ্ধা। ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ ॥" এই অংশ টুকু উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই আমার মত যদি ভ্রান্ত হয় তবে সত্বর তাহা সমালোচনা দ্বারা প্রতিপাদন করা হউক। আর যদি আমি এ বিষয়ে অভ্রান্ত হই তবে আমার একান্ত অনুরোধ আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই অগ্রসর হউন এবং সত্বর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমস্যার সমাধান দ্বারা পবিত্র আয়ুর্ব্বেদের মুখোজ্জ্বল করুণ। শুভমস্তু।

প্রবন্ধের অনেক স্থলে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আং সং

আয়ুর্ব্বেদে নপুংসক ছাগ।

[কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন]

(সমালোচনা)

বাল্যকাল হইতেই শুনি নপুংসক না কি অযাত্রা! যে কোন শুভ কর্ম্মারম্ভে বা কার্য্য বিশেষে গমনাগমনাদি ব্যাপারে নপুংসক দর্শন বা তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও পঠনাদিতে না কি সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড ও নিষ্ফল হয়। মহাভারতে শুনি, মহাবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দ্রুপদরাজের নপুংসক পুত্র শিখণ্ডিকে দেখিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়া না কি পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার ভয় হয় আয়ুর্ব্বেদে নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিব, তাহা নিষ্ফল ও পণ্ড শ্রম না হয়। যাহার দর্শন, শ্রবণ পঠনাদিতে অশুভ সূচিত করে, বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের নিকট তাহার এত সমাদর কেন? দেশে পালে পালে বিশুদ্ধ হৃষ্টপুষ্ট নিরোগ যুবা পাঠা ছাগী সুলভ হইলেও কবিরাজগণ আজন্ম ক্লৈব্যরোগগ্রস্ত নপুংসক ছাগের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া অজস্র অর্থ ব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প কেন? রোগীর রোগশান্তির জন্য? কেন, ব্যাপার মন্দ নয়! রোগীর রোগ বিমোচন যে শুভ কর্ম্ম! সেই শুভকর্ম্মে অশুভসূচক নপুংসক ছাগঘটিত ঘৃত তৈলাদি প্রয়োগে শুভফল ফলিবে তো? নপুংসক ছাগ মাংসঘটিত অমৃতপ্রাশ ঘৃত ব্যবহারে রোগীর ক্লৈব্যাপনোদন হইবে তো? নিশ্চয়ই হইবে, নপুংসকের প্রয়োগে নপুংসকত্ব বিদূরীত হইবে। কারণ বিষে বিষ নষ্ট করে। প্রমাণ যথা ;—বিষস্য বিষমৌষধম্। এ কেবল ডাক্তারী Principle নয়, কবিরাজী Principle ও বটে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কেবল সেদিন হইতে ইঞ্জেকসন (Injection) প্রভৃতির বেলা ঐ Principle অনুসরণ করিতেছেন, আর আমরা খাবার ঔষধে পর্য্যন্ত ঐ Principle বহুকাল যাবৎ বেশ সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ব্যবস্থা মন্দ নয়। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চিহ্নই বটে, কিন্তু কথা কি, things are not what they seem. আমরা যা বুঝি, সর্ব্বত্র ঠিক তা নয়। নপুংসকের এবম্বিধ ব্যবহার মাকাল ফল বা বিষকুম্ভপয়োমুখ সাজিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের মোহে বহুকাল যাবৎ পবিত্র আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়। স্বয়ং কাশীরাজ ধন্বন্তরী অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ গোবিন্দ সেন কৃত পরিভাষা প্রদীপে আছে যথা :—"পক্কব্যামাষামাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ। হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ॥ বলিনঞ্চ বয়ঃস্থঞ্চ সুবীর্য্যঞ্চ সুদেহিনম্। ন বৃদ্ধঞ্চ ন বালঞ্চ অবীর্য্যং স্রাবশোণিতম্॥ শৃগালবর্হিণোঃ পাকে

পুমাংসাং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ। কাশীরাজমতৈনেব ছাগমেব নপুংসকম্॥ অভাবাদপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ। বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ॥" অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির পাকে স্ত্রী পুরুষ ছাগ পরিত্যাগ করিয়া বলবান পূর্ণবয়স্ক, বীর্য্যবান এবং সুদেহ (পূর্ণাঙ্গ) নপুংসক ছাগ দিবে। বৃদ্ধ, শিশু, বীর্য্যহীন, ঋতুশোণিত স্রাব বিশিষ্ট (অবশ্যই বন্ধ্যা ছাগীর স্থলেই কেবল বুঝিতে হইবে) ছাগ গ্রহণ করিবে না। ময়ূরী, জম্বুকী, ছাগী, ইহারা স্বভাবতই বীর্য্যহীনা সুতরাং স্নেহপাকে শৃগাল ও ময়ূরের পুরুষ জাতী এবং কাশী-রাজের মতানুসারে নপুংসক ছাগ গ্রহণ করিবে। নপুংসক ছাগ না পাইলে এবং অপেক্ষা করিবার ও সময় না থাকিলে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ শাস্ত্রানুযায়ী না হইলেও বন্ধ্যাছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন" কথাগুলি সাধারণের চক্ষে নির্দ্দোষ যুক্তিযুক্ত ও বড়ই মুলায়েম বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। পরিভাষার পাঠ হইতে স্থূলতঃ দেখা যায় যে কাশীরাজ ধন্বন্তরী নপুংসক ছাগ ব্যবহারার্থ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কাশীরাজ ধন্বন্তরী—"সুশ্রুত" বক্তা। বর্ত্তমান "সুশ্রুত সংহিতা" কাশীরাজ দিবদাস ধন্বন্তরীর উপদিষ্ট এবং তদীয় শিষ্য মহর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতায় কিন্তু নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান দেখি না। উহাতে "স্ত্রীয়শ্চতুষ্পাদষু পুমাংসোবিহঙ্গেষু, মহাশরীরেষল্প শরীরা, অল্প শরীরেষু মহাশরীরা প্রধানতা" এই উক্তি হইতে চতুষ্পদের মধ্যে স্ত্রীজাতি এবং বিহঙ্গের মধ্যে পুরুষ জাতির মাংস শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বপ্রাণি সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত সাধারণ উক্তি ভিন্ন ছাগ সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ উক্তি নাই। যদি নপুংসক ছাগের ব্যবহার কাশীরাজের অভিপ্রেত হইত তবে নিশ্চয় তিনি মহর্ষি সুশ্রুতকে তদনুসারে উপদেশ দিতেন এবং সুশ্রুত সংহিতায়ও আমরা উহা লিপিবদ্ধ দেখিতাম। সুশ্রুত টীকাকার ডল্লনাচার্য্যও নপুংসক ছাগ ব্যবহারের অভিপ্রায় সমন্ধে কোন কথা বলেন নাই কেন? যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুত সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত হাতের লেখা গ্রন্থই প্রচলিত ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র সেদিন, সুতরাং মধ্যযুগে আর্য্য জাতির অধঃপতনের প্রবলবন্যায় হয়তো লিপি-করভ্রমপ্রমাদ বশতঃ সুশ্রুত সংহিতার নপুংশক ছাগ ব্যবহার্থ উপদেশমূলক অংশটুকু ভাসাইয়া দেওয়ায় উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রশ্নে উত্তর আমার বক্তব্য এই যদি তাহাই হয় তবে মধ্যযুগের অবনতির পূর্ব্ববর্ত্তীকালে আবির্ভূত মহামতি শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্য আত্রেয় ও ধন্বন্তরী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সংহিতা-বলী মন্থন করিয়া যে "অষ্টাঙ্গহৃদয়" নামক অমৃতময় গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে নপুংশক ছাগ ব্যবহারের অনুশাসন নাই কেন? উক্ত গ্রন্থপ্রণয়নে সুশ্রুত সংহিতা ও ও শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্যের একটী প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকিবে। এমতাবাস্থায় যদি প্রাচীন সুশ্রুতে নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান থাকিত তবে শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্য নিশ্চয়

উহা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন, শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থখানিও পূর্ব্বতন সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং প্রামাণ্যই বলিতে হইবে। সেই গ্রন্থেও নপুংসক ছাগের বিধান নাই কেন? চরকটীকাকার চক্রপাণি দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চক্রদত্ত" নামক সংগ্রহ গ্রন্থে বাত ব্যাধি অধিকারোক্ত "ছাগলাদ্য ঘৃত" "মহামাস তৈল" প্রভৃতি এবং উহাদের টীকাতে নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই। যদি উহা কাশীরাজের অভিপ্রেত হইত তবে চক্রপাণি দত্ত এবং চক্রদত্ত টীকাকার শিবদাস শেঠের উক্তিতে উহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইতাম। শ্রীমৎ সিদ্ধ নিত্যনাথ কৃত "রসরত্নাকর" নামক গ্রন্থে কিরূপ ছাগ গ্রাহ্য তৎ সম্বন্ধে লিখিত আছে "নাতি বালা ন সূতচে ন বৃদ্ধা ন চ রোগিণী। মধ্যস্থা তরুণী গ্রাহ্যা কৃষ্ণা বৃষা বিশেষতঃ॥" তাঁহার এই উক্তি সুশ্রুতমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মহামতি শার্ঙ্গধর বিরচিত "শার্ঙ্গধর" নামক গ্রন্থে "মাষাদি তৈলে" ছাগমাংসের ব্যবহার দেখিতে পাই। গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বহু বহু পারিভাষিক বিধির উল্লেখ করিয়া ছাগমাংস গ্রহণে নপুংসক ছাগের মাংস গ্রহণীর এরূপ একটী অসাশন মূলক শ্লোক দ্বিতীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না করা কি মহামতি শার্ঙ্গধর মহাশয়ের ভ্রম? এই রূপ অনুধাবন করিলে করিলে দেখা যায় যে সুশ্রুত সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কোন প্রামাণ্য গ্রন্থেই নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান নাই। এমতাবস্থায় এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই নপুংসক ছাগের ব্যবহার হে কাশীরাজের অভিপ্রেত একখানা পরিভাষা রচয়িতা কোথায় পাইলেন তিনি বর্ত্তমান্ জীবিত থাকিলে উহা স্বপ্নে আদেশ হইয়াছিল কিনা সে প্রশ্নেরও মিমাংসা করিয়া লওয়ার সুবিধা হইত। "যার বাড়ী বিয়ে সে জানেনা পাড়াপড়শি বল্‌ছে ও দের বাড়ী বিয়ে" এ ব্যাপারটীও তদ্রূপই দাঁড়াইল কি? বুদ্ধিমান পাঠক এক্ষণে বিচার করুণ যে "কাশীরাজ মতেনৈব ছাগমেব নপুংসকং" এই উক্তি কতদূর সত্য। আর যদি কেহ বলেন যে এই কাশীরাজ স্বয়ং দিবদাস ধন্বন্তরী নহেন, তিনি অন্য কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক হইবেন। যদি তাহাই হয় তবে এক কথায় সর্ব্ব গোল মিটিয়া যায়। রাজা থাকিতে কাতোয়ালের দোহাই দেওয়া আর চরক সুশ্রুত বাগভটাদি মনিষিগণের মত পায়ে ঠেলিয়া মধ্যযুগের অন্ধকারময় সময়ে আবির্ভূত কাশীরাজ ভট্টাচার্য্য বা কাশীরাজ সেন গুপ্ত নামক কোন রাজ বৈদ্যের মতানুসারে বিনা বিচারে মানিয়া লওয়া একই কথা। যাহা হউক এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে বিনা আপত্তিতে নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধি প্রচলিত করিবার জন্য কাশীরাজের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিভাষা মধ্যযুগে কোন বৈদ্য কর্ত্তৃক কল্পিত এবং শ্লোকাকারে রচিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে উহা পরিভাষা প্রদীপ নামক সংগ্রহ গ্রন্থে গোবিন্দ সেন স্বয়ং টীকা করিয়া উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

পরিভাষা রচয়িতা কেবল কাশীরাজের দোহাই দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরে আরও লিখিয়াছেন, "অভাবাদপ্রতিক্ষাধা বৃদ্ধ বৈদ্যো-

পদেশতঃ। বন্ধ্যাছাগী বিপক্তব্যানতু শাস্ত্রমতং চরেৎ" ॥ এই কথা হইতে পাঠক মহাশয় আরও একটী মজা দেখুন। "নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ" এই বাক্য দ্বারা তিতি প্রতিপাদন করিতেছেন যে "কাশীরাজ মতেনৈব ছাগমেব নপুংসকং" তাঁহার এই উক্তি যেন কতই না শাস্ত্র সঙ্গত উক্তি; আর বন্ধ্যাছাগীর ব্যবহার শাস্ত্রসঙ্গত না হইলেও বৃদ্ধ বৈদ্য মতানুযায়ী। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কাশীরাজের দোহাই দিয়া নপুংসক ছাগের ব্যবহার, শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কি সুন্দর ভাষাগত কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

গ্রন্থগত প্রমানাদি দ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে ঘৃত তৈলাদির পাকে বর্ত্তমানে যে নপুংসক ছাগ মাংস ব্যবহৃত হয় তাহা কাশীরাজের অভিপ্রেত নহে। কাজেই এক্ষণে বিচার্য্য এই ঘৃত তৈলাদির পাকে নপুংসক ছাগ, বন্ধ্যা ছাগী, পাঠা, কৃতক্লীবছাগ (খাসী) এবং ছাগী ইহাদের মধ্যে কোন জাতির ব্যবহার সমিচীন? অনেকেই হয়তো বলিবেন নপুংসক ছাগের ব্যবহার কাশীরাজের মতানুযায়ী না হইলেও বহুকাল যাবৎ বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহার সিদ্ধ বলিয়া উহাই প্রশস্ত। কথাটী বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িল। প্রথমেই আমার জিজ্ঞাস্য, বৃদ্ধ বৈদ্য কাহারা? শ্রীমৎ বাগভট্টাচার্য্য চক্রপাণি দত্ত শাঙ্গধর, শ্রীমদ্ভাব শ্রীমৎ সিদ্ধনিত্যনাথ, ডল্লনাচার্য্য, শিবদাস সেন প্রভৃতি মহামান্য চিকিৎসকগণ বৃদ্ধ বৈদ্য সংজ্ঞাভুক্ত নয় কি? কিন্তু কৈ, তাঁহারাতো নপুংসক ছাগ ব্যবহার করেন নাই? যদি কেহ বলেন, মধ্যযুগে আবির্ভূত বৃদ্ধ বৈদ্যগণের ব্যবহার সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতেই বা দোষ কি? কিন্তু মধ্যযুগে আর্য্য জাতির প্রবল অধঃপতন সময়ে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের আবির্ভাবই যে আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ একথা শিক্ষিত সম্প্রদায় একেবারে অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? কারণ তাঁহাদের সময়েই আয়ুর্ব্বেদের এত অধঃপতন, তাঁহাদের সময়েই প্রামাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীর বিকৃতি; তাঁহাদের সময়েই বহু মূল্যবান গ্রন্থের লোপ, তাঁহাদের সময় হইতেই ব্যবহারিক অস্ত্রচিকিৎসার অপ্রচলন, তাঁহাদের সময় হইতেই নানারূপ অশাস্ত্রিয়, অযৌক্তিক কদভ্যাসের অবাধে প্রচলন; সুতরাং মধ্য যুগের বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বয়োবৃদ্ধ কি জ্ঞান বৃদ্ধ ছিলেন সে সম্বন্ধে মহাসংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কবিরাজদের ভিতর কেহ কেহ যেখানে বড় ঠেকাঠেকির ব্যাপার দেখেন সেখানেই বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করেন। আবার আরও একশ্রেণীর কবিরাজ আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ থাকিবে তাহাই অভ্রান্ত বেদবাক্য অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত। তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক লেখার ক্ষমতা এক মাত্র স্বয়ং ভগবান অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্যতিত অন্য কাহারও ছিল না বা নাই। যাঁহারা এই ভ্রান্ত অন্ধ বিশ্বাস লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই, তবে যাঁহারা প্রকৃতই সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যাহা হউক সাধারণ ছাগ মাংস অপেক্ষা

নপুংসক ছাগ মাংস শ্রেষ্ঠ কিসে? সোম গুণাত্মক শুক্র এবং আগ্নেয় রজঃ এতদুভয়ের সমভাগে মিলনে নপুংসকের সৃষ্টি. বিবিত গুণ বিপরিত গুণের হ্রাস কারক বিধায় নপুংসক ছাগে শুক্র ও রজের যোগটী হীন যোগ নয় কি? পুরুষত্ব বিহীন মেদ রোগীর ন্যায় নপুংসক ছাগের মাংসে প্রচুর পরিমাণে মেদ ও মাংস স্নেহ বসা বিদ্যমান থাকায় উহার মাংস দেখিতে ও খাইতে সুশ্রী, কোমল ও বড়ই উপাদেয় বলিয়া যদি মাননীয় পরিভাষা রচয়িতা মহাশয় মোহিত হইয়া থাকেন তবে তিনি উহার নির্ব্বিবাদে সাধারণে ব্যবহারের জন্য স্বয়ং কাশীরাজ ধন্বন্তরীর দোহাই দিয়া বসিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি মোহবশে আকন্দের আটাকে খাঁটী দুগ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন তাই বলিয়া সকলেই যে সেই ভ্রমে পতিত হইবে তাহার অর্থ কি? ঔষধার্থ মাংস ব্যবহার্য্য, মেদ বা বসা নহে, তাঁহার একথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল কি? নপুংসক ছাগ বিকলাঙ্গ বলিয়া উহার রস রক্তাদি সপ্তধাতুর সুচারুরূপে অবাধ ক্রম বৃদ্ধি হয় কিনা কে বলিবে? উহার মাংস রস বীর্য্য বিপাকে যাহাই কেন না হউক কিন্তু তাহার প্রভাব কি? নপুংসকে শুক্র ও রজের মধ্যে কোন ধাতুরই প্রাধান্য নাই কাজেই উহার কি পুরুষোচিত কি স্ত্রীজনোচিত উভয় প্রকারের কাম বেগাদি জনক প্রভাব নাই, সুতরাং বাজীকরণ ও অপত্যয়নকত্বাদি প্রভাব না থাকায় উহা সাধারণ ছাগ মাংস অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? যাঁহারা কথায় কথায় বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়া বসেন তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার আছে কি? পরিভাষা প্রদীপে গোবিন্দ সেন কৃত টীকায়, "ননু বন্ধ্যায়া নপুংসকস্য চ ছাগস্য অপত্যজনকত্বং নাস্তি, তৎ কথমপত্যকস্মিনঃ প্রবর্ত্তন্তে ছাগাদি ঘৃতাদিষু? কদাচিৎ ক্রিয়াসিদ্ধেরভাব স্যাদতশ্চিন্ত্যম্" এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে অপত্য জনকত্বাদি প্রভাব না থাকায় বন্ধ্যা ছাগী এবং নপুংসক ছাগ ব্যবহার যুক্তিযুক্তি কিনা সে সম্বন্ধে টীকাকার গোবিন্দ সেন মহাশয়ের ও সন্দেহ দাঁড়াইয়াছিল এবং এস্থলে ক্রিয়া সিদ্ধির অভাব হয় বলিয়া নপুংসক ছাগ ও বন্ধ্যাছাগী ব্যবহার্য্য কিনা সে বিষয় চিন্তনীয়, এই উক্তি করিয়াই এড়াইয়া গেলেন। গোবিন্দ সেন মহাশয় সম্ভবতঃ সরল বিশ্বাসে টীকা করিয়াছিলেন কাজেই নপুংসক ছাগের ব্যবহার প্রকৃতই কাশীরাজের অভিপ্রেত কিনা সে সম্বন্ধে তলাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস নপুংসক ছাগ সহজ ক্লৈব্য রোগগ্রস্ত, খাসী অভিঘাতজ ক্লৈব্য রোগগ্রস্ত; এবং বন্ধ্যা ছাগী বন্ধ্যারোগগ্রস্ত, এমতাবস্থায় সুশ্রুতোক্ত "কাস শ্বাস করং বৃদ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূষিতং" এই বাক্যানুসারে নপুংসক ছাগ, বন্ধ্যাছাগী ও খাসী ত্রিদোষ কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আপত্তি কি? নপুংসক ও খাসীর মাংস অত্যন্ত চর্ব্বি যুক্ত কাজেই,—"মাংসং সদ্যোহতং শুদ্ধং বয়ঃস্থঞ্চ ভজেৎ, ত্যজেৎ। মৃতং কৃশং ভৃশং মেদ্যং ব্যাধিবারি বিষৈর্হতম্॥ বাগ্‌ভটাচার্য্যের এই উক্তির "ভৃশং মেদ্যং" শব্দদ্বারা উহা পরিত্যজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না কি? ভাবপ্রকাশে কৃতক্লীব ছাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে, "মাংসাং নিঃকাসি-

তাগুস্য ছাগস্য কফকৃতগুরু," এবং সাধারণ পাঠার মাংস সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"ছাগ মাংসং লঘু স্নিগ্ধং সাদু পাকং ত্রিদোষনুৎ" ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে খাসীর মাংস কফকারক ও গুরুপাক নিবন্ধন লঘুপাক ও ত্রিদোষ নাশক ছাগ মাংস অপেক্ষা নিকৃ। যাহা হউক যে কয়েকটী কথা উপরে লিখিলাম তাহা হইতেই আশা করি নপুংসক ছাগ খাসী ও বন্ধ্যাছাগী ঔষধার্থ ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়াই প্রমানিত হইয়াছে।

অতঃপর ঔষধে পাটার মাংস ব্যবহার্য্য কি ছাগীর মাংস ব্যবহার্য্য যে সম্বন্ধে বিচার্য্য সুশ্রুতোক্ত "স্ত্রিয়ং শ্চতুষ্পদেষু পুমাংসো বিহঙ্গেষু" ইত্যাদি বচনের এবং শ্রীনিত্যা নাথের রসরত্নাকরোক্ত "নাতিবালা নসুতাচ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ছাগীর মাংস ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তিনি করুণ, তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণ বশতঃ আমি সাধারণতঃ পাটার মাংস ব্যবহারের পক্ষপাতী। চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সুশ্রুতে উক্তি দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় উহার মাংসের লঘুত্ব প্রযুক্তই হইয়া থাকিবে। বাগ্ভটোক্ত "লঘুর্যোষিচ্চতুষ্পাৎসু বিহঙ্গেষু পুনঃ পুমান্" এই বচন হইতে উহাই যেন সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক সুশ্রুতোক্ত তদ্বিধ উক্তি সমুদয় চতুষ্পদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে কেবল ছাগ সম্বন্ধে কোন বিশেষ ভাবের উক্তি নাই। ভাগ্বটের অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে দেখা যায় "নাতিশীতং গুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষলম্। শরীর ধাতু সামান্যাদন-ভিষ্যন্দি বৃংহণম্॥ অর্থাৎ ছাগমাংস অল্প শীতবীর্য্য, গুরু, অল্পস্নিগ্ধ এবং নির্দ্দোষ। ইহা মনুষ্য মাংসের তুল্যগুণ বিশিষ্ট বলিয়া মাংসবর্দ্ধক এবং অনভিষ্যান্দি। কেবল মাংস বিষয়ে তুল্যতা আছে এমন নহে ছাগ শরীরগত রস রক্তাদি অন্যান্য ধাতু সমূহও মনুষ্যশরীরস্থ রস রক্তাদি ধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট। বাগ্-ভটের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে পুরুষের সপ্তধাতু পাটার সপ্তধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের সপ্তধাতু ছাগীর সপ্ত ধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং পুরুষের ব্যবহারার্থ ঔষধ পাঠার মাংস দ্বারা এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ছাগীর মাংস দ্বারা প্রস্তুত করিলেই অধিকতর ফলদায়ক হইতে পারে কি? যাহা হউক নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য অবগত হওয়ার জন্য রাজসাহী নিবাসী সুশ্রুত টীককার মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়কে লিখিলে তিনি পোষ্টকার্ডে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশটুকুমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"যেমন বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিতে পুরাতন কুষ্মাণ্ড দেওয়া প্রচলিত হইয়াছে তেমনি নপুংসক ছাগমাংস প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই প্রমাণ হয়, মুদ্রিত করিলেত বেদবাক্য, এই রূপে নপুংসক ছাগ প্রশস্ত হইয়াছে। আপনি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হৃষ্ট পুষ্ট যুবা পাঁঠার মাংস দিবেন। স্ত্রী মাংস দিবেন না।"

কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত মন্তব্য আমরাই মতের পরিপোষক। যাহা হউক আমাদের দেশের বর্ত্তমান মাননীয় বৃদ্ধ মহোদয়গণ এ বিষয়ে কি বলেন শুনিতে বাসনা। অলমধিকেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতায় বসন্ত। কলিকাতায় ইহার মধ্যই বসন্ত রোগ দেখা গিয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে কয়েকটী ছাত্র বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে। আমরা ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটী বাড়ীতে বসন্তে আক্রান্ত রোগীর সংবাদ পাইয়াছি। সকলকেই এখন হইতে সাবধান হইতে বলিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘের উদ্দ্যোগে ১১নং নিয়োগী ঘাট ষ্ট্রীট বাগবাজারে শীঘ্রই একটা আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে।

হরনাথ অবৈতনিক পাঠশালা।

১১নং নিয়োগী ঘাট ষ্ট্রীটে হরনাথ অবৈতনিক পাঠশালা নামে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। অস্পৃশ্যীয় ও অশিক্ষিতদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাদান ও তাহাদের প্রাণে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার ঐ বিদ্যালয়ে উদ্দেশ্য প্রায় মাসখানিক হইল ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৮০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে এই ধরণের বিদ্যালয় এই প্রথম। আমরা সকলকেই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি—গত ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার সন্ধ্যার সময় ৪৫, হ্যারিসন রোডে কবিরাজ শ্রীযুত দুর্গাদাস ভট্ট এম, এ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সমিতির ৩য় অধিবেসন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুত অতুলবিহারী দত্ত বি-এস-সি কবিরত্ন মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদে অঙ্গ তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভায় গণ্যমান্য, কবিরাজ, ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ৮টায় সভা ভঙ্গ হয়।

এই সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত অতুল বিহারী একজন উদ্যোগী পুরুষ, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি উপাধিধারী। লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের সেবা করিতেছেন। অতুল বিহারীকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইনি অতি অল্পদিনের মধ্যে চিকিৎসায় যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এই সমিতিরও তেমনি উন্নতি করিয়াছেন। ইহার যে তিনটী অধিবেশন হইয়াছে—তাহাতে কবিরাজ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা শিক্ষাদাতা যেমন ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ ডি-লিট প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যেমন নূতন নূতন জ্ঞান দান করিতেছেন সেইরূপ অনেক নূতন বিষয়ও শিখিয়া যাইতেছেন। আমাদের মনে হয় শীঘ্রই এই সমিতি দেশের ও দশের সেবায় আসিবে। দেশে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে একরূপ সভা সমিতি যত হয় ততই মঙ্গল।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, "গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ
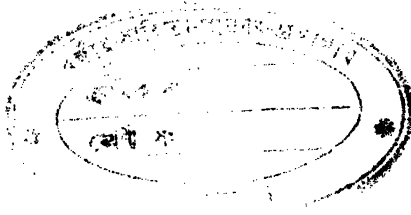
৮ম বর্ষ } পৌষ ১৩৩০ সাল { ৪র্থ সংখ্যা।

চিকিৎসকের কথা।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যা' যায়, তা' বুঝি আর আসে না, যেটি লুপ্ত হয়, তাহার স্থান বুঝি আর পূর্ণ হয় না, যেমনটি একবার হইয়াছিল, তেমনটি বুঝি আর কখন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সৃষ্টি রহস্যে জগতস্রষ্টার ইহাই বুঝি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি আরম্ভের প্রারম্ভ কাল হইতে সৃষ্টি জগতে চলিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ—সকল বিষয়ের জ্ঞানগরিমায় ভারত একদিন যেমন সমুন্নত হইয়াছিল, এখন তাহার লুপ্ত স্মৃতিটী ভিন্ন আর তো কিছুই পড়িয়া নাই। সে ব্যাস-বাল্মীকি, সে মনু, পরাশর, সে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক, একদিন যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাগতিক সকল প্রকার কর্ম্মে ভারতবাসীকে যেরূপ ধর্ম্ম-বিজড়িত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখনকার দিনে স্বেচ্ছাচারভ্রষ্ট ধর্ম্মবিগর্হিত প্রাণ ভারতসন্তানগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সেরূপ আর তো কেহই তাঁহাদিগের স্থান পূর্ণ করিলেন না! কালিদাস, ভবভূতির মত কাব্য ঝঙ্কারেই বা বর্ত্তমান যুগে কয়জনে শুনাইতে সমর্থ হইয়াছেন? খনা-লীলাবতীর মত জ্যোতিষশাস্ত্র প্রচারেও তো এখনকার দিনে আর কেহ উপস্থিত হইলেন না। সেইজন্যই মনে হয়, 'যা যায়, তা' বুঝি আর আসে না, যেটি লুপ্ত হয়, তাহার স্থান বুঝি আর পূর্ণ হয় না, যেমনটি ছিল, তেমনটি বুঝি আর কখন হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধেও সে ধন্বন্তরি দিবোদাস কতকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় আর কাজ নাই, প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের স্থানই বা এখনকার দিনে কয়জনে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসকের প্রধান কৃতিত্ব। এ কৃতিত্ব যাঁহার নাই, তিনি চিকিৎসা কার্য্যে কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না, কিন্তু সে নাড়ী জ্ঞানটা বর্ত্তমান যুগে কয়জনের আছে, তাহা বলিতে পারি না। সে কালের নাড়ী জ্ঞানী চিকিৎসকদিগের কীর্ত্তিকাহিনী এখন যেন গল্পকথায় পরিণত হইয়াছে। ব্যঙ্গ-পরায়ণ সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি রঙ্গরহস্তে কৌতুক উপভোগের জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"মহাশয়! দেখুন দেখি, কেমন আছি! শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না।" নাড়ী জ্ঞানী চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া তাঁহার মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন। বলিলেন,—'এ রহস্য নয় বাপু, এখন তোমার কোন রোগই হয় নাই, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছ, কিন্তু ছয় মাসের বেশী তোমার পরমায়ু নাই, ঠিক ছয় মাস পূর্ণ হইলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেজন্য এখন হইতে প্রস্তুত হও।" বাস্তবিক ঠিক ছয় মাস পরেই সেই ব্যঙ্গকারীর ইহলীলা শেষ হইল।

সেকালের চিকিৎসকদিগের জীবন কথা আলোচনা করিলে এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত অবগত হওয়া যায়। সেকালের মত মুষ্টিযোগ টোট্‌কাও বুঝি একালের চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থায় লোপ পাইয়াছে। সেকালে প্রায় সকল চিকিৎসকই অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিযোগ ও টোটকায় রোগ সারাইতেন। তাহার ফলে লোকের অর্থ ব্যয়ও কম হইত, সহজে রোগও সারিত। এখন চিকিৎসকেরাও মুষ্টিযোগই পাচনের ব্যবস্থায় বিমুখ হইয়াছেন, গৃহস্থও সেরূপ ব্যবস্থায় পালনে অলস। কিন্তু এক এক একটা সামান্য সামান্য মুষ্টিযোগে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, অনেক সময় তাহার কাছে স্বর্ণ রৌপ্যাদিঘটিত অনেক ঔষধই হার মানিয়া থাকে। এই জন্যই সেকালের ঋষি-কল্প চিকিৎসকদিগের অনেকে বড়িগুঁড়ার ব্যবস্থা ছাড়িয়া অধিকাংশ স্থলে এই পাচন মুষ্টিযোগেরই ব্যবস্থা করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ "চরক" এই বনজ ঔষধ সমস্ত লইয়াই লিখিত। এখন অনেকে কথায় কথায় "চরকের" দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু "চরকের মতের চিকিৎসা একরূপ যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ইহা বলিলে দোষ হইবে না।

যুগমাহাত্ম্যে চিকিৎসা কার্য্যটি এখন যেরূপ একটি প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, সেকালে এরূপ ছিল না। সেকালের সকল লোকেই ধর্ম্ম মানিয়া চলিত। অতি পাপাত্মা ভিন্ন সেকালে শাস্ত্রবাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতনা। ধর্ম্মবৎসলবৈদ্য শাস্ত্র নীতি পালনে তদ্গত প্রাণ হইতেন। রোগী দেখিবার সময় তাঁহারা মনে করিতেন,—

"নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্য বিক্রয়ম।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থস্তু বৃত্তয়ে॥"

অর্থাৎ সামান্য লোভপরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসা জনিত পুণ্য বিক্রয় করা উচিত নহে, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ রাজা ও ধনবান ব্যক্তি-দিগের নিকট অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। একালে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। একালের বৈদ্য-চিকিৎসকের প্রতি লোকের ভক্তিও কমিয়াছে এইজন্য। বৈদ্যগণ এক এক-জন পুরা ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছেন। রোগ আরোগ্যের জন্য যেরূপ যত্ন লওয়া উচিত,

এখনকার অনেক চিকিৎসক তাহা লউন আর না লউন, অর্থ উপার্জ্জনের জন্ত অনেকে যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকেন। সে কালে রোগীর বাটীতে আহুত হইলে বৈদ্য নাড়ী দেখিতেন, জিহ্বা পরীক্ষা করিতেন, মুখমণ্ডলের সকলটুকু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেন, মূত্র জনিত দোষ থাকিলে নূতন সরায় মূত্র ধরাইয়া সর্ষপ তৈল সংযোগে মূত্র পরীক্ষা করিতেন, রোগের পূর্ব্বকারণ অনুসন্ধান করিতেন, বর্ত্তমান অবস্থা ভাল করিয়া শ্রবণ করিতেন, এতগুলির তত্ত্ব লইয়া তাহার পর হয়তো একটী মুষ্টিযোগ—নয় তো পাচনের ব্যবস্থা করিতেন। শুধু ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, অনেক সময় খোন্তা কুড়ুল লইয়া নিজেই সে ব্যবস্থার ঔষধি সকল আহরণ করিয়া আনিতেন। সে আহরণও আবার যে-সে দিনে হইত না, শাস্ত্র বাক্য অনুযায়ী প্রশস্ত দিনে এবং প্রশস্ত স্থান হইতে সে সকল সংগ্রহ করা হইত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগেই অনেকে নির্ব্যাধি হইতেন। যখন সেরূপ চেষ্টায় চিকিৎসক ব্যর্থমনোরথ হইতেন, তখন এখনকার মত পাঁচ সাত বারে পাঁচ সাত রকম নহে, একটা দুইটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতেই রোগ সারিয়া যাইত। এখনকার মত সে সকল ঔষধ ষ্টপার কায়েলে কাচের আলমারিতেও রক্ষিত হইত না, সকল ঔষধ তৈয়ার করা হইত কিনা তাহাও সন্দেহ; অনেক সময় ঔষধ তৈয়ার করিবার জন্ত ফর্দ্দ দেওয়া হইত, যে সকল স্থলে তৈয়ারি ঔষধ বৈদ্যের ঘরে রক্ষিত হইত, তাহা হয় পুঁটলির ভিতর, নয় হাঁড়ি কলসীর মধ্যে থাকিত, এখন সেরূপ পুঁটলি বা হাঁড়ি কলসীর মধ্যে ঔষধ রাখিলে তো সে চিকিৎসক অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িবেন। যাহা হউক একালের চিকিৎসা বৃত্তিটা সে কালের সহিত তুলনায় দেশে একটা নূতন যুগ আনয়ন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চিকিৎসা কার্য্যটা ব্যবসায়ের সামগ্রী নহে। জীবন-মরণ লইয়া যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাকে ব্যবসায়ের সামগ্রী মনে করা তো অর্ব্বাচীন বুদ্ধির পরিচয় প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ও লম্বা লম্বা বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়া দোকান খুলিলেই তিনি চিকিৎসক। তা' তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী এবং কর্ম্মকুশল চিকিৎসক হউন বা না হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না, জাঁকজমক করিয়া বসিতে পারিলেই তাঁহার দোকান চলিয়া যাইবে। দেশের এমনি দুর্গতি দাঁড়াইয়াছে; ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অধিকারী একমাত্র বৈদ্যগণই হইতেন, এখন আর তাহা নাই,—এখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধিকারী হইয়াছেন। দুর্গতির কথা আর বলিব কি, এই আজগুবি সহর কলিকাতায় দু'চারি জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দোকান দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অতি শুদ্ধভাবে এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তিথি নক্ষত্র দেখিয়া প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া, শ্রীভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে হয়, সেই সকল ঔষধ এখন আর্য্য-

জাতির আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে প্রস্তুত হইয়া অবলীলা ক্রমে জন সাধারণের উদরস্থ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য জাতি ভিন্ন অন্য জাতির পাককরা ঔষধ সেবন করিলে যে ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যটিই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

অন্যজাতি কৃতঃ পাকোহস্পৃশ্য সর্ব্বজাতি ভিঃ। ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈশ্যঃ পাকে নিয়োজয়েৎ। মোহাদ্দ্বিজাতি বর্ণাদ্যৈঃ পা-চিতং খাদিতে সতি। প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥ অর্থাৎ অন্য জাতির পাককরা ঔষধ সর্ব্ব জাতির অস্পৃশ্য হইয়া থাকে, এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বৈশ্যকেই ঔষধ পাকে নিযুক্ত করিবেন। যদি মোহ কর্ত্তৃক অন্য জাতিতো পরের কথা—দ্বিজাতি গণেরও পাককরা ঔষধ সেবন করেন, তাহা হইলে শূদ্র প্রায়শ্চিত করিবেন এবং দ্বিজাতি জাতিহীন হইবেন। পাঠকগণ এখন বুঝিলেন তো শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিলে তিন টাকার "চ্যবনপ্রাশ" এবং চারিটাকায় 'শ্রীমদনানান্দ মোদক" সেবনের জন্য বিজ্ঞাপনের বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া জাতিধর্ম্ম রসাতলে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক অনেক কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাটি এখন একটী প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। একালের অনেক বৈশ্য সন্তান সেকালের রীতি পদ্ধতি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ মুখে গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামিটি খুবই করিয়া থাকেন। নাড়ী ধরিয়া রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা নাই, অথচ ডাক্তারদিগের থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের প্রয়োগ দেখিলে নিন্দা করিবেন! বক্ষ পরীক্ষার ক্ষমতা নাই কারণ নাড়ীজ্ঞান না থাকিলে বক্ষ পরীক্ষাতো হইতে পারেনা, সে অবস্থায় ডাক্তারদের ষ্টেথেস্কোপ লইতে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। বস্তিক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ কাচের পিচকারীর নিন্দা শতমুখে বাহির করিবেন। অনেক চিকিৎসকের অবস্থাই এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরা অবশ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া ডাক্তারি মত ঢুকাইয়া লও—একথা বলিতেছিনা। সেকালের মত নাড়ীজ্ঞানী হইয়া শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্রত গ্রহণ কর, ইহাই আমরা বলিব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে তাহার অভাব রহিয়াছে, অথচ চিকিৎসকের সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন মরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বসিয়াছ, সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ কতকটা শিক্ষাও করিবার জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক-দিগের পন্থা অনুসরণ করা তো অকর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বাপেক্ষা চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে ত কথাই নাই। তাহাতে ইহকালে অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে কিছু ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরকালের পথ কলুষিত করা হইবে না। দেশের দশের ক্ষতির কারণ জন্মাইয়াও সমাজকে বিধ্বস্ত করা হইবে না।

দন্তরোগের মুষ্টিযোগ।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

আজ কাল অনেকেই দাঁতের অসুখে কষ্ট পাইয়া থাকেন, নিম্নের মুষ্টিযোগ কয়টি ব্যবহারে দাঁতের পোকা, অকালে দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়ায় ও মাড়ীতে ঘা হওয়া, রক্ত পড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগের যন্ত্রণা হইতে তাঁহার উপকার পাইবেন।

১। ভেঁটগাছের শিকড় ২ ভরি ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দাঁতের বেদনা রক্তপড়া, দাঁতের মাড়িফোলা ও দাঁতনড়া প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গের উপশম হয়। ভেঁটগাছ দুইপ্রকার, তন্মধ্যে যে ভেঁটের ফুল বেল ফুলের ন্যায় অনেক পাঁপড়ী যুক্ত হয়, সেই ভেঁটের শিকড় গ্রহণ করিবে। পরীক্ষিত।

২। কলাগাছের মূলসহ খোলসাদি ২ ভরি, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দন্তরোগের আশু যন্ত্রণা নিবারিত হয়। পরীক্ষিত।

৩। রাংচিতার আটা দন্ত বেদনার স্থানে লাগাইবে কিম্বা ডাঁটা দ্বারা দাঁতন বা উহার ডাঁটা ১৫ মিনিট কাল চর্ব্বণ করিবে, এইরূপ সপ্তাহ কাল করিলে যাবতীয় দন্তরোগের উপশম হয়। পরীক্ষিত।

৪। দেবদারু পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা কুল্লি করিলে দাঁতের গোড়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পরীক্ষিত।

৫। ডাবের জল গরম করিয়া কিঞ্চিৎ ফটকিরী চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা বারংবার কুল্লী করিলে দাঁতের গোড়ার ফুলা ও যন্ত্রণা সত্বর নিবারিত হয়।

৬। দন্তমূল ফুলিয়া কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ করিতে থাকিলে লঙ্কাসিজ (জটালঙ্কা) ২০ তোলা, কুচি কুচি করিয়া মাটীর হাঁড়িতে ⁄২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে ⁄॥০ সের থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ফট্কিরীর গুঁড়া দিয়া ঈষৎ গরম গরম বারংবার কুল্লী করিলে সঙ্গে সঙ্গে যাতনার শান্তি হইবে। কুলকুচা করিবার সময়ে ইহার জল যাহাতে পেটের ভিতর না যায় তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন—কারণ ইহাতে পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা।

৭। বীজছাড়ান হরিতকী ভস্ম ৪ তোলা, কচিসুপারি ভস্ম ৪ তোলা, হিংলিদোক্তা তামাক পোড়া চূর্ণ ২ তোলা, ফট্কিরী চূর্ণ ১ তোলা। কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে নড়াদন্ত ও বসিয়া যাইবে, কখনও দাঁত নড়িবেনা বা কোনও প্রকার দন্তপীড়া হইবে না।

৮। নারিকেল মালা পোড়ান কয়লা, ফট্কিরী পোড়ান খই ও ঘেঁচিকড়ি পোড়ান

ভস্ম প্রত্যেকটী সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে এবং ঐ গুঁড়ার দ্বারা প্রত্যহ দাঁত মাজিলে দন্ত নড়া, ফোলা, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় কষ্ট দূরীভূত হইবে। পরীক্ষিত।

৯। ফট্‌কিরী এক তোলা, মোচরস আধতোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহার দ্বারা কুল্লী করিলে দাঁতের বেদনা নিবারিত হয়।

১০। হরীতকী দগ্ধ ভস্ম, দগ্ধ তুঁতিয়া ভস্ম ও কাঁচা হিরাকস—সমপরিমাণ একত্র করিয়া উহার দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তনড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ আরোগ্য হয়।

১১। জাঙ্গীহরীতকি ৫।৬ টা, কালজীরা একছটাক ও ফট্‌কিরী অর্দ্ধছটাক এই গুলি চূর্ণ করতঃ উহার দ্বারা দন্ত মাজিলে যাবতীয় দন্ত রোগের উপশম হয়।

১২। কুচিলা একটা জ্বালাইয়া ধূম রহিত হইলে পেষণ করিয়া বেদনার স্থানে লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়।

১৩। পাঁপ্‌ড়ি খদির, মুসব্বর, তুঁতে ও কর্পূর সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ যেখানে ফুলিয়াছে সেই স্থানে লাগাইলে সত্বর যন্ত্রণার উপশম হয়।

১৪। ত্রিফলার জলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দন্তমাড়ি ফোলা ও ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

১৫। বকুল ছাল সিদ্ধ করিয়া তাহার কুল্লী করিলে দন্তমূল দৃঢ় হয়। ইহার অপক্ক ফল চর্ব্বণ করিলে শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়।

১৬। বচ ও তিল চর্ব্বণ করিলে দন্ত ফোলা ও বেদনা নিবারণ হয়।

১৭। কণ্টকারীর ফল দগ্ধ করিয়া সেই ধূম দন্তে লাগাইলে দন্ত-ক্ষয় জনিত বেদনা নিবারণ হয়।

১৮। ক্রমীঘ্নস্তকী চর্ব্বণ করিলে, মাড়ী ও দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়।

১৯। বড় পানার শিকড় বাটিয়া উহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দন্তের উপর প্রলেপ দিলে, দাঁতের পোকা মরিয়া যায়।

২০। আকরকরা বচ, হীরাকষ পোড়া ও বিটলবণ চূর্ণ করিয়া দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

২১। পাঁপড়ি খয়ের ২ ভাগ, গোলমরিচ ১ ভাগ, কর্পূর।• আনা, তুঁতেপোড়া।• আনা, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া পোকাধরা দন্তের গোড়ায় টিপিয়া লাগাইলে নিশ্চয় উপকার হইবে।

২২। দাঁতের গোড়ায় পোকা হইলে কানেড়া গাছের শিকড় কর্ণে বাঁধিলে দন্তের পোকা বিনষ্ট হয়।

২৩। মনসাসিজের শিকড় চিবাইলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

২৪। আপাং শিকড় চিবাইয়া হুঁকার কটু জলে কুলকুচা করিলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

২৫। যে কোন কলার বাকনা পচা জলে ধুইয়া পোকা খাওয়া দাঁতে বসাইয়া দিলে দাঁতের পোকা মরিয় যায়।

২৬। দাঁতের গোড়ায় পোকায় খাইয়া ছিদ্র করিলে ঐ দাঁত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে, পরে কর্পূর ও আফিং সমপরিমাণে মিশ্রিত করতঃ বটীকা প্রস্তুত করিয়া ক্ষয়িত দাঁতের মধ্যে টিপিয়া দিবে।

তাহাহইলে দাঁতের পোকা মরিয়া যাইবে ও দন্ত বেদনা দূরীভূত হইবে।

২৭। আকরকরা বচ ১ ভাগ, নিশাদল ৩ ভাগ, আফিং ৫ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করতঃ বটীকা প্রস্তুত করিয়া দাঁতের গোড়ার ছিদ্রে পূরণ করিয়া দিবে, ইহাতে দাঁতের পোকা বাহির হইবে ও বেদনার উপশম হইবে।

২৮। লবঙ্গ তৈল, দারুচিন তৈল, স্পিরীট ক্যাম্ফার ইহার মধ্যে যে কোনটী তুলায় করিয়া ক্ষয়িত দাঁতের উপর লাগাইয়া দিলে দন্ত বেদনার উপশম হয় ও পোকা বহির্গত হইয়া যায়।

২৯। দাঁতের বেদনা ও মাড়িফোলায় ছোট পেঁয়াজ ও কালজীরা সমপরিমাণে লইয়া কল্কেতে তামাকের ন্যায় সাজিয়া উহার ধূমপান করিবে। এই ধূমপান প্রত্যহ ৩।৪ বার করিবে—যাহাতে মুখ হইতে অতিমাত্রায় লালা নিঃসরণ হয়। এইরূপ করিলে দাঁতের যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে।

৩০। উর্দ্ধশ্লেষ্মা বশতঃ দন্তবেদনা ও দন্তমাড়ি শিথিল হইলে কাকমাচী, কালাদানা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক সমপরিমাণে জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহারদ্বারা কুল্লী করিলে দন্তের বেদনা নিবারণ হয়।

৩১। আকর কর্মা বচ, খোলাসমেত মসুরি কড়াই ও পোস্তঢেঁড়ী সমপরিমাণে জলে সিদ্ধ করিয়া বারংবার কুল্লী করিলে দন্ত রোগের উপশম হয়।

প্রতিষেধক :—আমরুল শাক ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দাঁত মাজিলে, অথবা সরিষা তৈল ও লবণ মিশাইয়া দাঁত মাজিলে, অথবা রান্নাঘরের ঝুল লবণ সহ একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্ত মাজিলে, অথবা এঁটেল মাটি জলে গুলিয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া শুষ্ক করতঃ ঐ গুঁড়ার দ্বারা দন্ত মাজিলে, অথবা আকন্দ আঠা দন্ত বেদনায় দিলে অথবা পাথুরিয়া কয়লা পোড়া ছাইয়ের সহিত শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা মিশ্রিত করিয়া দন্ত মাজিলে রক্তপড়া, মাড়ীফোলা, অকালে দাঁতপড়া ও দাঁতনড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ নিবারণ হয়। প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পর প্রত্যেকবার আহারান্তে এবং শয়নের পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে দন্তধাবন ও কুল্লী করিলে দন্তমাড়ী সবল থাকিবে ও অসংখ্য রোগে বীজাণু নষ্ট হইয়া যাইবে।

নিদানপরিশিষ্টং।

[স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রক্তপিত্তং।

কোরদূষবোদ্দাল প্রায়মন্নং নিষেবিণঃ।
কুলত্থমাষনিষ্পাবসূপোপহিতমেব বা।
দধিমণ্ডোদশ্বিদম্লকাঞ্জিকোপহিতন্তু বা।
মাহিষাবিকবারাহগব্যমৎস্যামিষৈস্তথা।
শুষ্কশাকপিণ্যাকপিলুকো*পহিতং যদা।
† মূলকাদিকণিক্ষ্বাস্তৈরুপদংশৈঃ সমন্বিতং।
‡ সৌবীরাৎ বদরাম্লান্তমন্নপানং যদাথবা।
পিষ্টান্নমুষ্ণোত্তপ্তো বা ভৃশং বা পয়সাথবা।
রোহিণীশাকমথবা সিদ্ধং সার্ষপতৈলতঃ।
কপোতানাঞ্চ কাণানাং পললন্তু নিরন্তরং।
সেবতে যঃ কুলত্থাদি§পক্কৈর্ব্বা শৌক্তিকৈঃ সহ।
ক্ষীরমাত্রং পিবত্যুষ্ণোত্তপ্তঃ পিত্তং হি তস্য চ।
কোপমাপদ্যতে রক্তং প্রমাণঞ্চাতি বর্ত্ততে।
তেন রক্তেন সংসর্গাৎ তস্য রক্তস্য দূষণাৎ।
তদ্বচ্চ গন্ধবর্ণাভ্যাং রক্তপিত্তমিহোচ্যতে॥
শুক্তাম্লরস উদ্গারো নচান্নমভিকাঙ্ক্ষতি।
বীভৎসতা ছর্দ্দিতস্য বিদাহঃ স্বেদ এবচ।
প্রস্বেদমূত্রশকৃতাং শরীরাবয়বস্য চ।
হরিল্লোহিতপীতত্বং স্বপ্নে চ দর্শনং ভবেৎ।

---

* পীলুফলং পিলুকস্থানে পিণ্ডালুকং কেচিৎ পঠন্তি।

† চরকোক্তেঃ।

‡ সৌবীরমারভ্য বদরাম্লপর্য্যন্তং চরোক্তং।

§ আদিশব্দেন পিণ্যাকশাকজাম্ববলকুচানাং গ্রহণং।

নীললোহিতপীতানাং হরিতানাং তথৈবচ।
অর্চ্চিষ্মতাস্তু রূপাণাং রক্তপিত্তে ভবিষ্যতি ॥

যক্ষ্মরোগঃ।

রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥
সাহসৈরতিমাত্রৈশ্চ জন্তোরুরসি বিক্ষতে।
বায়ুঃ প্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি।
স শিরঃস্থঃ শিরঃশূলং করোতি গলমাশ্রিতঃ।
কণ্ঠোর্দ্ধ্বংসঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকং।
পার্শ্বশূলঞ্চ পার্শ্বস্থো বর্চ্চোভেদং গুদে স্থিতঃ।
জৃম্ভাং জ্বরঞ্চ সন্ধিস্থ উরঃস্থশ্চোরসো রুজং।
ক্ষণনাদুরসঃ কাসাৎ কফং ষ্ঠীবেৎ সশোণিতং।
জর্জ্জরেণোরসা কৃচ্ছ্রমুরঃশূলাতিপীড়িতং।
ইতি সাহসিকং যক্ষ্ম রূপৈরেতৈঃ প্রপদ্যতে।
একাদশভিরাত্মজ্ঞ সেবেতাতো ন সাহসং ॥
হ্রীমত্ত্বাদ্বা ঘৃণিত্বাদ্বা ভয়াদ্বা বেগমাগতং।
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগৃহ্ণাতি যদা নরঃ।
তদাবেগপ্রতীঘাতাৎ কফপিত্তে সমীরয়ন্।
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব বিকারান্ কুরুতেঽনিলঃ।
হর্ষোৎকণ্ঠাভয়ত্রাসশোকরোগাতিকর্ষণাৎ।
অতিব্যবায়ানশনাচ্ছুক্রমোজশ্চ হীয়তে।
ততঃ স্নেহক্ষয়াদ্বায়ুর্বৃদ্ধো দোষাবুদীরয়ন্।
বিকারান্ কুরুতে সর্ব্বান্ পূর্ব্বোক্তানেব* নিশ্চিতং
বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেণ সমশ্নতাং।
রুদ্ধ্বা স্রোতাংসি ধাতুনাং বৈষম্যাদ্বিষমং গতাঃ।
দোষা রোগায় কল্পন্তে পুষ্যন্তি ন চ ধাতবঃ ॥
পূর্ব্বরূপং ভবেত্তস্য দৌর্বল্যং দোষদর্শনং।

---

* চরকোক্তপ্রতিশ্যায়কাসস্বরভেদাদীন্।

অদোষেষ্বপি ভাবেষু কায়ে বীভৎসদর্শনং।
ঘৃণিত্বমশ্মতশ্চাপি বলমাংসপরিক্ষয়ঃ।
প্রিয়তা মদিরায়াঞ্চ প্রিয়তাচাবগুণ্ঠনে।
মক্ষিকাঘুণকেশানাং তৃণানাং পতনানি চ।
প্রায়োহন্নপানে কেশানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনং।
পতত্রিভিঃ পতঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈশ্চাভিধর্ষণং
স্বপ্নে কেশাস্থিরাশীনাং ভস্মনশ্চাধিরোহণং।
ক্ষ্মাভৃতাং জ্যোতিষাঞ্চাপি পততাং যচ্চ দর্শনং॥
পরং দিনসহস্রাণি যদি জীবতি মানবঃ।
সুভিষগিভরুপক্রান্তস্তরুণঃ শোষপীড়িতঃ॥

কাসঃ।

রুক্ষশাতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ॥
কটূকোষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনং।
পিত্তকাসকরঃ ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যজঃ॥
গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নবিচেষ্টিতৈঃ।
বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মানিলং রুদ্ধ্বা কফকাসমুদীরয়েৎ॥

হিক্কাশ্বাসৌ।

মর্ম্মাভিঘাতাদ্দৌর্ব্বল্যাদানাহাচ্ছুদ্ধিদোষতঃ।
অতীসারজ্বরচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ক্ষতক্ষয়াৎ।
রক্তপিত্তাদুদাবর্ত্তাদ্বিশূচ্যালসকাদপি।
পাণ্ডুরোগাদ্বিষাদামাদ্রোগাবেতৌ প্ররোহতঃ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ
জলজানূপপিশিতপিষ্টান্নক্ষীরসেবনাৎ।]
কণ্ঠোরসোঃ প্রতীঘাতাদ্বিবিধৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
মারুতঃ প্রাণবাহীনি স্রোতাংস্যাবিশ্য কুপ্যতি।
উরস্থঃ কফমুদ্ধূয় হিক্কাশ্বাসান্ করোতি হি॥

মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুস্তৃষ্ণা বৈচিত্তজৃম্ভণং।
বিপ্লুতাক্ষত্বাস্যশোষৌ যমলায়াং ভবন্তি চ ॥

অরোচকঃ।

প্রক্ষিপ্তন্তু মুখে চান্নং জন্তোর্ণ স্বদতে মুহুঃ।
অরোচকঃ স বিজ্ঞেয়ো ভক্তদ্বেষমতঃ শৃণু।
চিন্তয়িত্বা তু মনসা দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ ভোজনং।
দ্বেষমায়াতি যো জন্তুর্ভক্তদ্বেষঃ স উচ্যতে ॥
যস্য নান্নে ভবেৎ শ্রদ্ধা সোঽভক্তচ্ছন্দ উচ্যতে।
কুপিতস্য ভয়ার্ত্তস্য যচ্চ ভক্তনিরোধনং ॥

বমিঃ।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধশোকরোগ-
ভয়োপবাসাত্যতিকর্ষিতস্য।
বায়ুর্ম্মহাস্রোতসি সংপ্রবৃদ্ধ
উৎক্লিশ্য দোষান্ তত উর্দ্ধমস্যন্।
আমাশয়োদ্বেগকৃতশ্চ মর্ম্ম
প্রপীড়য়ন্ ছর্দ্দিমুদীরয়েত্তু ॥
অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈ-
রামাশয়ে পিত্তমুদীর্ণবেগং।
রসায়নীভির্বিসৃতং প্রপীড্য
মর্ম্মোর্দ্ধমাগম্য বমিং করোতি ॥
স্নিগ্ধাতিগুর্ব্বামবিদাহিভোজ্যৈঃ
স্বপ্নাদিভিশ্চৈব কফোঽতিবৃদ্ধঃ।
উরঃশিরোমর্ম্ম রসায়নীশ্চ
সর্ব্বাঃ সমাবৃত্য বমিং করোতি ॥
সমশ্নতঃ সর্ব্বরসান্ প্রসক্ত-
মামপ্রদোষর্ত্তু বিপর্য্যয়ৈশ্চ।
সর্ব্বে প্রকোপং যুগপৎ প্রপন্না-
শ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষাং জনয়ন্তি দোষাঃ ॥

(ক্রমশঃ)

কদলীর উপকারিতা।

আমার এক প্রিয় বন্ধু কলার উপকারিতা সম্বন্ধে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এবং প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও অনুরোধ করেছেন সেইজন্য নিম্নে উহার বিষয় কিছু লিখিলাম, আশাকরি জনসাধারণে ইহা হইতে কিছু উপকারিতা অনুভব করিবেন।

জগদীশ্বর দরিদ্রের আহারের জন্য সোনা রূপার থালা কলাগাছেন, রাখিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, উহা তাহার পাতা অধিকন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে উহা ধাতব পাত্র অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, হবিষ্যান্ন ভোজন বা যাগযজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কলার পাতেই হইয়া থাকে ও মাঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ গৃহস্থের বাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পূজার নৈবেদ্যে পাকা কলা দেওয়া অপরিহার্য্য; এ ফল দেবতার স্পৃহনীয়।

যে মস্তিষ্ক ও মেধার বলে ভারতের আর্য্য মনীষিগণ অপূর্ব্ব তথ্য সমুদায় আবিষ্কার বা অমূল্য শাস্ত্র নিচয় বিরচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভূয়িষ্ট রূপে কাঁচাকলার দ্বারাই পুষ্ট হইয়াছিল। শাস্ত্রসেবী সাত্বিক পণ্ডিতকুলের কাঁচাকলা যে আহার্য্যের প্রধান উপাদান, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়বৈরাগ্য, শাস্ত্রসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় সংযমাদি যাহা কিছু মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য বা কাম্যবস্তু, কাঁচাকলা, ঘৃত, সৈন্ধব ও আতপান্ন এই চারিটাই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইবার সাধনীভূত।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ মহিলারা স্বামী পুত্রের হিতকামনায় কলাখোলার নৌকা জলে ভাসাইয়া থাকেন।

কলার গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যে হেতু ইহা বাড়ীর ধারে জন্মে, বাগানেও জন্মে, জমি বেশ পাইট করিয়া চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ৭৮ হাত অন্তর ১৷৷০ দেড়হাত গর্ত্ত করিয়া এক একটী কলাগাছ রোপণ করিবে, পরে তাহার গোড় হইতে তেউড় বাহির হইবে, ইহার আরও কিছু পাট দরকার করে, কেবল মধ্যে মধ্যে গোড়া কোপাইয়া জঙ্গল নষ্ট করা, আর যে কলাগাছে কলা ফলিবে, তাহা কাটিয়া লইবার পরেই উহার গোড়া সমেত গাছটি উঠাইয়া ফেলিবে এবং তথাকার স্থান অর্থাৎ সেই গাছ উঠানতেযে গর্ত্ত হইবে—তথায় নূতন মাটি দিয়া উহা পূরণ করিয়া দিবে। ঐ প্রকার না করিলে গাছ ক্রমে সরু হয় এবং তাহার ফলও সেই রূপ ছোট ও সরু হয়।

ইহা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, আমেরিকা, ফ্লোরিডা, প্রভৃতি দেশে মধ্যম ও তাপযুক্ত স্থান সমূহে, হিমালয় পাহাড়ে শৈলপুঞ্জোপরি, পূর্ব্ববঙ্গে, মালবার উপকূলে', চট্টগ্রামে, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জে, চীনদেশে, স্পেনদেশের দক্ষিণাংশে, আফ্রিকা, রেঙ্গুন, যবদ্বীপ, ফিলিপাইন, বেদিনদেশে, মান্দ্রাজে, জন্মিয়া থাকে। বিলাতে কিন্তু ভাল কলা জন্মেনা। বোম্বায়ে পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুঃপ্রদ বলিয়া পূজা

করিয়া থাকেন ও স্নানের পর কলাগাছে জল দিয়া থাবেন।

কলার গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য। তাই ইহার সংস্কৃত নাম "বারণ বল্লভা;" চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার নাম "ত্বক্‌পত্রী;" সূর্য্যের আলোক ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম "অংশুমৎ ফলা।" ফল দেখিতে অনেকটা হস্তী দন্তের মত বলিয়া ইহাকে "হস্তী বিষাণী" বলা হয়। একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া ইহার অন্য নাম "সকৃৎফলা"। গাছের সার নাই, তজ্জন্য নাম "নিঃসারা"। রাজগণের অতি প্রিয় বলিয়া নাম "রাজেষ্টা" বালকেরা ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া "বালকপ্রিয়া"। মানুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ বলিয়া নাম "উরুস্তম্ভা" ইহার অভিধান। অন্যান্য বৃক্ষ সমূহের মধ্যে কদলী শ্রেণী থাকিলে বড়ই শোভা হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম "বনলক্ষ্মী", পত্র বড় বড় হয় বলিয়া "আয়তচ্ছদা", ইহার অঙ্গ মধ্যে তন্তু সমূহ থাকে, এজন্য "তন্তুবিগ্রহা" বলিয়া অভিহিত হয় এবং গাছের ভিতর কেবল জলই সর্ব্বস্ব বলিয়া নাম "অম্বুসারা" ইহার পর্য্যায়। ভারতবর্ষই কলার প্রধান জন্মস্থান, তবে পার্ব্বত্য স্থানে ভাল জন্মে না। হিমালয় পাহাড়ের শৈলপুঞ্জোপরি এক প্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, শাঁস খুব কম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাই পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতি-

প্রাণি জগতে যেমন গরু, উদ্ভিজ্জগতে তেমনি কলাগাছ—উভয়েরই মৃদু প্রকৃতি, মনুষ্যের চিরসেবক। গরুর যেমন সব জিনিসই মনুষ্যের ব্যবহারে বা উপকারে আসে, কলা গাছও তেমনি! কলার থোড়, মোচা, এঁটে, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল এমন কি ঘা, ফোড়া, ফোস্কা প্রভৃতি বাঁধিতে হইলে কলার মাজ (কচি পাতা) আবশ্যক হয়, ইহার ফেলিবার কিছুই নাই।

১৮৫১ সালে ডাক্তার "হাণ্টার" মান্দ্রাজ মহাপ্রদর্শনীতে কলার পাতে যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক এক প্রকার পার্চমেণ্টের তুল্য, আর এক প্রকার ঠিক যেন রূপার পাতের মত।

১৮৬৪ সালে ডাক্তার 'ক্লে' ইহার দ্বারা এক প্রকার চিটির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মহাপ্রদর্শনীতে ঢাকার শিল্পী কলার গাছের সূতায় প্রস্তুত এক প্রকার অপূর্ব্ব রুমাল দর্শকদিগের দর্শনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

কলার খোলা ও ডাঁটা হইতে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাতে দড়ী, কাছী ও সুন্দর কাপড় হয়। প্রবাদ আছে—ঢাকায় কলার সূতার এক প্রকার বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় তৈয়ার হয়।

কদলী পর্য্যায়।

কদলী সুফলা রম্ভা মোচা বারণবল্লভা।
সুকুমারা চর্ম্মণ্বতী ত্বক্‌পত্রী নগরৌষধি॥

সংস্কৃত নাম—কদলী, সুফলা, রম্ভা, মোচা, বারণবল্লভা, সুকুমারা, চর্ম্মণ্বতী, ত্বকপত্রী,

ইহার অন্তনাম অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, কদল, সকৃৎফলা, গুরুফলা, হস্তীবিষানী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বাল প্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, মোচক, রোচক, আয়তচ্ছদা, ভস্মবিগ্রহা, অম্বুসারা।

দেশভেদে নামভেদঃ—হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ ও কেলাপেড়, বাঙ্গালায় কলা। তৈলঙ্গে—চক্রকেলী, অরটিচেট্টু, বুরগাচেট্টু, গোংড়তোগে, আরটীকায়া। মহারাষ্ট্রে কেল, গুজরাটে কেল্য। কর্ণাটে মরাবালেকাষ্ঠ। তামিলে পাজ মত্রপাপিপসী। ব্রহ্মদেশে হগাপী, লুসাই ভাষায় বাহলা, পালিভাষায় তল ও তমলমপজ, ফারসীতে মাবজমোঝ, আরবীতে তলা, ইংরাজীতে প্ল্যানটেন, ডাক্তারী নাম মুসাসেপিএণ্টম্।

কদলীর ভেদ।

মাণিক্য মর্ত্তাঽমৃত চম্পকাদ্য ভেদাঃ
কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তাগুণা—স্তেঘধিকা ভবন্তি
নির্দ্দোষতা স্যাৎ লঘুতা চ তেষাম্॥

প্রকার ভেদ ও গুণ—মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত ও চম্পকাদি জাতি ভেদে কদলী অনেক প্রকার। সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান এবং তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক।

দেশ বিদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার কলা আছে তাহার বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে মোটা মুটি যতগুলি প্রধানতঃ জানা যায়, তাহার নাম নিম্নে বর্ণনা করা হইল:—

গায়ে ফোটা ফোটা হয়, অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, ইহা দুগ্ধসহ বড়ই উপাদেয় হয়। ইহাকে চাটিম কলাও বলে। মাটাবান হইতে প্রথম ইহা ভারতবর্ষেআসে, সেই কারণ ইহা মর্ত্ত্যমান নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। অমৃত—অতীব মিষ্ট (বোম্বায়ে উৎপন্ন হয়)।

৪। চম্পক কদলী—ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অম্ল, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি। বাঙ্গালায় চাঁপা কলা কহে। ইহা মধুর রস, মধুর বিপাক, অতিশীতল, গুরু পাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক ও বাতাপিত্ত নাশক।

৫। ঢাকাই মর্ত্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নয়, কিন্তু খাইতে ভাল।

৬। কালিবৌ বা কাবুলীকলা—পশ্চিম বঙ্গদেশে কাবুল দেশজাত কলা আর মালব দেশীয় কলার পত্তন হইয়াছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নাম মোহন বাঁশী, রামকলা, কাবলেকলা, চিনিটোপা, সোমদানা, হারুশোকো ইত্যাদি। ফল অত্যন্ত ছোট ও মোটা, গাছ খুব মোটা অথচ খর্ব্বাকৃতি, কাঁদি নামিলে মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়। এই কলা গরম দুধে ফেলিলে গলিয়া যায়, খাইতে মিষ্ট।

৭। শবরী—ইহাকে স্থান বিশেষে মর্ত্ত্যমান বা কাঁঠালী কলা কহে। এই জতীয় কলার মধ্যে "চাপাকলা" স্থান বিশেষে "কাঠলকুশি" নামেও পরিচিত আছে।

৮। কাঁঠালী—পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ

আঠা আঠা হয়। ইহা পূজাপার্ব্বণে অধিক ব্যবহার হয়। (ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে কদমা বলে)।

৯। লতাকাঁঠালী—ইহাও একপ্রকার কাঁঠালী। পূর্ব্বোক্ত কাঁঠালী অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

১০। মালভোগ—সুমিষ্ট ও সুতার, মর্ত্তমানেরই প্রকার ভেদ।

১১। ডিঙ্গামাণিক নামে এক প্রকার অতি বৃহদাকার মুখরোচক কলা এই দেশবাসীর নিত্য খাদ্য। ইহার দুই তিনটী কলা খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি। ক্রমশঃ

রস-সপ্তক।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

(১)

হে রসেন্দ্র! শুভ্রকান্ত! কোন পুণ্যবলে—
মহাযোগেশ্বর হ'তে লভিলা জনম?
পার কি বলিতে তাহা, কি তপঃ সাধিলে?
কিম্বা সম্পাদিলা কোন মহত করম?

(২)

পারদ! নতুবা বল হেন শক্তি কা'র
জরাব্যাধি প্রপীড়িত বিশ্বজনগণে
ভবব্যাধি মহার্ণবে অনায়াসে পার—
করিয়া অন্বর্থ নামা হর ত্রিভুবনে।

(৩)

সূত! তুমি হত হ'লে নাশ জরাময়
মূর্চ্ছিত হ'য়েও কর ব্যাধি বিনাশন।
বদ্ধ ভাবে লহ ওহে যাহার আশ্রয়
অনায়াসে করে সে যে আকাশ গমন॥

(৪)

সূতরাজ! কিন্তু হায়! নাগ বঙ্গ আদি
অষ্ট দোষে দুষ্ট কেন স্বভাব তোমার?
বিপরীত হেরি হেন যেন ক্ষীরোদধি
গরল মিশ্রিত প্রায় ভীতির আগার॥

(৫)

সূতক ! অথবা তব নিসর্গ নির্ম্মল
কলুষিত হইয়াছে লভি সংবাস—
গিরি আদি সনে, ওগো তুমি যে তরল,
কঠিন যে তারা সবে নাহি পরকাশ ?

(৬)

শিবতেজঃ ! হেরি ইহা সিদ্ধ নাগার্জ্জুন
সংসর্গজ দুষ্টি তব বিদায় কারণ,
প্রক্রিয়া করিলা কত অতি সুনিপুণ,
মহৎ মহতে করে স্বস্থানে স্থাপন ॥

(৭)

রস ! তুমি, তাই আজি রসের আগার
উপমিত হয়ে আছ শঙ্করের সনে।
যোগের সাধন তুমি ভারত মাঝারে,
স্বগুণ লভিলে পুনঃ মিলি সাধু সনে ॥

বঙ্গে নানা রোগে মৃত্যুর তালিকা।

জেলার নাম	লোক সংখ্যা	কলেরা	বসন্ত
বর্দ্ধমান	১৩৪৩১৮৫	১৭৮১	১৪৬
বীরভূম	৮৭৮৬৫৫	৫৫৪	১৩৪
বাঁকুড়া	৯৬৪৪৮৭	১১০৫	৯
মেদিনীপুর	২৫৯৫০৭১	৪৪২০	৩৭৪
হুগলী	৯০০৮০২	৭৭৭	৭৮
হাবড়া	৭৭৮৮৯৩	১০৩৩	৫৬
২৪ পরগণা	১৯৯৮৩১৮	৭৪০২	২৮৩
নদীয়া	১৩৯০৭০৪	২৫০২	৬৩
মুর্শিদাবাদ	১১৮২৯৮৩	৮৭০	৭৪১
যশোহর	১৭০০৯২৩	২৬১৩	৪১০
খুলনা	১৪২১১১৬	১১৪৪	৩৪
রাজসাহী	১০৫৭০৩৭	৩২২৮	১৩১
দিনাজপুর	১৬০৭৩২৪	১৮৪	৭৫০
জলপাইগুড়ি	৯২১৭৪৯	৭৯	৩৪৪
দার্জ্জিলিঙ্গ	২৫৪০৪৫	×	×
রঙ্গপুর	২৪৮৮৭৭৮	৩০৭৫	৭৪
বগুড়া	১০৩২৩০০	৩ ৮১	৯৭
পাবনা	১৩৪৪৬১০	৪৩০৬	৪৩
মালদহ	৯:৫৮৩০	১২৬	২৪৮
ঢাকা	২৯৭৫৯১৫	৭৪৫৭	১২৬৯
ময়মনসিংহ	৪৭১০৬৬৯	১৭৫৯২	১১৮৮
ফরিদপুর	২২১০০৫৮	২৭৫৯	৩৬১
বাখরগঞ্জ	২৫৬৩৮৪৯	৩৮২০	১২১
চট্টগ্রাম	১৫৭০৭৬০	১৪৮	১৯৪

নোয়াখালী	৩৩৬৫০৪১	১০০৭	৮৬
ত্রিপুরা	২৬৭৮৬১৭	২০৩৯	৫৭৪
সমগ্রবঙ্গ	৪৩৪৬১৭৮৭	৭৩,৯৪৩	৭৮০৫
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	৪৭২৬৩৫৩০	×	৩

জেলার নাম	জ্বর	ফুস্ফুসের রোগে	উদরাময় ও আমাশয়ে
বর্দ্ধমান	৪০৩৫২	১১ ৩	৯৯৯
বীরভূম	২৭২০৮	৫৯৬	৮১
বাঁকুড়া	২৭৫০৭	১৩৭০	৯৬৩
মেদিনীপুর	৫৯২৭০	২০০৮	১৫০৬
হুগলী	২৩৪২৪	৯০৮	১৩৭৭
হাবড়া	১২০৫৫	৭৪২	২৯২২
২৪ পরগণা	৪৩৯০৬	৫২১	৫৬১
নদীয়া	৪৯৬৩৭	১২২৬	৭৬
মুর্শিদাবাদ	৩৮২১১	১২১	১৬০
যশোহর	৫৪৫৫১	৫৪১	১৯৭
খুলনা	২৭০১১	৯৪	১৫৬
রাজসাহী	৫৭১৬৮	১০৭	১১৬
দিনাজপুর	৫৬৮৬৮	২৬৭	৭৪
জলপাইগুড়ি	২৪৮৭১	৭১৪	৮৭৮
দার্জ্জিলিঙ্গ	৮২০৩	৭২৯	৫২৬
রঙ্গপুর	৬১৬৯৭	১৭৩	১৪১
বগুড়া	২৭৫৯৩	৬৩১	২০২
পাবনা	৩৫২৮০	২০	৬০
মালদহ	২৪০২৯	১৫৫	১২
ঢাকা	৬১৫২৩	২৪৬	১৮৯৮
ময়মনসিংহ	৫৭৬৯৪	৯৪৯	১১০৬
ফরিদপুর	৫৭৬৯৪	৯১	৪২২
বাখরগঞ্জ	৪৭৯৩৯	৯২৭	১৩৭
চট্টগ্রাম	৩৪৯১৭	১৭০	২২৯
নোয়াখালি	২৮০৫৪	৩৫	২৩৪
ত্রিপুরা	৩৫১০৬	১০২	৭৭২
সমগ্রবঙ্গ	১০৪৬৬৬১	১৪৫৬৬	১৬৬৮৯
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	২২১৭	৪২৫৪৫	২৫৪

জেলার নাম	মোট মৃত্যু	সহস্র লোকের মধ্যে জ্বরে মৃত্যুর হার
বর্দ্ধমান	৫০২৭৬	৩০০০
বীরভূম	৩২৫০১	৩১'৭
বাঁকুড়া	৩৭৬৯৯	১৮'৫
মেদিনীপুর	৮০৩১১	২৩'৮
হুগলী	৩১ ৮৫	২৬'০
হাবড়া	২.৩৭১	১৫'৫
২৪ পরগণা	৫৯৮২৩	২২'০
নদীয়া	৬০১১৮	৩৫'৭
মুর্শিদাবাদ	৪৭৪২১	৩২'১
যশোহর	৬৩৯ ৬	৩২'১
খুলনা	৩৬৯ ৮	১৯'০
রাজসাহী	৬২৫৯৪	৩৬'৮
দিনাজপুর	৬১০৮৮	৩৩'৭
জলপাইগুড়ি	২৮৫৬১	২৭'০
দার্জ্জিলিং	১১২৪৬	৩২'৩
রঙ্গপুর	৬৭২২২	২৪'৮
বগুড়া	৩৩৭৬৪	২৬'৭
পাবনা	৪১৫৭৮	২৬'২
মালদহ	২৭৯৩৫	২৫'১
ঢাকা	৮৪৪৯৫	২০'৭
ময়মনসিংহ	১২৩৭৫১	১৮'৩
ফরিদপুর	৬৭৯৬৫	২৬'১
বাখরগঞ্জ	৭১৮৯৩	১৮'৭
চট্টগ্রাম	৩৭৯০২	২২'৩
নোয়াখালী	৩৪৯৬৩	১৯.২
ত্রিপুরা	৪৬৬০০	১৫'১
সমগ্রবঙ্গ	১৩২ ১২৬৬	২৪ ১
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	৪৫৮৬২০৯	২৭'১

—সঞ্জীবনী।

পিত্ত।

(কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

মহামতি বাগ্ভটের টীকাকার শারীর স্থানে তৃতীয় অধ্যায়ে পাকক্রিয়া প্রসঙ্গে ব'লয়াছেন যে

"নমু পার্থিবাদ্যুষ্মভিঃ পক্বস্য পুন র্ধাতূষ্মভিঃ পাকঃ। ধাতূনামপি পাঞ্চভৌতিকত্বার্শ তত্রাপি পার্থিবাদ্যষ্ঞ ভাবঃ শ্চ পার্থিবাদ্যুষ্মভিঃ পুনঃ পাকইত্যেবমষ্টাদশ প্রাপ্নবন্তি।" ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—"সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু ত এব পঞ্চোষ্মাণঃ পার্থিবাদয়ঃ স্থানান্তর প্রাপ্তা ধাতূষ্মাণ ইতি ব্যাপদেশমাসাদন্তি।" ইহার ভাবার্থ এই—পার্থিবাদি পঞ্চভূতগত যে পঞ্চ উষ্মা সেই ধাত্বাদি স্থান গত হইয়া ধাতূষ্মা বলিয়া কথিত হয়। এবং ইহার একটী সুন্দর উপমাও দেখাইয়াছেন—যথা "যথোদকং স্থানান্তরগতং লসীকাদি ব্যপদেশং লভতে।" অর্থাৎ যেমন এক শরীরস্থ জল স্থানান্তরে গমন করিয়া লসীকাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। অরুণ দত্তের এই কথায় বুঝিলাম যে ভূতোষ্মা ও ধাতূষ্মা একই পদার্থ; কেবল স্থান ভেদে সংজ্ঞা ভেদ, আবার পাচকাগ্নি হইতে ভূতাগ্নি ও যে অভিন্ন তাহাও নিঃসন্দেহ, কারণ আমরা পূর্ব্বে সুশ্রুত বাক্য দেখাইয়াছি যে—"তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষানামেব পিত্তস্থানানাং শরীরস্য চাগ্নি কর্ম্মণা অনুগ্রহং করোতি।" এই বাক্য দ্বারা বুঝিয়াছি যে এই পাচক পিত্তই সমস্ত তাপের বা অগ্নির মূলীভূত কারণ, ইহার বৃদ্ধিতেই সমস্ত অগ্নির বৃদ্ধি, এবং ক্ষয়ে সমস্ত তাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, সুতরাং তীক্ষ্ণত্বও মৃদুত্ব বিশেষে যে অগ্নির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম, এখন সদ্ভিঃ সমাধি বিধেয়ঃ।

আমরা পূর্ব্বে পিত্তকে দুই অবস্থায় বিভক্ত করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়াছি, এবং তেজঃ স্বভাব পিত্ত সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বিবৃত করিয়াছি। এখন দ্রব স্বভাব পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শাস্ত্রে কথিত আছে যে রক্তের মল পিত্ত, এই সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—যথা—"কিট্ট মন্নস্য বিন্মূত্রং রসস্তু কফোঽসৃজঃ। পিত্তং মাংসস্য খমলা মলঃ স্বেদস্তু মেদসঃ॥" এই মলভূত পিত্তই পিত্তকোষে সঞ্চিত হয়, এবং বমনাদিতে বহির্গত হইয়া থাকে।

"পিত্তেবিরেচনং" এই বাক্যও এই পিত্তের বিষয়ীভূত। উষ্মাত্মক পিত্ত ও এই পিত্তকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং দ্রবপিত্ত দূষিত হইলে তেজঃপিত্ত ও দূষিত হয়। আবার দ্রবপিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৈসজ পিত্ত ও স্বভাবে অবস্থান করে। দ্রব পিত্ত যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন দ্রবাংশের বৃদ্ধিহেতু

তৈজস পিত্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সুতরাং পরিপাক যথানিয়মে নিষ্পন্ন না হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়. এই দ্রবপিত্ত রক্তের সমগুণ বিশিষ্ট, কারণ, আমাদের শাস্ত্রে আছে "কারণ গুণাঃ কার্য্যগুণ মারভন্তে", অর্থাৎ কারণানুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে পিত্তের কারণ রক্ত, সুতরাং রক্ত আর দ্রব স্বভাব পিত্ত যে অনুরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেই হইবে. এই জন্যই "রক্তপিত্ত" রোগে ভাগ্‌ভট রক্ত পিত্তের তুল্যতা নিরূপণ করিয়াছেন তাহার বচন এই—

"পিত্তং রক্তস্য বিকৃতেঃ সংসর্গাদ্ দূষণাদপি।
গন্ধবর্ণানু বৃত্তেশ্চ রক্তেন ব্যপদিশ্যতে ॥"

রক্ত ও পিত্তের কার্য্য কারণতাবশতঃ তুল্যগুণ নিবন্ধন, এক কারণেই বৃদ্ধিক্ষয় হইয়া থাকে, সেই জন্যই রক্তকে রোগের সাক্ষাৎ জনক না বলিয়া দোষ সংজ্ঞক বায়ু পিত্ত কফই সাক্ষাৎ রোগ জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ পিত্ত যে কারণে কুপিত হয় রক্ত ও সেই কারণে কুপিত হয়। পিত্ত যে ঔষধান্ন বিহার দ্বারা প্রশমিত হয়, রক্ত ও সেই ঔষধান্ন বিহার দ্বারা প্রশমিত হয়। সুতরাং রক্তজ রোগ পিত্তজ রোগেরই অন্তর্ভূক্ত বলিয়া রক্তকে আর দোষ সংজ্ঞায় অবিহিত করা হয় নাই, এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বহ্নি যেমন কাষ্ঠাদি আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, তৈজসপিত্ত ও তেমনি দ্রব পিত্তকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব পিত্ত ও তৈজস পিত্ত পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাবে অবস্থান করে। কিন্তু উভয়গত দ্রবত্ব ও তৈজসত্বাদি বিরুদ্ধ গুণ হইলেও সহজত্ব হেতুক সর্পস্থিত বিষ যেমন সর্পকে হিংসা করেনা; তেমন সহজাত দ্রবত্ব ও তৈজসত্ব পরস্পরকে উপহত করে না দীপ আর বর্ত্তি স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকেই দীপ বলিয়া ব্যপদেশ করে, তেমনি পিত্ত দ্রব ও তৈজস ভাবে ভিন্ন হইলেও উক্ত দ্রব তেজঃ সমুদয়কেই পিত্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং উহাদের গুণ ও চরকাদি মহর্ষিগণ একত্রেই নিবেশ করিয়াছে; যথা "সস্নেহ মুষ্ণং দ্রবমম্লং সরং কটু" ইত্যাদি, ইহার ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

পিত্তের উৎপত্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্রব স্বভাব পিত্ত রক্তের মল ভাগ। তাহার উৎপত্তি শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, রসের সূক্ষ্মাংশ যকৃৎ প্লীহাস্থিত রঞ্জকাখ্য পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে অভিহিত হয়, সেই রক্ত পুনঃ স্বধাত্বুষ্মাদ্বারা পরিপক্ক হইয়া দধি ঘৃত ন্যায়ানুসারে মলভাগ ত্যাগ করে, সেই মলভাগকেই দ্রবপিত্ত বলে। তৈজসপিত্তের উৎপত্তি, যথা আমাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্য হইতে রস উৎপন্ন হইলে রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ পাচকাগ্নি দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া বিদগ্ধ হইয়া থাকে, এই বিদাহের কারণ বোধ হয় অগ্নির সামীপ্য হেতুক তাপাধিক্য। সেই বিদগ্ধ ভুক্ত দ্রব্য অম্লতা প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে এক প্রকার পিত্ত উদ্‌ভূত হয়; সেই পিত্তই তৈজস পিত্ত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত। পিত্তাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে চরকের মত, যথা—"অন্নস্য ভুক্ত মাত্রস্য ষড়্‌রসস্য প্রপাকতঃ। মধুরাখ্যাতাৎ কফোভাবাৎ ফেনভাব উদীর্য্যতে॥ পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধ

স্বাম্লভাবতঃ। আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্ত মচ্ছ মুদীর্য্যতে॥" চরকের এই "অচ্ছপিত্ত" শব্দে রক্তের মল পিত্তই ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং "অচ্ছপিত্ত" শব্দে তৈজসপিত্তই লক্ষিত হয়, কারণ এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন পিত্তের স্থিতি নাই। এবং পিত্তের অচ্ছত্ব বিশেষণ ও অনর্থক হইয়া পড়ে।

চরকের এই বাক্য দ্বারা পিত্তের উৎপত্তি স্বীকার করিলে পিত্তের অনিত্যত্ব আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কারণ; "ধ্বংসপ্রাগভাব রহিত্বং নিত্যত্বং" এই বৈশেষিক নিত্য লক্ষণ অব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, উৎপন্ন বস্তুর প্রাগভাব থাকেই। তথা নিত্য পঞ্চ মহাভূতান্তর্গত তেজকে পিত্ত বলা অসঙ্গত হয়। এই বিপক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চরক কথিত উৎপন্ন পিত্ত সেই পঞ্চভূতান্তর্গত তৈজস পিত্তেরই শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র।

অর্থাৎ রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের বিদাহ হেতু অম্লতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা হইতে এক প্রকার তৈজসশক্তির উদ্ভব হয়। সেই শক্তি-দ্বারা আমাদের তৈজসপিত্তের শক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং সেই বৰ্দ্ধিত শক্তি তৈজস পিত্ত, গ্রহণী নাড়ীতে অবস্থান করিয়া স্বকীয় সূক্ষ্মাংশ দ্বারা অন্যান্য আলোচকাদি পিত্তের স্বকার্য্য শক্তি বৰ্দ্ধন করে। এতদ্দ্বারা বুঝিলাম যে, দ্রবস্বভাব পিত্ত রক্তের মল এবং তৈজস পিত্ত পাঞ্চভৌতিক তেজঃ পদার্থ। এই তেজ পদার্থ যখন পচনাদি ক্রিয়ায়ানৈরন্তর্য্য বশতঃ দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের অম্লভাব হইতে এক প্রকার তেজঃশক্তি সমুদ্ভূত হইয়া দুৰ্ব্বল তৈজস শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া স্বকর্ম্ম সাধনে সামর্থ্য দান করে।

পিত্তের স্থান।

পিত্তের স্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"স্বেদোরসোলসীকারুধিরমাশয়শ্চ পিত্ত-স্থানানি। তত্রামাশয়ো বিশেষণ পিত্ত স্থানং।" অর্থাৎ স্বেদ, রস, লসীকা, রক্ত ও আমাশয় পিত্তের স্থান, তন্মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের বিশেষ স্থান। আমাশয় শব্দে এস্থলে গ্রহণী নাড়িকেই লক্ষ্য করিয়াছে, কারণ আমাশয় রসের স্থান বলিয়াই সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন. স্বেদ শব্দে এ স্থানে স্বেদের কারণ মেদকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার বহুস্থলেই প্রমাণিত হইয়াছে। পিত্ততেজদ্বারা মেদ হইতে স্বেদের নির্গম হয়। তাই বোধ হয়। স্বেদকে পিত্তের স্থান বলা লইয়াছে। রস শব্দে রসের স্থানে লক্ষণা. রসের স্থান হৃদয়. তথাচ ভাবমিশ্র—"সৰ্ব্বদেহ চরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলং। সমান মরুতা পূৰ্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥" সেই হৃদয়স্থিত পিত্তেরই সাধকসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে পরে প্রতিপাদিত হইবে, লসীকা, ত্বঙ্‌মাংসের অভ্যন্তরস্থিত জল বিশেষকে লসীকা বলে, তথাচ চরক—যত্তু মাংস ত্বগন্তরে উদকং তল্লসীকা সংজ্ঞ-লভতে।" এই লসীকাস্থিত পিত্তকে ভ্রাজক পিত্ত বলে। রুধির শব্দেও তদাধারে লক্ষণা করিতে হইবে। রক্তের আধার প্লীহা ও যকৃৎ। উহারাই রঞ্জক "পিত্তের স্থান, আমাশয় শব্দে তৎ সমীপস্থিত গ্রহণী তাহা পূৰ্ব্বেই দেখাইয়াছে। অতএব তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা বাহুল্য। এখন আমাদের দেখিতে

হইবে—গ্রহণীকে পিত্তের বিশেষ স্থান বলা হইল কেন। আমাদের মনে হয়, এই গ্রহণী-স্থিত পিত্তই অন্নকে পরিপাক করে; এবং এই স্থানের পিত্তই অন্যান্য স্থানের পিত্তের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে; সেই জন্যই পিত্তের বিশেষ স্থান গ্রহণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এস্থানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন পিত্তের প্রাকৃতিক কর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পিত্তের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

শাস্ত্রকারগণ পিত্তের স্বভাবজাত কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

"দর্শনং পক্তিরুষ্মাচ ক্ষুৎ তৃষ্ণা দেহ মার্দ্দবং।
প্রভা প্রসাদো মেধাচ পিত্ত কর্ম্মা বিকারজং॥"

দর্শন ক্রিয়া দৃষ্টি মণ্ডলস্থ আলোচক পিত্তের কার্য্য। অর্থাৎ আমাদের নয়নে পাঁচটী মণ্ডল আছে যথা পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্ম মণ্ডল, শ্বেত মণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল, ও দৃষ্টি মণ্ডল; সমস্ত মণ্ডলের অভ্যন্তরে দৃষ্টিমণ্ডল অবস্থিত, এই দৃষ্টিমণ্ডল পঞ্চমহাভূতের সারাংশ হইতে উৎপন্ন, এবং ইহা খদ্যোত ও স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ ও অব্যয় তেজ বিশিষ্ট। যথাহ সুশ্রুত "মসূরদলমাত্রান্তু পঞ্চভূত প্রসাদজাং, খদ্যোত বিস্ফুলিঙ্গভাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ॥" আমাদের অন্তঃ-করণ মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তদ্বিষয় রূপাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাকেই বলে দর্শনাদি ক্রিয়া অতএব মন, দৃষ্টিমণ্ডলস্থিত যে তেজরূপ আলোচক পিত্ত আছে, তাহার আনুকুল্যেই রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় মনের সেই গ্রহণ ক্রিয়ার সাধকতম বলিয়া ইন্দ্রিয়ের করণত্ব সিদ্ধ থাকিলেও কর্তৃত্বের ও বিবক্ষা বহুশঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় সেই জন্যই দর্শনক্রিয়া তেজময় পিত্তেরই কার্য্য বিবক্ষাকরিয়া গ্রন্থকার ও দর্শনকে পিত্তের কার্য্য তালিকায় ভুক্ত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

চিকিৎসায় রসৌষধ।

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

ধরাপৃষ্ঠে প্রথম যখন রোগের আবির্ভাব হইল, মানব তখন তাহার সম্মুখে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাইল, তাহাই লইয়া রোগারোগ্যের জন্য যত্নপর হইল। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি এবং নানাবিধ জীবের মাংসাদি সেই সময় হইতে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সকল দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইলেও কয়েকটী কারণে চিকিৎসকগণ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যদিও উদ্ভিদই জীবের প্রকৃত আহার এবং শারীর বৈষম্য দূর করিতে সর্ব্বথা সমর্থ, তথাপি কাল প্রকর্ষে ভূমির উর্ব্বরতা-

হানি নিবন্ধন উদ্ভিদের শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল এবং যে সকল জীবের মাংসাদি লইয়া কল্পিত হইত, তাহাদের মাংসাদিও হীন শক্তি উদ্ভিজ্জ আহারের ফলে আর সম্যক্ পুষ্ট থাকিলনা। এই সকল কারণে তাহাদের রোগ নাশক শক্তিও হীন হইতে লাগিল বলিয়া ঔষধে আশানুরূপস্য ফল পাওয়া গেলনা। তখন রোগ নাশের জন্য ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধ হইল এবং "মাত্রায়া হীনয়া ...বাং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ" অর্থাৎ হীন মাত্রায় দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বিকার নিবৃত্ত হয় না, এই বিধি নিবদ্ধ হইল। এই সকল কারণে "উত্তমস্য পলং মাত্রা" ইত্যাদি অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে ভেষজের মাত্রা এক... নি...রিত হইল দেখিতে পাই।

কিন্তু ইহাতেও ভিষক্‌গণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, ভেষজ যে প্রকার শক্তিহীন হইয়াছে, অন্নপানীয়ও ঠিক সেই প্রকার শক্তিহীন হইয়াছে এবং সেই হীনশক্তি অন্নাদির পান ভোজন জন্য মানব শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ দুর্ব্বল শরীরে এতাধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী সহ্য করিতে পারেনা, এই জন্য ভেষজ সেবন করাইয়া কিছু ভোজন করাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়, নতুবা অত্যন্ত গ্লানি এবং বলক্ষয় উপস্থিত হয়। যথা "ভেষজমন্নহীনম্। গ্লানিং পরং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ"।

পরন্তু কাষ্ঠৌষধ সকল, তিক্ত, কটু, কষায় প্রভৃতি অহৃদ্য রস বিশিষ্ট বলিয়া নিরন্তর ব্যবহার করিলে অরুচি প্রভৃতি রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অরুচি প্রভৃতির ফলে রোগীর আহার কমিয়া যায় বলিয়া রোগী অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আরোগ্য বলকেই আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় "যদুক্তং বলাধিষ্ঠাণমারোগ্যম্"।

সেই বলই যদি দূর হয়, তবে আরোগ্যের আশা কমিয়া যায়। পরন্তু কাষ্ঠৌষধ অধিকাংশই সংশোধন বলিয়া বহু স্থলেই বমন বিরেচন প্রভৃতির কার্য্য করে। এই জন্য অনেক স্থলে, ইহার প্রয়োগে হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই সাধিত হইয়া থাকে। অতিসার, গ্রহণী, যক্ষা প্রভৃতি রোগে কষায় প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ মাত্রেই অনুলোমক এবং অতিসারঘ্ন ঔষধ মাত্রেই গ্রাহী, উভয়েই বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এই জন্য চিকিৎসককে জ্বরাতিসার চিকিৎসার বিশেষ বেগ পাইতে হয়। শোথে অতিসার কিম্বা অতিসারে শোথ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অরিষ্টলক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইহার কারণ এই—শোথের যে সকল ঔষধ নিরূপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই রেচন; সুতরাং শোথ কমাইতে গেলে অতিসার বাড়ে এবং অতিসার কমাইতে গেলে শোথ বাড়িয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় কোনই ফল পাওয়া যায় না।

রোগী রোগের প্রভাবে অভিভূত কিম্বা অচৈতন্য হইয়া পড়িলে অধিক মাত্রায় প্রয়োজ্য ঔষধ সকল সেবন করান যায় না; সুতরাং সেরূপ স্থলে ভেষজাভাবে রোগীর অপকার সাধিত হয় আবার ঘৃতাদি স্নেহ ঔষধ ও সর্ব্বস্থলে প্রয়োগ করা চলেনা কারণ অনেক স্থলে ঐ সকল ঔষধের প্রভাবে

অজীর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়।

কাষ্ঠৌষধ প্রয়োগের আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে, ঔষধ সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; একপ্রকার শোধন এবং অন্যপ্রকার শমন। যদুক্তং—শোধনং শমনঞ্চেতি সমাসাদৌষধং দ্বিধা। ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। এই শোধন ঔষধই রেচন, স্রংসন, অনুলোমন, ভেদন, বমন প্রভৃতি নানাপ্রকারের দেখা যায় এবং শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরুহন, লাবণ প্রভৃতি এই পঞ্চকর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম অতি কষ্ট সাধ্য এবং অনেক রোগীই শোধনার্হ নহে। ইহাদের জন্য সংশমন ঔষধ ব্যবস্থেয়, কিন্তু কাষ্ঠৌষধের মধ্যে সংশমন ঔষধ খুব কমই পাওয়া যায়। অপর অসুবিধা এই যে, কাষ্ঠৌষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে কালের অপেক্ষা করিতে হয়, যেমন সামজ্বরে জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবে না। অতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শ প্রভৃতি রোগের সামাবস্থায় স্তম্ভন ঔষধ দিবে না। ইহাতে অনেক সময় যে খারাপ ফল হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল কারণে স্মরণাতীত কাল হইতে চিকিৎসার জন্য নানাবিধ সুগম উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়াছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত ভেষজগুলি হীনবীর্য্য হইলেও পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রত্নরাজি রোগনাশের জন্য হীনবীর্য্য নহে। এসকল দ্রব্যে ভেষজ শক্তিপ্রদান পুরঃসর রোগে প্রয়োগ করিতে পারিলে উহারা যে রোগ দূর করিতে সমর্থ হইবে, চিকিৎসকগণ এই সিদ্ধান্ত করিলেন। অথর্ব্ববেদে ধাত্বাদির রোগ নাশক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে নানাপ্রকার ধাতব ঔষধের ব্যবহার বিধি বিদ্যমান আছে। পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ তান্ত্রিক যুগে রসৌষধসমূহের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সর্পবিষের ঔষধ।

রংপুর নিরগঞ্জ হাট হইতে এছহাক উদ্দীন কবিরাজ "বঙ্গবাসীতে" লিখিয়াছেন, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এ দেশে বহু লোক সর্প দংশনে মারা পড়িয়া থাকে। সর্প বিষ নাশের খুব সহজ ও সুলভ ঔষধ অনেক আছে। কিন্তু তাহা কেহ জানেনা, ইহাও সর্প দংশনে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের সকল গাছ গাছড়াই কোন না কোন রোগের ঔষধ। লাল ভেরেণ্ডা সর্প বিষ নাশের আসল ঔষধ সর্প দংশনের পর রোগীকে তিনটি লাল ভেরাণ্ডার কচিপাতা আধতোলা লবণ সহ রগড়াইয়া খাইতে দিবে। রোগী উহা চিবাইয়া রস পান করিবামাত্র উপকার পাইবে, তাহার শরীরের সকল বিষ জল হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে কেহ বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে সংবাদ দাতার নিকট পত্র লিখিতে পারেন।

হরীতকী।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী।

---:•:---

হরিতা বরণে, হরের ভবনে, জনম বলিয়া হরীতকী নাম।
সর্ব্বরোগ নাশে ক্ষমতা প্রকাশে কে আছে এমন সর্ব্বগুণ ধাম॥
জীবন্তী পূতনা, অমৃতা অভয়া, বিজয়া রোহিণী চেতকী সাতটি।
হরীতকী ভেদ, বর্ণে গুণে হয় জানিও কথাটী অতিশয় খাঁটি॥
কণক বরণা, সর্ব্বরোগ হরা, 'জীবন্তী' প্রাণোপযোগিনী হয়,
অতি অল্পত্বক্, মলাদি নিঃসারি' শোধন কারিণী 'পূতনা' নিশ্চয়।
ত্রিদলা 'অমৃতা' অমৃতের মত কোষ্ঠ শুদ্ধি তরে নিয়োগে সকলে।
পঞ্চদল যুতা অভয় দায়িনী অক্ষি রোগ নাশে 'অভয়া' কৌশলে॥
অলাবু আকৃতি বিজয়দায়িনী 'বিজয়' সকল অগদ বিনাশে।
ক্ষত পূরণেতে প্রযুক্তা 'রোহিণী' গোলাকার বলি ভিষকে প্রকাশে॥
ত্রিশিরা 'চেতকী' চৈতন্য দায়িনী চূর্ণে ব্যবহৃতা, সুফল প্রদানে।
নূতন কঠিন গোল স্নিগ্ধ গুরু নিমজ্জিত যাহা সলিলে পতনে॥
পঞ্চরসযুতা জেনো হরিতকী কেবল লবণরস হীনা হয়।
মজ্জায় মধুর অম্ল স্নায়ু মাঝে তিক্ত বৃন্তে ত্বকে কটু রস রয়॥
অস্থিতে কষায়, রুক্ষোষ্ণ মধুর অগ্নি বৃদ্ধি করে হরে দুর্ব্বলতা।
মেহ শ্বাস কাস জ্বর কুষ্ঠ শোথ কৃমি গুল্ম নাশে কোষ্ঠ বিবদ্ধতা॥
বল বীর্য্য আয়ুঃ বর্দ্ধক পরম রসায়ন রূপা বুদ্ধিদা অতুলা।
দৃষ্টি শক্তিপ্রদা বিনাশে গ্রহণী ছর্দ্দি হিক্কা শূল আনাহ কামলা॥
বিসমজ্বরহা, কণ্ডু হৃদিরোগ যকৃৎ প্লীহাশ্মরী আধ্মান হারিণী।
হয়না কুপিতা কভু হরীতকী মায়ের মতন পালনকারিণী॥
মধুরাম্ল রস হেতু বায়ুনাশে কষায়াদি স্বাদ হেতু পিত্ত হরা।
কটুরসহেতু শ্লেষ্মাবিঘাতিনী, তাই হরীতকী নাশে ব্যাধি জরা॥

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, 'গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১০নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | মাঘ ১৩৩০ সাল | ৫ম সংখ্যা।

কফ বা শ্লেষ্মা।

(কবিরাজ শ্রীশরৎ চন্দ্র সেন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

—:-*-:—

কফ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে, আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে, চন্দ্র যেমন স্বকীয় সৌম্যগুণ দ্বারা সূর্য্য সন্তাপ হইতে জগৎকে রক্ষা করে, তেমনি কফও স্বীয় সৌম গুণ দ্বারা পিত্ত সন্তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করিতেছে, শরীরে কফের ক্ষীণতা হইলেই শরীরোষ্মা বা পিত্ততেজ বর্দ্ধিত হইয়া শরীরের ধাত্বাদি শোষণ করিয়া শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, পক্ষান্তরে, কফ প্রবৃদ্ধ হইলে শারীরোষ্মা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অতএব কফ, পিত্তের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট; অথচ এক দেহেই নিরন্তর তুল্য উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে, ইহাকেই বলে ভগবানের অচিন্ত্য কৌশল।

এই কফের মূল কারণ পঞ্চভূতান্তর্গত জল; সুতরাং জলেরও যেগুণ, কফেরও সেই গুণ বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বায়ু ও পিত্তের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বায়ু ও পিত্ত স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত, তথা কফ ও স্থূল সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ পরমাণু রূপ কফ সূক্ষ্ম এবং পরমাণু সমূহরূপ কফ স্থূল। বায়ু পিত্ত কফের এই স্থূল সূক্ষ্মের কারণ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বায়ু পিত্ত ও কফের স্থূলত্ব শরীরের বিশিষ্ট স্থানে ব্যাপক ও সূক্ষ্মত্ব সর্ব্ব দেহ ব্যাপক, অতএব বিশিষ্ট স্থান স্থায়ী বায়ু, পিত্ত কফ বিকৃত হইলে তন্নিষ্ঠ সূক্ষ্মাংশের বিকার জন্মিয়া থাকে, সেই সূক্ষ্মাংশের বিকৃতি নিবন্ধনই শরীরস্থ সমস্ত বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া উঠে। তজ্জন্য সর্ব্বদেহেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, নতুবা শরীরের এক দেশে উৎপন্ন অর্শঃ প্রভৃতি রোগের হারিদ্রত্বগুণ খাননাদি সর্ব্ব দেহ ব্যাপক লক্ষণ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আবার বায়ু পিত্ত কফের সূক্ষ্মত্ব বশতঃ উহারা সূক্ষ্মাংশ দ্বারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন

"একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ।" ইতি।

বায়ু পিত্তের স্থায় কফেরও বিশেষ বিশেষ স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা "উরঃ শিরো-গ্রীবাসর্ব্বাস্থামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি তত্রামাশয়ো বিশেষণ শ্লেষ্মস্থানং।" অর্থাৎ বক্ষঃ, মস্তক গ্রীবা আমাশয় ও মেদ শ্লেষ্মার স্থান, তন্মধ্যে আমাশয় বিশেষ স্থান।

আমাশয়কে কফের বিশেষ স্থান বলার প্রধান কারণ এই, আমাশয়েই অন্নরস হইতে মলভূত শ্লেষ্মার উদ্ভব হয়; এই আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মাই অন্যান্য স্থানস্থিত শ্লেষ্মার শক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। যথাহ সুশ্রুত "তত্রস্থএব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্থ চোদক কর্ম্মণানুগ্রহং করোতি।"

এখন আমাশয় সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাশয় শব্দের শব্দার্থ এই, আমস্য অপক্ব ভক্তদ্রব্যস্য আশয়ঃ অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া উদরের যে অংশে প্রথম পতিত হয়, তাহাকে আমাশয় বলে। এই আমাশয় অগ্ন্যাশয় বা গ্রহণী নাড়ীর উপরে অবস্থিত, এই আমাশয়কেই চলিত কথায় পাকস্থলী বলে। আমাশয় দেখিতেও একটী ভিস্তি আকৃতি থলির স্থায়। এই আমাশয়ের উর্দ্ধে বক্ষদেশে শ্লেষ্মা অবস্থান করে; অর্থৎ আমাশয়ে অন্নরস হইতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হইয়া বক্ষে অবস্থিতিকরে। এই উদরঃস্থ শ্লেষ্মা অবলম্বক শ্লেষ্মা। শিরঃ ও গ্রীবাস্থিত শ্লেষ্মা তর্পক শ্লেষ্মা। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ক্লেদক শ্লেষ্মা, সন্ধিস্থিত শ্লেষ্মা শ্লেষক, ও রসনাস্থিত শ্লেষ্মা বোধক নামে অভিহিত হয়।

সুতরাং বায়ু ও পিত্তের স্থায় শ্লেষ্মা ও পঞ্চনামে কথিত হয়, যথা—অবলম্বক ক্লেদক বোধক, তর্পক ও শ্লেষক। অবশ্য একই শ্লেষ্মা স্থান ও কর্ম্ম ভেদে পঞ্চ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা ইহার স্থান ভেদে বিভিন্ন কার্য্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব।

অবলম্বক শ্লেষ্মা—বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মা যে অবলম্বক শ্লেষ্মা—তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বক্ষঃস্থ অবলম্বক শ্লেষ্মা ত্রিকস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, (ত্রিকশব্দে পৃষ্ঠবংশ ও বাহুদ্বয়ের মিলিত স্থানকে বুঝায়,) এবং রসধাতুদ্বারা হৃৎপিণ্ডের শক্তি বর্দ্ধিত করে। অর্থাৎ আমাদের ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ব হইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, উক্ত রস পুনঃ সার ভাবে পরিণত হইয়া রসধাতু নামে কথিত হয়, এবং পরে ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। এস্থানে হৃদয় শব্দে মাংস-পেশীময় হৃৎপিণ্ডই বুঝায়, যথাহ তন্ত্রে "হৃদয়ং মনসঃস্থান মোজসশ্চিন্তিতস্য চ। মাংসপেশীচয়ো রক্তাপদ্মাকার মধোমুখং মুখং॥ যোগিনো যত্র পশ্যন্তি সম্যগ জ্যোতিঃ সমাহিতাঃ। রসোযঃ স্বচ্ছতাং যাতঃ সতত্রৈবাতিষ্ঠতে॥ ততো ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ কৃৎস্নং দেহং প্রপদ্যতে।" দেখিতে হইবে অবলম্বক শ্লেষ্মা রসধাতুর সাহায্যে কিভাবে হৃদয়ের শক্তি রক্ষা করে। আমরা পিত্তের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সাধক পিত্তের স্থান হৃদয়, সেই হৃদয়াশ্রিত সাধক পিত্তের উষ্মা দ্বারা হৃদয়স্থ রস ধাতু বিশুদ্ধ হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ হৃদপিণ্ড একটী প্রধান রক্তকোষ; সুতরাং হৃৎপিণ্ডে নিয়তই রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে। অতএব হৃৎপিণ্ডা-ভ্যন্তরস্থ রক্তের উষ্ণগুণ দ্বারা ও রসধাতু শোষতি

হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শোষণগুণ বিরোধী সোমাত্মক শ্লেষ্মা রসধাতুর সেই শোষন রক্ষা করিয়া হৃদয়ের শক্তি ও স্নিগ্ধতা অক্ষুন্ন রাখে; সেই জন্যই বোধ হয় বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মার অবলম্বক নামে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ হইয়াছে।

ক্লেদক শ্লেষ্মা আমাশয়ে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করিয়া থাকে; এবং সংঘাত ভুক্ত বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তজ্জন্যই ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

বোধক নামক শ্লেষ্মা জিহ্বামূল ও কণ্ঠে অবস্থান করিয়া রসনার রস বোধক সামর্থ্য দান করে। জিহ্বা বিশুষ্ক থাকিলে তখন তাদৃশ রস জ্ঞান হয়না, কিন্তু যখন রস্যমান দ্রব্যের সহিত সরসজিহ্বার সংস্পর্শ হয় তখনই রসজ্ঞান হইয়া থাকে। সেই জিহ্বার সরসত্বের প্রতিবোধক শ্লেষ্মাই কারণ।

তর্পক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থিতি করিয়া চক্ষুকে তর্পিত ও স্নিগ্ধ রাখিয়া থাকে।

শ্লেষক শ্লেষ্মার স্থান শরীরের সন্ধি মণ্ডল। এই শ্লেষক শ্লেষ্মা সন্ধি দেশে থাকে বলিয়া হস্ত পদাদি অবয়বের সহজে সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; এবং সন্ধিস্থলের নিয়ত সঞ্চালন হেতুক সন্ধিস্থিত অস্থি সমূহের পরস্পর ঘর্ষণ লাগিলেও তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না। এসম্বন্ধে সুশ্রুতে শারীর স্থানে চতুর্থ অধ্যায়ে একটী সুন্দর উদাহরণ যুক্ত শ্লোক আছে যথা,—"স্নেহাভাক্তে যথা হ্বক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে। সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা।" অর্থাৎ যেমন রথাদির চক্র স্নেহাভ্যক্ত হইলে কাষ্ঠাদির ছিদ্রের ভিতরে যথারীতি ঘুরিয়া থাকে, তথা সন্ধিবন্ধন ও শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত থাকায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদেশেই শ্লেষ্মাধরা কলা অবস্থান করে।

অধিকৃত শ্লেষ্মার কার্য্য।

শাস্ত্রে কফের প্রকৃত কার্য্য বলিয়াছে যথা, "স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতা বলং। ক্ষমা ধৃতি রলোভশ্চ কফ কর্ম্মা বিকারজং॥" স্নেহ দেহের স্নিগ্ধভাব, বন্ধ সন্ধিসমূহের সমতারক্ষা, স্থিরত্ব শরীরের দৃঢ়তা, গৌরব, দেহের গুরুত্ব বোধ। বৃষতা, শুক্র বৃদ্ধি, অর্থাৎ কফ বর্দ্ধক দ্রব্যই শুক্রবর্দ্ধক, সুতরাং সেইজন্যই শুক্রবৃদ্ধি কফেরই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলশক্তি, ক্ষমা সহনশীলতা, ধৃতি ধৈর্য্য, অলোভ লোভ শূন্যতা।

কফের গুণ সম্বন্ধে বাগ্‌ভটে "স্নিগ্ধঃ শীতো গুরু মন্দঃ শ্লেষ্মো মৃৎস্নঃ স্থিরঃ কফঃ" ইতি। স্নিগ্ধ স্নেহগুণ যুক্ত সুতরাং শ্লেষ্মা শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদনকরে, অতএব রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ গুণ যুক্ত বায়ু পিত্তের দ্বারা শরীর শুষ্ক হইতে পারেনা। শীত ও শীতল, সুতরাং পিত্ত সন্তাপ হইতে দেহকে রক্ষাকরে, গুরু গুরুত্ব গুণযুক্ত মন্দ চিরকারী, অর্থাৎ শ্লেষ্মার বিকৃত ওঅবিকৃত কার্য্যসমূহ ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়। শ্লক্ষ্ণ অপরুষ, অর্থাৎ কর্কশতা শূন্য। মৃৎস্ন অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা মর্দ্দন করিলে ঘৃতাদির ন্যায় গলিয়া পড়ে। এই মৃৎস্ন গুণ বশতঃ শ্লেষ্মা সন্ধিদেশে থাকিয়া সন্ধিসমূহের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করে। স্থির অচঞ্চল, অর্থাৎ জলাদির ন্যায় বাপনশীল নয়। কফের এই সমস্ত গুণ স্বাভাবিক, অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ গুণ সম্পন্ন আহার বিহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিপরীত গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার

দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই চরকমুনি লিখিয়াছেন "সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং। হ্রাসহেতু বিশেষশ্চ প্রবৃত্তি রুভয়স্যতু।"

বায়ু পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পৃথক্ পৃথক্‌ভবে প্রকাশ করিলাম। এখন উপসংহারে বায়ুপিত্ত কফের সমবায় ভাবে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মহামতি চরক শারীর স্থানে বায়ু পিত্ত কফকে প্রসাদ ও মল দুই ভাগে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা "প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণো যেচান্যেহপি কিঞ্চিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তি ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতায়ো উপপদ্যন্তে, সর্ব্বাং স্তান্ মলান্ সংপ্রচক্ষ্মহে।" ইহার ভাবার্থ এই প্রকুপিত বায়ুপিত্ত কফ এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ শরীরের বিঘ্নকর হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদার্থকে মল বলা যায়, এই জন্যই কুপিত বায়ুপিত্ত কফকে মলিনীকরণামল বলিয়া থাকে। তথা বাগভটেও "সর্ব্বেষা মেব রোগানাং নিদানং কুপিতাঃ মলাঃ।" এই বাক্য দ্বারা কুপিত বায়ুপিত্ত কফ মল সংজ্ঞায় শব্দিত হইয়াছে। আবার "শরীরং দূষয়তীতি দোষ" এই অন্বর্থ বলিয়া কুপিত বায়ু পিত্ত কফের দোষ সংজ্ঞার যোজনা হইয়াছে। অতএব 'মল' আর 'দোষ' বায়ুপিত্ত কফ রূপ একই পদার্থে একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভাবমিশ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দূষ্যন্তেভি র্যত্তস্ততঃ। বাত পিত্ত কফ। এতে ত্রয়োদেষা ইতি স্মৃতাঃ॥ তে ধাতবো হপি বিব্বদ্ভি র্গদিতা দেহ ধারণাৎ। মলাশ্চতে রসাদীনাং মলীনীক রণান্মলাঃ॥

চরকের বাক্যদ্বারা স্থূলতঃ আমরা ইহাই বুঝিলাম যে, প্রসাদ ভূত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ বায়ুপিত্ত কফ দ্বারা আমাদের দেহ রক্ষিত হয় ও সুস্থ থাকে, এবং মলভূত অর্থাৎ কুপিত বায়ুপিত্ত কফ দ্বারা দেহ রুগ্ন বা বিনষ্ট হয়। এই জন্যই বাগ্‌ভট্ট রোগ লক্ষণ করিয়াছেন; "বিকারো দোষ বৈষম্যং" বৈষম্য প্রাপ্ত বায়ু পিত্ত কফকে মল বা দোষ বলে। এই বায়ুপিত্ত কফে প্রসাদত্ব আর মলত্ব যুগপৎ অবস্থান করে না। অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফ যখন মলীভূত হয় তখন উহাদের সর্ব্বাবয়বই মলতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বমনাদির দ্বারা নির্গত পিত্ত বা কফই মলভূত এবং তৎকালে অভ্যন্তরে স্থিত যে পিত্ত কফ তাহা প্রসাদভূতই আছে এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যে হেতুক, বমন বিরেচন দ্বারা নিঃসৃত যে কফ ও পিত্ত তাহারা মলীভূত পিত্ত কফের বৃদ্ধাংশ মাত্র। অন্যথা কেবল বমন বিরচন দ্বারাই পিত্ত কফ রোগ সকল প্রশমিত হইত।

আমাদের প্রস্তাবিত বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে বায়ুই প্রধান, কারণ বায়ু স্বতন্ত্র ক্রিয়াশীল। বায়ুক্রিয়া অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করেনা, কিন্তু পিত্ত ও কফ সম্পূর্ণ বায়ুশক্তির অধীন। বায়ু যদি কুপিত পিত্ত কফকে চালিত করিয়া আমাশয়াদি স্থানে নিয়া না যায়, তবে পিত্ত কফজ কোন ব্যাধিই জন্মিতে পারেনা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমল ধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥" বায়ুক্রিয়ার একটু মজার বিশেষত্ব আছে,

পিত্ত বা কফ যে পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ থাকিবে

তাবৎ তাহাকে তাহার স্বাশয় হইতে বায়ু অপসারিত করিতে পারিবেনা। তাই যদি পারিত তবে শরীরে নিরন্তর সঞ্চারণ শীল বায়ু, পিত্ত কফকে আশায়ন্তরে নয়ন করিয়া সর্ব্বদাই রোগ জন্মাইতে পারিত। পক্ষান্তরে পিত্ত কিম্বা কফ যদি কুপিত হইল, তখন আর তাহাকে তাহার নিবাসে বায়ু কোন মতেই থাকিতে দিবে না। যে ভাবেই হউক অন্যস্থানে তাড়িত করিবেই, বায়ু পিত্ত কফ সুস্থ দেহে স্বীয় আশয়ে যতখানি আকারে প্রয়োজন, তাহা হইতে যদি অল্প বা অধিক পরিমাণে অবস্থান করে তাহা হইলেই তাহাকে বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ বলে, ধাত্বাদির পরিমাণ সংগ্রাহক বাগভটের শ্লোক যথা—

"মজ্জমেদোবসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্ম শকৃন্ত্যসৃক্।
রসোজলঞ্চ দেহদেহস্মিন্নৈকৈকাঞ্জলি বর্দ্ধিতং॥
পৃথক্স্বপ্রস্থতং প্রোক্তমোজোমস্তিষ্ক্য রেতসাং।
দ্বাবঞ্জলীতু স্তন্যস্তচত্বারো রজসঃ স্ত্রিয়াঃ।
সমধাত্বোরিদং মানং বিদ্যাদ্ বৃদ্ধি ক্ষয়াবতঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই—এই পঞ্চভূতাত্মক সুস্থ দেহে, মজ্জধাতু একাঞ্জলি, মেদঃ দুই অঞ্জলি, চর্ব্বি তিন অঞ্জলি, মূত্র চারি অঞ্জলি, পিত্ত, পাঁচ অঞ্জলি, শ্লেষ্মা ছয় অঞ্জলি, পুরীষ সাত অঞ্জলি, রক্ত আট অঞ্জলি, রসধাতু নয় অঞ্জলি, জল দশ অঞ্জলি, পরিমিত বিদ্যমান থাকে, এবং ওজঃ, মস্তিষ্ক্য ও শুক্র প্রত্যেকে অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমাণে অবস্থান করে। স্ত্রীদিগের স্তন্য দুই অঞ্জলি ও রজঃ চারি অঞ্জলি পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু দেহ বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উক্ত পরিমিত ধাত্বাদি যখন শরীরে সমভাবে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে সমধাতু বা সুস্থ বলা যায়, আর যখন বৃদ্ধি বা ক্ষয়রূপ ব্যত্যয় উপস্থিত হয় তখনই বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গর্ভাশয়ে যে শুক্র শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়। সেই শুক্র শোনিতে যদি বায়ুর অংশ বেশী থাকে, তাহা হইলে বাত প্রকৃতি, পিত্তাংশের আধিক্যে পিত্ত প্রকৃতি ও কফের আধিক্যে কফ প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব জন্মিয়া থাকে। এবং বাতাদির মধ্যে দুইয়ের আধিক্যে দ্বন্দজ ও তিনের আধিক্যে ত্রিদোষ প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই বায়ুপিত্ত ও কফ জন্ম হইতে অবসান পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। এবং ইহাদের সমতায় স্বাস্থ্য ও বৈষম্যে রোগোৎপত্তি হয়। তাই চরক বলিয়াছেন—"নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাত-পিত্ত কফাস্ত্রয়ঃ। বিকৃতাঃ প্রকৃতি স্থাবা তান্ বুভুৎসেতপণ্ডিতা॥"

বায়ুপিত্ত কফ অনিয়ামিত আহার বিহার দ্বারা কুপিত হয় অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফের সমান গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার করিলে উহারা সপ্রমাণ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে, এবং বায়ুপিত্ত ও কফের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার সেবিত হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়জনিত রোগ উৎ-পাদন করে, এই অনিয়মিত আহার বিহারকে "নিদান" বলে। শাস্ত্রে নিদানকে স্থূলভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, যথা সাত্ম্যেন্দ্রি-য়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। ইহার ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়া কেবল বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপ বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগের মূল কারণ বায়ু-পিত্ত কফ্ এবং পাশ্চাত্য মতে অন্ততঃ কতক-গুলি রোগের মূল জারম্ বা জীবাণু। এখন এই দুই মতের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার বিশে-ষতঃ আমার অসাধ্য। কারণ আমি বাঙ্গালা কবিরাজ, ইংরাজী জলের গন্ধও পেটে নাই। ডিগ্রীতো আকাশ কুসুম। তবে আমার ডিগ্রী ধারী ডাক্তার দাদাগণ ও ভাইদের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি তাহা অকাট্য বিশ্বাস করিয়া দুই একটী কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

আমাদের তরুণ জ্বরে, আমাদের আগন্তুক জ্বরে, আমাদের মন্থরিকা জ্বরে, আমাদের যক্ষ্মাজ্বরে ডাক্তারগণ রক্তের ভিতরে কোন প্রকার জারম্ দেখিতে পান না। জারম্ দেখিতে পান ম্যালেরিয়া জ্বরে ও কালাজ্বরে। আচ্ছা, যে জ্বরে জারম্ নাই তাহার উৎপাদক কে? আবার ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র মহৌষধ কুইনাইন। অর্থাৎ কিনা, ম্যালেরিয়া জারম্ নষ্ট করিতে কুইনাইনই ব্রহ্মাস্ত্র, এখন তাই যদি হয়, তবে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন জারম্ নাশক হয় না কেন? যদি জরমের প্রকার ভেদ স্বীকার করা যায়, তবে তাহার কারণ কি? অবশ্য সেখানে অন্য কিছু কল্পনা করিতেই হইবে, তাহা হইলে কল্পনার আনন্ত্য দোষ উপস্থিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিত-গণ কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন "নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাৎ তস্মাদ্ বিচক্ষণ। অনুক্তমপি দোষানাং লিঙ্গৈর্ব্যাধি মুপাচরেৎ॥"

মহর্ষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে প্রকৃত রোগোপশম করা হয় না, তাই তাঁহারা রোগের মূল তত্ত্ব বায়ুপিত্ত কফকেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বত্রই বায়ুপিত্ত কফের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃত ক্রিয়া সমূহ ও লক্ষণাবলী তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা প্রত্যেক রোগে বাতাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিয়াও সাক্ষাৎ ফল দেখাইয়াছেন। আমরা আদি পাশ্চাত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আয়ুর্ব্বেদের বিষম-জ্বরের দোষ ভেদে চিকিৎসা করিয়া জারম্ ধ্বংস করিতে পারি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য নব্য জারম্ কল্পনা হইতে আয়ুর্ব্বেদের বাত পিত্ত কফ তত্ত্ব কেন উৎকৃষ্টতর বলিবনা? পাশ্চাত্য মতে এক জ্বরেই জারম্ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা দেখিতে পাই; আবার তাঁহাদের মত ও নিত্য নূতন নূতন ভাবে উদ্ভূত হইতেছে;—সুতরাং তাঁহাদের কল্পণা তাঁহারাই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ নিতসত্য বস্তু অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। আর যাহা মাত্র কল্পনা প্রসূত তাহা লোক চরিত্রের ন্যায় নিত্য চঞ্চল।

আমি বায়ুপিত্ত কফের প্রবন্ধ এইখানেই ক্ষান্ত করিলাম, আপনারা যে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ধৈর্য্যের সহিত আমার নগণ্য প্রবন্ধ শুনিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

আপনাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে, দয়া বা স্নেহ করিয়া আপনারা যদি আমার প্রবন্ধের দোষাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা হইলে, আমার প্রবন্ধে পাঠের উদ্দেশ্য সফল হয়, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃতিত্ব বিস্তারের জন্য এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; প্রবৃত্ত হইয়াছি কেবল শিক্ষা লাভের জন্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ শাস্ত্র আর নাই। যাহার সামান্য ভুলে শতশত অমূল্য জীবন নষ্ট হইতে পারে, এবং যাহার সাহায্যে লক্ষলক্ষ মুমূর্ষু জীবন লাভ করিতেছে, এতাদৃশ শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন সমীপে পুনঃপুনঃ আলোচনা হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

———

দূর্ব্বা ।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

—— :*: ——

(১)

দূর্ব্বে ! নিত্যক্ষেমময়ি ! যতনে তোমায়—
মনে হয়, সর্ব্বশীর্ষে-করিগো স্থাপন ।
ভৈষজ্যমন্দির মাঝে, কেন তুমি হায় !
অবনীতে সহ নিতি, চরণ দলন ॥

(২)

পুরাঙ্গনা সেও জানে আদর তোমার—
মাঙ্গলিকী ক্রিয়া তাই তোমা ভিন্ন নয় ।
সর্ব্বপুষ্পময়ী তুমি শাস্ত্রেও প্রচার,
দেবপদে তব শোভা হয় উপচয় ॥

(৩)

ক্ষুদ্রকায়া তৃণজাতি যদিও সুন্দরি !
কিন্তু কয়জন হেন সুবীর্য্যশালিনী,—
ঋষি তব বীর্য্যাধিক স্বচক্ষে নেহারি'—
আখ্যা দিল তাই বুঝি আয়স-দ্রাবিণী ॥

(৪)

কষায়-মধুর-তিক্ত রসবতী তুমি,—
দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ কর নিবারণ ।
তোমার করুক সেবা কুষ্ঠনাশ-কামী
আশু নাশ কর আর অস্রবিস্রাবণ ॥

(৫)

রক্তপিত্তে তোমা সম আর কেহ নাই,
অঙ্গ চ্ছেদে হও তুমি ভরসা প্রধান,
তোমার স্বরস পানে দেহে বল পাই,
দলিত হ'য়েও কর জীবের কল্যাণ ।

(৬)

তব পূত দলচয়ে,—পরমায়ু তরে,—
হিতৈষী মঙ্গল দিনে আশীষে যেমন –
যতনে সংগ্রহি তোমা, "আয়ুর্ব্বেদ" শিরে
দিনু শুভে ! কর তা'র অক্ষয় জীবন ॥

আমরা হীনবীর্য্য কেন ?

(শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী)

:০:

মনু-ভরদ্বাজ-পরাশরের বংশধর, ধন্বন্তরি-চরক-সুশ্রুতের অনুশাসিত বিধি-নিষেধের নিয়ম প্রতিপালক আমরা হীনবীর্য্য কেন? উষাকালে বৈদিক ছন্দে যাঁহারা সূর্য্যোপস্থান করিতেন, বাল্যে গুরুগৃহে বাস করতঃ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় অবহিত থাকিতেন, দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা সমভাবে গ্রহণ করিতেন, আমরা তাঁহাদেরই বংশধর, আমরা হীনবীর্য্য কেন ?

পুরাকালের মত গুরুগৃহে সে ব্রহ্মচর্য্য নাই সত্য, কিন্তু আধ্যাপকের চতুষ্পাটীতে, নিজেদের গৃহে সে ব্রহ্মচর্য্যের কতকাংশ পালনও কি অসম্ভব? বালক যাহাতে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কি আমাদের পক্ষে কঠিন কার্য্য ? উষ্ণবীর্য্য বিদেশীয় ঔষধ খাওয়াইয়া, আসুরিক "ইঞ্জেকসন" দ্বারা জীবন-শক্তি ক্ষয় করিয়া দিয়া, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের দিকে উদাসীন থাকিয়া আমরা কি সন্তান দিগকে হীনবীর্য্য করিয়া দিইনা ?

উষাকালে উত্থান যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দুইয়েরই পক্ষে উপকারক—তাহা আমরা জানি, তাহা কি কার্য্যে পরিণত করি? সূর্য্যের পানে চাহিয়া প্রত্যহ দুইদণ্ডকাল সন্ধ্যাহ্নিক করার কি ফল—তাহার কি পরীক্ষা করি? প্রাতে পুষ্পচয়নে, প্রভাতী বায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক তৃপ্তি কিরূপ জন্মে, তাহার কি লক্ষ্য করি? আমরা হীনবীর্য্য হইব না ত কাহারা হইবে? শীতপ্রধান দেশে যাহা বিধিবদ্ধ নহে, তাহা আমাদের দেশেও অবশ্য বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না—এ ধারণা কেহ যদি করেন, তিনি ভ্রান্ত।

প্রাতঃসূর্য্য দর্শন যে যাবতীয় রোগ-বীজাণুর নাশক, চক্ষু রোগের পরম রসায়ন,—তাহা সত্য কিনা, শাস্ত্র দেখুন। প্রস্রাবকালে জলশৌচ ব্যবহার না করিলে প্রস্রাব শেষ থাকার কালে মেহাদি রোগের সম্ভাবনা থাকে ইহা অভ্রান্তমত কিনা—আয়ুর্ব্বেদ দেখুন। শঙ্খধ্বনি করা হিতকর, তাহা শুনিয়াছেন। ধুপধুনার গন্ধ দূষিতবাষ্পনাশক, রোগ নিবারক, মশক উপদ্রব দূরকরে কিনা—পরীক্ষা করুন। বিল্বপত্রের গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। অমিশ্র জল বহু রোগনাশক। বিল্বপত্রের চর্ব্বণে দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয়, ঐ রস সেবনে ক্ষুধার জয় করা যায়। তুলসী রস শিশুদের পরম রসায়ন, তুলসী বৃক্ষের বাতাস, তুলসীর গন্ধ—ম্যালেরিয়াদি রোগের বীজাণুনাশক। তুলসী পচনিবারক গুণবিশিষ্ট। সাধে কি বিল্বপত্র মহাদেবের প্রিয়, তুলসী নারায়ণের প্রিয়। এ সকলের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

বাহিরের অশান্ত চঞ্চল তড়িতের সংঘর্ষ হইতে আপনাকে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই রক্ষার পক্ষে মৃগচর্ম্মাসন, কুশাসন প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। পট্টবস্ত্রগরদ তসর প্রভৃতি পরিধান

আবশ্যক। এজন্য পূজা ও জপাদিকালে ঐ আসন ঐ গরদ তসর আদি পরিধানই ব্যবস্থা। এ পরিধানে দেহের শুচিত্ব, চিত্তের প্রসন্নতা, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়।

মৌনী হইয়া খাওয়া, যাহার তাহার হাতে না খাওয়া, গুরু ভোজন না করা—শাস্ত্রের বিধান। ভেজাল দ্রব্য খাওয়া বাজারের লুচী-কচুরী, চপ্-কাটলেট, খাইয়া হাত পা না ধুইয়া যেখানে সেখানে যখন তখন যা তা খাইয়া লোকে নানা রোগে ভুগিতেছে—এ সকল কাহাদের দোষ? এই সকল হীনবীর্য্য করিবার হেতু, নানা রোগের কারণ—ইহার প্রতি অবহিত হওয়া সকলেরই প্রয়োজন, "আর্দ্র পাদস্তু ভুঞ্জীত" আর্দ্র পাদ হইয়া ভোজন করিবে, "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" ভোজনের পর রাজার মত পায়চারী করিবে। রাজার মত আরামে বিশ্রাম করিবে,—ইহা মনুর আদেশ।

পশ্চিম ও উত্তরে শয়ন নিষিদ্ধ, এ শয়নে মস্তিষ্ক রসরক্তাদিপূর্ণ, প্রদাহী এবং পীড়িতাবস্থ হইয়া থাকে—একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। পাপীর স্পৃষ্ট অন্নে, রাখিবার আসনে পাপ অন্নের ছোঁয়াচ বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণিত করিতেছেন। একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লঘু ভোজন বা উপবাস প্রশস্ত। ঐ সময়ে দেহের রস বৃদ্ধি হয়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। জ্বর বল, বাতাদি রোগ বল, ঐ সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ইহা সকলেই দেখিয়া থাকেন। উপবাসে অক্ষম ব্যক্তি লঘু ভোজন করিবে—ইহাই ব্যবস্থা।

হীনবীর্য্য হইবার শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অনাদরই প্রধান হেতু। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধই আয়ুর্ব্বেদের বিধি নিষেধ। আয়ুর্ব্বেদের বিধি-নিষেধই শাস্ত্রের ভিতর দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হীনবীর্য্য হইবার মূলে ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযমের অভাব। বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য এক প্রকার। আর বিবাহের পরেও ব্রহ্মচর্য্য আর একপ্রকার। তিথি নক্ষত্র অনুসারে কর্ত্তব্যবোধে ঋতুরক্ষা এক জিনিস, আর অনিয়মিত পাশববৃত্তি চরিতার্থ করা অন্য জিনিস। সংসারী সস্ত্রীক ব্যক্তির পক্ষেও আংশিক ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব। ব্রহ্মচর্য্যের বা আংশিক ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই যাবতীয় ব্যাধির কারণ। শরীর, মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয় সুস্থ ও সবল থাকিলে রোগের জীবাণু আক্রমণ করিতে পারে না। আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই সংযম আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্য যিনি সম্যক বা আংশিক পালন করেন, আহারে-বিহারে যিনি সংযম রক্ষা করেন, তিনি অরোগী, তিনিই সুখী। ধাতুর বৈষম্যেই ঔষধ সেবন। এ ঔষধ সেবনেও তাঁহার তাদৃশ আবশ্যক করিবেনা। মানব যত্ন করুক, তথাপি যদি রোগের আক্রমন হয় তখনই শাস্ত্রীয় ঔষধ সেবন আবশ্যক।

রোগ নির্ণয়।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ]

একটা অদ্ভুত রোগের কথাই—
বল্‌বো আমি আজ,
শুনে যিনি হাস্‌বেন তিনি—
নহেন কবিরাজ।
হাস্‌লে হাসতে পারেন বিজ্ঞ—
এম্, বি; এল, এম, এস্।
বাঁধা তাদের ডায়গোনসিস্—
জানা আছে বেশ।
আমারও যে নেহাৎ হাসি—
আসতো তাহা নয়,
পরের রোগটা হতো যদি—
পশ্চাতে বোধ হয়॥
ভোজ্য ছিল চব্য চোষ্য—
তবু শরীর খানি,
দিনে দিনে মলিন হ'ত
কি দুঃখে না জানি।
হজম শক্তি ছিল, হ'ত
কোষ্ঠ পরিষ্কার।
রাত্রিটা তো কাটতো ঘুমে—
(কিছু) নাহি ব্যভিচার।
জরাসুরের রণাঙ্গনে
হয়নি কভু যেতে।
ভাগ্‌তে কভু হ'ত নাকো
ডিউটী দিতে যেতে।
তবুও কেন বপু আমার—
শ্রীহীন এমন তর।

অবশেষে শঙ্কা, মনের—
জাগল একটা বড়।
চিকিৎসকের উপদেশটা
নিতে অবশেষে।
এলাম সত্বর কলিকাতায়—
(যদিও) বৈদ্য ছিল দেশে।
ডাক্তার মিত্র, বসু, বিশ্বাস—
একে, একে, সবে,
বল্লেন,—"তোমার ব্লড্, ইউরিন্—
এক্‌জামিন্ যে হবে,
তা'রপর মোরা দেহ তোমার—
মোটা যাতে হয়।
ব্যবস্থাটা সেই রকমই
কর্ব্বো হে নিশ্চয়।
দশটী টাকা আগে ভাগে—
নি'ল হাস্য মুখে,
তাহার সহিত দেহ রক্ত—
দিতে হল দুখে।
ব্যবস্থাটা কল্লেন ভালই—
ত্রিশটী টাকা গেল,
মাস দুই তিন নিউ মেডিসিন্—
উদরস্থ হ'ল।
কিন্তু আমার দেহখানি—
জানিনা বা কেন,
ঔষধ পথ্য রীতিমতই
তবু মলিন যেন।

অবশেষে ভাবলাম মনে
কর্ব্বো ব্যবহার,
আয়ুর্ব্বেদের ছাগলাদ্য—
কিম্বা শক্তিসার।
নন্দীগ্রামের কবিরত্ন—
বয়সে প্রাচীন।
ব্যবস্থাটা তাঁরই দ্বারা—
হ'বে সমীচীন।

* * *

কবিরত্ন শান্তমনে প্রশ্ন—
ক'রলেন যত,
মনে কি আর আছে সে সব
কত দিন যে গত।
বল্লেন তিনি—"দেহ তোমার—
দেখ্‌তে হ'বে মোরে।
স্নান আহারটা কর এখন—
দে'খব তাহার পরে।
কোন আহার্য্যে প্রীতি তোমার—
বল লজ্জা ছাড়ি,
সাধ্যমত হবে প্রস্তুত,—
(এটা) তোমাদেরই বাড়ী"।
কথাগুলো বল্লেন মোরে—
কতই ভালবাসি—
পিতৃসম, বল্লাম, বিশেষ—
মাংসে অভিলাষী।

* * *

এমন রন্ধন খাইনি কখন—
মনের সুখে হায়,
আকণ্ঠত খেলাম মাংস—
আর যে নাহি যায়।

কবিরত্ন বল্লেন এসে—
মৃদুহাস্যে ভাষি।
কুক্কুট মাংস খেলেছ খুব
দেখ্‌ছি রাশি রাশি।
পল্লী গ্রামের ব্রাহ্মণ আমি—
বলবো কিবা আর।
পেটের মধ্যে নাড়ী গুলো
হ'ল একাকার।
অন্নাশনের অন্নও বুঝি—
বাহির হ'তে চায়,
জাতটা নিলে এমন বস্তি—
কোথা দেখা যায়।
কবিরত্ন ধীর প্রশান্ত—
বিজয়ীরই মত,
বল্লেন 'তোমার দূর হল হে—
ব্যাধি ছিল যত।
বস ধ্বংসী ক্রিমি গুলো—
দেখ হে একবার,
মনের দুঃখে যাদের তুমি—
ক'রলে উদ্‌গার।
এদের তরেই শরীর তোমার—
ছিল এমন ধারা,
সকল চিন্তার হস্ত হ'তে—
পেলে এখন ছাড়া॥"

* * *

একটা কথা বলে বিদায়—
রোগ চিনিতে যত্ন।
এমনি ভাবে করুন সবে
দেশের ভিষক্ রত্ন॥

বেঙ্গল শটী ফুড।

আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় বেঙ্গল শটী ফুডের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে হয়ত ভাবেন ইহা কি জিনিস। শটী আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রোল্লিখিত এক প্রকার গাছের মূল। আয়ুর্ব্বেদীয় ভাবপ্রকাশ পুস্তকে কর্পূরাদি বর্গে শটীর অশেষ গুণ বর্ণনা আছে। শটী, আদা, আমআদা ও হলুদের ন্যায় মাটীর নিম্নে জন্মে এবং ইহা হইতে পানফলের পালোর ন্যায় পালো প্রস্তুত হয়। বহুকাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ধনী ও গৃহস্থ ব্যক্তিগণ এই শটীর পালো শিশুর খাদ্য, রোগীর পথ্য এবং বৃদ্ধের লঘু ও পুষ্টিকর আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদে এরূপ উল্লেখ আছে যে, ইহা ক্রিমি অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক। আমরা রোগী ও শিশুদিগকে বিদেশে প্রস্তুত বার্লি, এরারুট প্রভৃতি খাওয়াইয়া থাকি, কিন্তু শটী এই সকল দ্রব্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বিলাতী বার্লির কৌটা খুলিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে পোকা জন্মিয়াছে। এরূপ বার্লি ও এরারুট খাওয়াইলে হিতে বিপরীত হয়, কিন্তু শটী আমাদের দেশে বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত এবং তাহা সর্ব্বদাই টাটকা পাওয়া যায়। কলিকাতা ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটীর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন পাল মহাশয় প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল শটীফুড নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশুদ্ধভাবে শটী প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহা প্রথম প্রচারিত করেন। অধুনা বিচক্ষণ ডাক্তারগণ ও এই শটীফুড্ পরীক্ষা করিয়া ইহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, গত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে All India Food Products Exhibitionএও বেঙ্গল শটী ফুড্ পরীক্ষিত হইয়া বার্লি এরারুট অপেক্ষাও ইহাতে জীবন ধারণোপযোগী অধিকতর পুষ্টিকর দ্রব্য আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই শটীফুড্ দুগ্ধ কিংবা জলের সহিত দশ মিনিট কাল আগুনে পাক করিয়া এবং ইহাতে সামান্য পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে তদ্বারা অনায়াসে জীবন ধারণ করা যায়—The Food itself contains all the most essential constiments of human food and will help the sustanance of life during periods when no other food can be animilated" অর্থাৎ পেটে যখন অন্য কোন জিনিস হজম হয় না, তখন ইহা অনায়াসেই হজম করা যাইতে পারে, এবং মানবের জীবন ধারণোপযোগী যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন, ইহাতে তৎসমুদয় বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেশে যখন এরূপ বিশুদ্ধ ও উপাদেয় শিশু ও রোগীর খাদ্য রহিয়াছে, তখন আমরা কেন বিদেশীয় পেটেণ্ট ফুডের উপর নির্ভর করি? শটী আমাদের দেশের সম্পত্তি। ইহা দেশবাসীদিগকে বুঝিবার জন্য আমরা পরামর্শ দিতেছি।

নিদান পরিশিষ্টম্

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:•:—

তৃষ্ণা।

সততং যঃ পিবেদ্বারি ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
পুনঃ কাঙ্ক্ষতি তোয়ঞ্চ তং তৃষ্ণার্দ্দিতমাদিশেৎ॥
সংক্ষোভশোকাদর্তিমদ্যপানা-
রুক্ষাম্লশুষ্কোষ্ণকটূপযোগাৎ।
ধাতুক্ষয়াল্লঙ্ঘনসূর্য্যতাপাৎ
পিত্তঞ্চ বাতশ্চ ভৃশং প্রবৃদ্ধৌ।
জিহ্বাং গলং ক্লোম চ সৌম্যধাতুং
সংশোষ্য নৃণাং কুরুতঃ পিপাসাং॥
তাল্বোষ্ঠকণ্ঠাস্যবিশোষদাহঃ
সন্তাপমোহভ্রমবিপ্রলাপাঃ।
পূর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি তাসা-
মুৎপত্তিকালেষু বিশেষতো হি॥
নিদ্রানাশো বাতজায়াং মুখশোষঃ শিরোভ্রমঃ।
পীতাক্ষিমূত্রবর্চ্চস্বং পিত্তজায়াং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ভক্তদ্বেষঃ প্রসেকশ্চ শিরসো লোঠনং তথা।
কফজায়াং পিপাসাং লিঙ্গমেতদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥
ক্ষয়জায়াস্তু হৃৎপীড়া শূন্যতা কম্প এবচ॥
ক্ষীণং বিচিত্তং বধিরং তৃষার্ত্তং
বিবর্জ্জয়েন্নির্গতজিহ্বমাশু॥

মদরোগঃ।

দুর্ব্বলং চেতসঃ স্থানং যদা বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
মনো বিক্ষোভয়েজ্জন্তোঃ সংজ্ঞাং সংমোহয়েত্তদা॥
পিত্তমেবং কফশ্চৈবং মনো বিক্ষোভয়েন্নৃণাং।
সংজ্ঞাং নয়ত্যাকুলতাং বিশেষশ্চাত্র কথ্যতে॥

শক্তানল্পদ্রুতাভাষং বলস্খলিতচেষ্টিতং।
বিদ্যাদ্বাতমদাবিষ্টং রুক্ষশ্যাবারুণাকৃতিং॥
সক্রোধং পরুষাভাষং সংপ্রহারকলিপ্রিয়ং।
বিদ্যাৎ পিত্তমদাবিষ্টং রক্তপীতাসিতাকৃতিং॥
স্বল্পাসম্বদ্ধবচনং নিদ্রালস্যসমন্বিতং।
বিদ্যাৎ কফমদাবিষ্টং পাণ্ডুং প্রধ্যানতৎপরং॥
সর্ব্বাণ্যেতানি লিঙ্গানি সন্নিপাতকৃতে মদে॥

মদাত্যয়ঃ।

বিষস্য যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ সন্নিপাতপ্রকোপজাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ।
হন্ত্যাশু হি বিষং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্রোগায় কল্পতে।
যথা বিষং তথৈবান্ত্যো জ্ঞেয়ো মদ্যকৃতো মদঃ।
তস্মাত্রিদোষজং লিঙ্গং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
দৃশ্যতে রূপবৈষম্যাৎ পৃথক্‌ত্বঞ্চাপি লক্ষ্যতে॥
শরীরদুঃখং বলবৎ প্রমোহো হৃদয়ব্যথা।
অরুচিঃ প্রততং তৃষ্ণা জ্বরঃ শীতোষ্ণলক্ষণঃ।
শিরঃপার্শ্বাস্থিসন্ধীনাং বেদনা বিক্ষতে তথা।
জায়তেঽতিবলা জৃম্ভা স্ফুরণং বেপনং ভ্রমঃ।
উরোবিবন্ধঃ কাসশ্চ শ্বাসো হিক্কা প্রজাগরঃ।
প্রবর্ধণং বিহস্বৈশ্চ ভ্রান্তচেতাঃ স মন্যতে।
ব্যাকুলানামশস্তানাং স্বপ্নানাং দর্শনানি চ।
মদাত্যয়স্য রূপাণি সর্ব্বাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ॥
স্ত্রীশোকভয়ভারাধ্বকর্ম্মভির্যোঽতিকর্ষিতঃ।
রুক্ষাল্পপ্রমিতাশী চ যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া।
রুক্ষং পরিণতং মদ্যং নিশি নিদ্রাং নিহত্য চ।
করোতি তস্য তচ্ছীঘ্রং বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ং॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং মদ্যমম্লঞ্চ যোঽতিমাত্রং নিষেবতে।
অম্লোষ্ণতীক্ষ্ণভোজী চ ক্রোধনোঽগ্ন্যাতপপ্রিয়ঃ।
তস্যোপজায়তে পিত্তাদ্বিশেষেণ মদাত্যয়ঃ॥
তরুণং মধুরপ্রায়ং গৌড়ং পৈষ্টিকমেব বা।
মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বাশী যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া।

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ ।
মদাত্যয়ং কফপ্রায়ং প্রাপ্নোতি স পরং পুমান্ ॥
বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতিমাত্রং নিষেবতে ।
ধ্বংসকো বিক্ষয়শ্চৈব রোগস্তস্যোপজায়তে ॥
শ্লেষ্মপ্রসেকঃ কণ্ঠাস্যশোষঃ শব্দাসহিষ্ণুতা ।
মোহস্তন্দ্রাতিযোগশ্চ জ্ঞেয়ং ধ্বংসকলক্ষণং ॥
হৃৎকণ্ঠরোগঃ সংমোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গরুজো জ্বরঃ ।
তৃষ্ণা কাসঃ শিরঃশূলমেতদ্বিক্ষয়লক্ষণং ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য দুশ্চিকিৎস্যতমাবুভৌ ॥
নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
শারীরমানসৈর্ধীমান্ বিকারৈর্ন স যুজ্যতে ।

উন্মাদঃ ।

মোহোদ্বেগৌ স্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রাণামপকর্ষণং ।
অত্যুৎসাহোঽরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনং ।
বায়ুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চ ক্রমশস্তথা ।
যস্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোঽধিগচ্ছতি ॥

অপস্মারঃ ।

স্মৃতিভূতার্থবিজ্ঞানমপস্তৎপরিবর্জ্জনে ।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়স্ততোঽয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ ॥
মিথ্যাদিযোগেন্দ্রিয়ার্থকর্ম্মণামভিসেবনাৎ ।
বিরুদ্ধমলিনাহারবিহারকুপিতৈর্ম্মলৈঃ ।
বেগনিগ্রহশীলানামহিতাশুচিভোজিনাং ।
রজস্তমোঽভিভূতানাং গচ্ছতাঞ্চ রজস্বলাং ।
তথা কামভয়োদ্বেগক্রোধশোকাদিভির্ভৃশং ।
চেতস্যভিহতে পুংসামপস্মারোঽভিজায়তে ।
সংজ্ঞাবহেষু স্রোতঃসু দোষব্যাপ্তেষু মানবঃ ।
রজস্তমঃপরীতেষু মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা ।
বিক্ষিপন্ হস্তপাদৌ চ বিজিহ্বভ্রূ * বিলোচনঃ † ।
দন্তান্ খাদন্ বমন্ ফেনং বিবৃতাক্ষঃ পতেৎ ক্ষিতৌ

---

* বিকৃতজিহ্বভ্রূঃ ।
† বিকৃতলোচনঃ ।

অল্পকালান্তরঞ্চাপি পুনঃ সংজ্ঞাং লভেত সঃ।
মোহপস্মারো মহাঘোরো মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং

বাতব্যাধিঃ।

প্রাণোদানসমানাখ্যব্যানাপানৈশ্চ পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষব্যাহতশ্চরন্।
স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরোঃকণ্ঠজিহ্বাস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবনক্ষবথুদ্গারশ্বাসাহারাদি কর্ম্ম চ॥
উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ।
বাক্‌প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নোর্জ্জো বলবর্ণাদি কর্ম্ম চ॥
স্বেদদোষাম্বুবাহীনি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরাগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোহগ্নিবলপ্রদঃ॥
দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বন্তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাং।
গতিপ্রসরণাক্ষেপনিমেষাদিক্রিয়ঃ সদা॥
বৃষণৌ বস্তি মেঢ্রঞ্চ নাভ্যূরুবংক্ষণৌ গুদং।
অপানস্থানমত্রস্থঃ শুক্রমূত্রশকৃন্তি সঃ।
সৃজত্যার্ত্তবগর্ভৌ চ যুক্তাঃ স্থানস্থিতাশ্চ তে।
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বতে দেহো ধার্য্যতে তৈরনাময়ঃ।
বিমার্গস্থা হ্যযুক্তা বা রোগৈঃ স্বস্থানকর্ম্মজৈঃ।
শরীরং পীড়য়ন্ত্যেতে প্রাণানাশু হরন্তি বা।
সংখ্যামপ্যতিবৃত্তানাং তজ্জানাং হি প্রধানতঃ।
অশীতির্নখভেদাদ্যা রোগাঃ সূত্রে নিদর্শিতাঃ॥
অথ তেষাঞ্চ পঞ্চানামন্যোন্যাবরণং শৃণু।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শূন্যত্বং জ্ঞাত্বা স্মৃতিবলক্ষয়ং।
ব্যানে প্রাণাবৃতে লিঙ্গং তর্কয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
স্বেদোহত্যর্থং লোমহর্ষস্ত্বগ্দোষঃ সুপ্তগাত্রতা।
প্রাণে ব্যানাবৃতে লিঙ্গং মুনিভিঃ পরীকীর্ত্তিতং॥
প্রাণাবৃতে সমানে স্যাজ্জড়গদ্গদমূকতা॥
সমানেনাবৃতেঽপানে গ্রহণী পার্শ্ববেদনা।
শূলমামাশয়ে চাপি জায়তে ভৃশদুঃসহং॥
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ো নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চাপ্যুদানে প্রাণসংবৃতে॥

কর্ম্মজো বলবর্ণানাং নাশো মৃত্যুরথাপিচ ।
উদানেনাবৃতে প্রাণে তং সিঞ্চেৎ শীতবারিণা ॥
ঊর্দ্ধগেনাবৃতেঽপানে চ্ছর্দ্দিশ্বাসাদয়ো গদাঃ ॥
মোহারাগ্নিরতীসারী উর্দ্ধগে প্রাণসংবৃতে ॥
ছর্দ্দ্যাধ্মানমুদাবর্ত্তো গুল্মার্ত্তিঃ পরিকর্ত্তিকা ।
লিঙ্গং ব্যানাবৃতেঽপানে জানীয়াৎ কথিতং যথা ॥
অপানেনবৃতে ব্যানে প্রবৃত্তিরধিকং ভবেৎ ॥
মূর্চ্ছা তন্দ্রা প্রলাপাঙ্গসাদোঽগ্ন্যোজো বলক্ষয়ঃ ।
সমানেনাবৃতে ব্যানে লক্ষণং সমুদাহৃতং ॥
স্তব্ধতাল্পাগ্নিতা স্বেদশ্চেষ্টাহানির্নিমীলনং ।
উদানেনাবৃতে ব্যানে তত্র পথ্যং মিতং লঘু ॥
পঞ্চান্যোন্যাবৃতানেবং বাতান্ বুধ্যেত লক্ষণৈঃ ॥

ভয়াভিঘাতাজ্জন্তোর্হি হনুসন্ধির্বিমুচ্যতে ।
নিরস্তজিহ্বঃ কৃচ্ছ্রেণ ভাষিতং তত্র গচ্ছতি ।
সম্যক্ তমনিলব্যাধিং হনুমোক্ষং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

(ক্রমশঃ)

বাতরক্তং ।

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতং ।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরমন্তরাশ্রয়ং ॥
কণ্ডূদাহরুজায়ামতোদস্ফূরণকুঞ্চনৈঃ ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তা ত্বকবাহ্যেতাম্রা তথোচ্যতে ॥
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽন্তর্ভৃশার্ত্তিমান্ ।
শ্যাবস্তাম্রোঽথবা দাহতোদস্ফুরণপাকবান্ ।
ভিন্দন্নিবচরত্যাস্থে বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্ ।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরে সর্ব্বতশ্চরন্ ॥
সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈশ্চ বিজ্ঞেয়ং বাতাসৃগুভয়াশ্রয়ং ॥

ঊরুস্তম্ভঃ ।

স্নিগ্ধোষ্ণগুরুশীতানি জীর্ণাজীর্ণৈঃ সমশ্নতঃ ।
দ্রবশুষ্কদধিক্ষীরগ্রাম্যানূপোদকামিষৈঃ ।
লঙ্ঘনাধ্যশনায়াসভয়বেগবিধারণৈঃ ।
স্নেহাচ্চামং চিতং কোষ্ঠে বাতাদীন্ মেদসা সহ ।
রুদ্ধা স্বগৌরবাদূরূ যাত্যধোগৈঃ শিরাদিভিঃ ।

পূরয়েৎ সাস্থিজঙ্ঘোরু দোষো মেদোবলোৎকটঃ।
অবিশেষং পরিস্পন্দং জনয়ত্যল্পবিভ্রমং।
মহাসরসি গম্ভীরে পূর্ণেহম্বু স্তিমিতং যথা।
তিষ্ঠতি স্থিরমক্ষোভং তদ্বদূরুগতঃ কফঃ।
গৌরবায়াসসংকোচদাহরুকস্থুপ্তিকম্পনৈঃ।
সদাহভেদস্ফুরণৈর্যুক্তো দেহং নিহন্ত্যসৌ।
গুরুঃ শ্লেষ্মা সমেদস্কো বাতপিত্তেহভিভূয়তু।
স্তম্ভয়েৎ স্থৈর্য্যশৈত্যাভ্যামূরুস্তম্ভস্ততো মতঃ॥

শূলরোগঃ।

শঙ্কুস্ফোটনবত্তস্য যস্মাৎতীব্রাশ্চ বেদনাঃ।
শূলাসক্তস্য ভবতি তস্মাচ্ছূলমিহোচ্যতে॥
বাতাত্মকং বস্তিগতং বদন্তি
পিত্তাত্মকঞ্চাপি বদন্তি নাভ্যাং।
হৃৎপার্শ্বকুক্ষৌ কফসন্নিবিষ্টং
সর্ব্বেষু দেশেষু চ সন্নিপাতাৎ॥
বেদনা চ তৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবারুচী।
কাসঃ শ্বাসশ্চ হিক্কাচ শূলস্যোপদ্রবা দশ॥

পরিণামশূলঃ।

বলাসঃ প্রচ্যুতঃ স্থানাৎ পিত্তেন সহ মূর্চ্ছিতঃ।
বায়ুমাদায় কুরুতে শূলং জীর্য্যতি ভোজনে *।
কুক্ষৌ জঠরপার্শ্বেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু বা পুনঃ।
ভুক্তমাত্রেহথবা বান্তে জীর্ণান্নে বা প্রশাম্যতি।
ষষ্টিকব্রীহিশালীনামোদনেন প্রবর্দ্ধতে।
পরিণামজশূলোয়ং চবিজ্ঞেয়ো মহোদগদঃ।
তমাহুর্দুষ্করং প্রাজ্ঞাঃ স্রোতসাং রসবাহিনাং।
কেচিদন্নদ্রবং প্রাহুরন্যে তং পক্তিদোষতঃ।
পক্তিশূলং বদন্ত্যোকে কেচিদন্নবিদাহজং॥

* ভুক্তদ্রব্যে।

উদাবর্ত্তঃ ।

আধ্মানশূলৌ হৃদয়োপরোধং
শিরোরুজং শ্বাসমতীব হিক্কাং ।
কাসপ্রতিশ্যায়গলগ্রহাংশ্চ
বলাসপিত্তপ্রসরঞ্চ ঘোরং ।
কুর্য্যাদপানোঽভিহতঃ স্বমার্গে
হন্যাৎ পুরীষং মুখতঃ ক্ষিপেদ্বা ॥

অশ্রুবেগে হতে বিস্তাং প্রতিশ্যারুচিহৃদ্‌গ্রহান্

গুল্মঃ ।

কুপিতানিলমূলত্বাদ্‌গূঢ়মূলোদয়াদপি ।
গুল্মবদ্বা বিশালত্বাৎ গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥
স যস্মাদাত্মনি চয়ং গচ্ছত্যপ্স্বিব বুদ্বুদঃ ।
অন্তঃসরতি যস্মাচ্চ ন পাকমুপযাত্যতঃ ॥
বিট্‌শ্লেষ্মপিত্তাতিপরিস্রবাদ্বা
তৈরেব বৃদ্ধৈরতিপীড়নাদ্বা ।
ব্যায়ামাদতিসন্তাপাচ্ছীতোষ্ণক্রমসেবনাৎ ।
স্বেদবাহীনি দুষ্যন্তি ক্রোধশোকভয়ৈস্তথা ।
ততঃ স্বেদঃ প্রবর্ত্তেত দৌর্গন্ধ্যং ঘর্ম্মচর্চ্চিকা ।
রাজিকাকৃতিরুক্ষোত্থা যথা ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা ।
সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনং ।
ক্রিয়াতিযোগঃ* শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ ।
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং † স্নানং নস্যং প্রাকৃতিকো জ্বরঃ ।
বিকারানুশয়ঃ § ক্রোধাঃ কুর্ব্বন্ত্যতিকৃশং নরং ।
প্লীহকাসক্ষয়শ্বাসগুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ ।
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীগতাঃ ।
অত্যন্তগর্হিতাবেতৌ সদাস্থূলকৃশৌ নরৌ ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু কৃশঃ স্থূলাত্তু পূজিতঃ ।

---

* বমনবিরেচনাদীনাং পঞ্চকর্ম্মণামতিশয়েন সেবনং ।

† উৎপত্তনং

§ রোগাণামনুবন্ধঃ ।

উদররোগঃ।

* অত্যুষ্ণলবণক্ষারবিদাহ্যম্লগরা * শনাৎ।
মিথ্যাসংসর্জ্জনা † রুক্ষবিরুদ্ধাশুচিভোজনাৎ।
প্লীহার্শোগ্রহণীদোষকর্ষণাৎ কর্ম্মবিভ্রমাৎ ‡।
ক্লিষ্টানামপ্রতীকারাৎ রৌক্ষ্যাদ্বেগবিধারণাৎ।
স্রোতসাং দূষণাদামাৎ সংক্ষোভাদতিপূরণাৎ।
অর্শোবালশকৃদ্রোধাদন্ত্রস্ফুটনভেদনাৎ।
অতিসঞ্চিতদোষাণাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং।
উদরাণ্যুপজায়ন্তে মন্দাগ্নীনাং বিশেষতঃ॥
ক্ষুন্নাশঃ স্বাদ্বতিস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নং পচ্যতে চিরাৎ।
ভুক্তং বিদহ্যতে সর্ব্বং জীর্ণাজীর্ণং ন বেত্তি চ।
সহতে নাতি সৌহিত্যমীষচ্ছোফশ্চ পাদয়োঃ।
শশ্বদ্বলক্ষয়োঽল্পেঽপি ব্যায়ামে শ্বাসমৃচ্ছতি।
বৃদ্ধিঃ পুরীষনিচয়ে রুক্ষোদাবর্ত্তহেতুকী।
বস্তিসন্ধৌ রুগাধ্মানং বর্দ্ধতে পাট্যতেঽপি চ।
আতন্যতে চ জঠরং লঘ্বল্পৈর্ভোজনৈরপি।
রাজীজন্মবলীনাশ ইতি লিঙ্গং ভবিষ্যতাং॥
রুক্ষাল্পভোজনায়াসবেগোদাবর্ত্তকর্ষণৈঃ।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ হৃদ্বস্তিগুদমার্গগঃ।
হত্বাগ্নিং কফমুদ্ধূয় তেন উর্দ্ধগতিস্ততঃ।
আচিনোত্যুদরং জন্তোস্ত্বাংসান্তরমাশ্রিতঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণাগ্ন্যাতপসেবনৈঃ।
বিদাহ্যজীর্ণাধ্যশনৈশ্চাশু পিত্তং সমাচিতং।
প্রাপ্যানিলকফৌ রুদ্ধা বেগেন মার্গমাস্থিতং।
নিহন্ত্যামাশয়ে বহ্নিং জনয়ত্যুদরং ততঃ॥
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নস্বাদ্বতিস্নিগ্ধশীতলৈঃ।
দধিদুগ্ধৌদকানূপমাংসৈশ্চাপ্যতিসেবিতৈঃ।

---

* গরঃ সংযোগবিষং।

† বমনাদীনাং হীনযোগাৎ।

‡ বমনবিরেচনাদিপঞ্চকর্ম্মণাং বৈদ্যাতুরদোষেণ ব্যভিচারাৎ।

ক্রুদ্ধেন শ্লেষ্মণা স্রোতঃস্বাবৃতেষ্বাবৃতোঽনিলঃ।
তমেব পাতয়ন্ কুর্য্যাদুদরং বহিরন্ত্রগং॥

বেগৈরুদীর্ণৈর্বিহতৈরধো বা
বাহ্যাভিঘাতৈরতিপীড়নাদ্বা।
রুক্ষান্নপানৈরতিসেবিতৈর্বা
শোকেন মিথ্যাপ্রতিকর্ম্মণা বা।
বিচেষ্টিতৈর্বা বিষমাতিমাত্রৈঃ
কোষ্ঠে প্রকোপং সমুপৈতিবায়ুঃ।
কফঞ্চ পিত্তঞ্চ স দুষ্টবায়ু
রুদ্ধ্য মার্গান্ বিনিরুধ্য তাভ্যাং।
হৃন্নাভিপার্শ্বোদরবস্তিশূলং
করোত্যধো যাতি ন বদ্ধমার্গঃ।
পক্বাশয়ে পিত্তকফাশয়ে বা
স্থিতঃ স্বতন্ত্রঃ পরসংশ্রয়ো বা।
স্পর্শোপলভ্যঃ পরিপীড়িতত্বাৎ
গুল্মো যতো দোষমুপৈতি নাম॥

স্ত্রীণামার্ত্তবজো গুল্মো ন পুংসামুপজায়তে।
অন্যস্ত্বসৃক্‌ভবো গুল্মঃ স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ জায়তে॥

হৃদ্রোগঃ।

বিরেকবমিবস্তীনামতিযোগৈর্ভয়েন চ।
কর্ষণাদভিচারাচ্চ জায়তে হৃদয়ামরঃ॥

বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাজ্বরকাসহিক্কা
শ্বাসাস্যবৈরস্যতৃষাপ্রমোহাঃ।
ছর্দ্দিঃ কফোৎক্লেশরুজারুচিশ্চ।
হৃদ্রোগজাঃ স্যুর্বিবিধাস্তথান্যে॥

অশ্মরী।

আমুখাৎ সলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে নবঃ।
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে।
এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্তং কফোঽপি বা।

মূত্রযুক্ত উপমেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেশ্মরীং
অপ্সু স্বচ্ছাস্বপি যথা নিষিক্তাসু নবে ঘটে।
কালান্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা।
সংহন্ত্যাপো যথা দিব্যা মারুতোঽগ্নিশ্চ বৈদ্যুতঃ।
তদ্বদ্বলাসং বস্তিস্থমূষ্মা সংহন্তি সানিলঃ॥
যথাস্বং বেদনা বর্ণং দুষ্টং সাস্রমথাবিলং।
পূর্ব্বরূপেঽশ্মনঃ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং সৃজতি মানবঃ॥
কদম্বপুষ্পাকৃতিরশ্মতুল্যা
শ্লক্ষ্ণা ত্রিপুষ্পাপ্যথবাপি মৃদ্বী।
মূত্রস্য চেন্মার্গমুপৈতি রুদ্ধা
মূত্রং রুজং তস্য করোতি বস্তৌ॥

প্রমেহঃ।

কফস্তু বাতপিত্তাভ্যাং মেদসা চ সমন্বিতঃ।
নবীনহায়না*দীনামতিমাত্রনিষেবণাৎ।
কুপিতশ্চোদকাস্থাংশ্চ প্রমেহান্ কুরুতে দশ॥
উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনাৎ।
তীক্ষ্ণাতপাগ্নিসন্তাপশ্রমক্রোধোপসেবিনাং।
বিষমাহারিণাঞ্চৈব ক্ষিপ্রং পিত্তং প্রকুপ্যচ।
বাতেন শ্লেষ্মণা চৈব মেদসা চ সমন্বিতং।
তথাবিধশরীরাণাং মেহমুৎপাদয়েদ্ধি ষট্॥
শিরোবিরেকবমনরেচনাস্থাপনানি চ
ব্যায়ামঞ্চাতিমাত্রেণ সেবমানস্য দেহিনঃ।
বেগসন্ধারণোদ্বেগব্যবায়াভোজনাদপি।
অভিঘাতাচ্চ শোকাচ্চ শোণিতস্যাতিমোক্ষণাৎ।
প্রজাগরাচ্ছরীরস্য বিষমাভ্যাসতস্তথা।
কটুতিক্তকষয়াতিরুক্ষশীতাদিসেবনাৎ।
তথাবিধশরীরাণাং বায়ুঃ কোপমুপেত্য চ।
পিত্তেন শ্লেষ্মণা চাপি বসয়া মেদসান্বিতঃ।
চতুর্বিধানসাধ্যাংশ্চ মেহানুৎপাদয়েদ্ধ্রুবং॥

* হায়নো হায়নকশালিঃ, তৈলস্নিকধান্তবিশেষঃ।

কেশেষু জটিলীভাবঃ মুপ্ততা করপাদয়োঃ।
শোষঃ কণ্ঠাস্যতালুনামাস্যং চ গুরুগাত্রতা।
মূত্রস্য শৌক্ল্যং মাধুর্য্যং পৈচ্ছিল্যং বপুষস্তথা।
রসনাগলতালুকায়চ্ছিদ্রে মলোদ্গমঃ।
পিপীলিকাষট্পদানামগতির্মূত্রদেহয়োঃ।
শরীরস্যামগন্ধিত্বং * তন্দ্রানিদ্রা চ সর্ব্বদা।
পূর্ব্বরূপে চ মেহানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনং॥
মক্ষিকাসর্পণং শ্বাসস্তাপঃ মাংসসঙ্কঃ।
প্রতিশ্যায়শ্চ শৈথিল্যং কফজানামুপদ্রবাঃ॥
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পরিধূমায়নং বমিঃ।
নিদ্রানাশশ্চ পাণ্ডুত্বং হৃচ্ছূলং পিত্তজন্মনাং॥
স্তব্ধতা চ শরীরস্য বাতজানামুপদ্রবাঃ॥
মেদোবসাভ্যামাপন্নশরীরস্য চ মেহিনঃ।
ত্রিভিস্ত্রৈর্দোষৈর্মুগতধাতোশ্চ পীড়কা দশ।
প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলং।
বিষদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষ্যতে॥
স্বেদদৌর্গন্ধ্যকার্শ্যানি।

চিকিৎসা-প্রসঙ্গ।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন]

বিশ্ব নিয়ন্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে জীব সৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার পর জগতে যখন পাপ প্রবেশ করিল, তখন সৃষ্ট জীবের শরীরে রোগও দুর্ব্বল, দেবতাগণ সে রোগ নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি তাহারই ফল। ব্রহ্মা সে ফল প্রদান করিলেন,

---

*আমমাংসসদৃশগন্ধঃ।

ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র সেই জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে লোক হিতবৎসল ঋষিমণ্ডলী ভূলোকে তাহা আনয়ন করিলেন, এমনই করিয়াই নর-জগতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইল।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প জ্যোতিষের প্রথম প্রচার-ভূমি ভারতবর্ষেই এই অমূল্য রত্নের প্রথম প্রকাশ হয়, সমগ্র জগত তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, গ্রীস দেশীয়েরা অধ্যবসায় বলে সে রত্নলাভ করিল, গ্রীস হইতে আরবীয়েরা উহা লাভ করিল, আরব হইতে সমগ্র মেদিনীই উহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থমনা হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রত্ন যাহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল, এহেন অমূল্য রত্ন আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান গরিমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া একদিন যাঁহারা সমগ্র ভূখণ্ডে অদ্ভুতকর্ম্মা বলিয়া ধন্যমনা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এ হেন যশঃ সুরভির মহামূল্য রত্নটী স্বেচ্ছায় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, নত্তি, নিমছাল, কালমেঘ,অশোক, গুলঞ্চ, সেফালি, বিল্ব, পাকুল প্রভৃতিতে এ রত্নের সমুজ্জ্বল কিরণমালা যে ভারতের কাননে প্রান্তরে, গৃহে, উদ্যানে, পথে, জলাশয়ে প্রতি নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে, এ কথা এই রত্নের অধিকারীরা একেবারেই আর ভাবিয়া দেখিলেন না,আমাদের সম্পত্তি রূপান্তর করিয়া অন্য অন্য দেশবাসীরা যখন আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেন, তখন আমরা আশ্চর্য্যজ্ঞানে সেই দেশবাসীদিগকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলাম। ইহাই হইল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আদিম ও বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থান্তরে বৈদ্যের জাতীয় আভিজাত্যেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, সেই কথাটা লইয়াই অদ্য একটু আলোচনা করিব।

কতকগুলি বৃত্তি লইয়া মানবসমাজ গঠিত। তন্মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তির মত এরূপ গৌরবের বৃত্তি যে আর নাই,এ কথা খুব জোর করিয়া—বড় গলা করিয়া বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম মূলক বৃত্তিগুলির মধ্যে গুরু, পুরোহিত, শিক্ষক এবং চিকিৎসকের বৃত্তিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু চিকিৎসকের বৃত্তি ইহাদের অনেকের উপর। রাজা হউন, জমীদার হউন, হাকিম হউন, উকীল হউন, অর্থে বল, সম্মানে বল, যিনি যতটা বিষয়ের অধিকারী হউন না কেন, সকলকেই চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। জীবন-মরণের গুরুদায়িত্বের ভার গ্রহণ কি চিকিৎসকের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়? এ ভার তো কাহারও উপর অর্পণ করিবার উপায় নাই। যথেষ্ট অর্থ দিয়াও চিকিৎসকের অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যস্ত হন না—এমন লোক জগতে কয়জন আছেন? জটিল ও উৎকট, কুৎসিত ও কুকর্ম্ম জনিত রোগের রোগী অনেকের নিকট অনেক কথা গোপন করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের নিকট সে কথা বলিতেই হইবে, এই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন।

"মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ অপ্যেত নভিসঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ"

অর্থাৎ রোগীর মাতা, পিতা, বন্ধু সকলের নিকটেই রোগের কথা গোপন করিতে পারে, কিন্তু বৈদ্যের নিকট বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিয়া থাকে। তাহার জীবন মরণের গুপ্ত কাহিনী কাহার নিকট বলিয়া

উহার প্রতিকারার্থে নিশ্চিন্ত, তাহা দেখিয়া তাহার বৃত্তি কতটা উৎকৃষ্ট, তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে ? তুমি বৈদ্য হইয়া একথা যদি না বুঝিতে পার, তাহা হইলে তোমার জীবনই বৃথা।

এখন এই জাতীয় একাকারের দিনে, আমাদের অধঃপতিত সমাজে নানাজাতির লোকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা—বৈদ্য জাতিরই কৌলিক বৃত্তি। এই বৃত্তি অবলম্বনের জন্যই বৈদ্যজাতি সমাজে বরেণ্য হইয়াছিল। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকুশল এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্যের তেজস্বীতা—ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ব্যক্তির অনুরাগেরও মুখাপেক্ষী নহে। বৃত্তির বিনিময়ে আত্মপরিপোষণের জন্য বৈদ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তাঁহার অর্থের বিনিময়ে গোলামী শিখিবার যো নাই, এ সম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্য প্রবর গঙ্গাধরের নামোল্লেখে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে পারা যায়। আত্মমর্য্যাদার হানি হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া একদা তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর একশত টাকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরিশেষে মহারাণী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে বৃত্তি গ্রহণে সম্মত করাইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে যাঁহারা সামান্য অর্থের অনুরোধে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা যদি এ কথাটী চিন্তা করেন, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার হইবে।

যা'ক, যা, বলিতেছিলাম, চিকিৎসায় বৈদ্য জাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নহে, কিন্তু এখন বৈদ্যগণ এ বৃত্তি ছাড়িতে বসিয়াছেন। এ বৃত্তিতে অর্থোপার্জ্জনের পথ এখন আর সুগম নহে বলিয়া বৈদ্যদিগের এইরূপ মতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের দোষেইত অর্থোপার্জ্জনের পন্থা রুদ্ধ হইতেছে,—সে কথাটা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে ? দেশের চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিবার পদ্ধতি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারই অভাবে না এই দুর্গতি! লেখা পড়া শিখিব না, রোগী দেখিয়া চিকিৎসা করিব না, শুধু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিব, ইহাই হইয়াছে না বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহারই জন্য না আমাদের দুর্গতি হইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া ঔষধ বিক্রয়ে নির্ভর করা চিকিৎসকের বৃত্তি নহে। যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তিনি এরূপ বৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতে যে কিরূপ ব্যয়, তাহা সকলেই জানেন। প্রকৃতপক্ষে সে কালের অপেক্ষা, একালে অন্য দ্রব্যের মত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের উপাদানগুলির মূল্যও অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আগে কবিরাজ মহাশয়েরা যে মূল্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রয় করিতেন, এখন বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী কবিরাজগণ তাহা অপেক্ষা এত কম মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু ঘটিত ঔষধগুলির মূল্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের স্বর্ণ রৌপ্যাদির মূল্যের তুলনায় কম তো হইতেই পারে না। ঘৃত এবং তৈলাদির মূল্যও যে কি করিয়া কম হয়, তাহাও বুঝি না। ঘৃত-তৈলাদির দর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে পুরাতন গব্য ঘৃতের স্থলে নূতন এবং ভেজাল ভয়সা ঘৃত ও বিশুদ্ধ

কৃষ্ণ তিলের স্থলে সাদা তিলের তেলের দ্বারা যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহার যথেচ্ছো মূল্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ উপাদান লইয়া যাঁহারা এই ব্যবসায়ে ব্রতী হন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসকের সংজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নামে সংজ্ঞা প্রদান করিলেই প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। অনেককাল পূর্ব্বে ত্রিকালদর্শী ঋষিগুণী দেশে এই শ্রেণীর চিকিৎসকের প্রাদুর্ভাব হইবে বুঝিতে পারিয়া, "ছদ্মচর" বলিয়া তাঁহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলে এ শ্রেণীর চিকিৎসকদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিতেন কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। ফল কথা, যে সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অভ্যুদয় তাহার অন্যতম কারণ। ইহা ভিন্ন বৈদ্য ছাড়া অন্যান্য জাতিও এইরূপ বিজ্ঞাপনের কুহকে যে দেশ মজাইয়া তুলিয়াছে,—তদ্দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিতেছে। ইহাদের বিজ্ঞাপনের ঘটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই ইহাদের খরিদ্দারও যথেষ্ট; কিন্তু ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় না দেখিয়া দেশের লোকের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্যবসায়ে এতাদৃশ পাপের স্রোত বহমান সত্ত্বেও কতকগুলি রোগে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর না থাকায় এই চিকিৎসা এখনও দেশ হইতে লোপ পায় নাই। নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইত। যাহা হউক, দেশের বৈদ্য জাতি যথারীতি শাস্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া আবার যদি ইহার উন্নতি কামনায়, মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে আবার ইহার উন্নতি হইয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ব গৌরব যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর মোহে মুহ্যমান হইতেও হয় না, স্বধর্ম্ম মূলক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে বৈদ্যজাতি অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে সক্ষম হইতে পারেন। কিন্তু আবার বলি, এখনকার দিনে শুধু 'নিদান', 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি দু'চারিখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া এ ব্যবসায়ে ব্রতী হইলে চলিবে না, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সমাপ্তিপূর্ব্বক তবে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইবে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের যোগ্যাকরণ চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ, সেই কথাটী মনে রাখিয়া—যথারীতি আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এরূপ ভাবে সকল দিকে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যিনি এ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন, তিনিই ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক হইয়া এক দিকে স্বকীয় উন্নতি, অপর দিকে বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের সুমতি হওয়ায়—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে, কিন্তু দেশের বৈদ্যগণ এ সকল কথা একবার ভাবিবেন কি?

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ)

আদার রস দুই তোলা এবং মনসাগাছের ছালের রস দুই তোলা, একত্র মিশাইয়া প্রাতঃকালে নিয়মিত সেবনে শ্বাস (হাঁপানি) আরোগ্য হয়।

আমাশয় রোগে শ্বেত আকন্দের মূল চূর্ণ চারি আনা—আমরুল শাকের রস এক তোলা অনুপানের সহিত তিন দিনমাত্র ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

জীরা চূর্ণ দুই রতি এবং নাটা করঞ্জের ফলের শাঁস শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ ৩ রতি লইয়া জল সহ মাড়িয়া বটী করিবে। উক্ত বটী জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় তিন চারিটী মাত্র ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। দোষের পরিপাকের পর অর্থাৎ আমাবস্থা দূর হইলে উক্ত বটী ব্যবহারে আর জ্বর হয় না। কুই-নাইনের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রজঃকৃচ্ছ্রে প্রবল বেদনা উপস্থিত হইলে হীরাকস পাঁচ আনা, মুসব্বর পাঁচ আনা, আফিং চারি আনা এবং বঙ্গভস্ম দুই আনা জলে মাড়িয়া বত্রিশটী বটী করতঃ প্রাতঃকালে এক বটী কর্পূর জলে এবং বেলা চার ঘটিকায় এক বটী কর্পূর জল সহ মাড়িয়া সেবন করিলে বেদনা নষ্ট হয় এবং রজঃস্রাব হয়।

কালা-জ্বর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

জ্বর বলিতে যে রোগেকে বুঝায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একপ্রকার জ্বরকে সাধারণ জ্বর এবং অপর প্রকারকে বিষম জ্বর বলা হয়। জ্বরের ভোগ অনুসারে এই প্রকার জ্বরকে নবজ্বর ও জীর্ণজ্বর ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ জ্বর অনেক সময় বিষম জ্বরে পরিণত হয়, আবার অনেক সময় প্রথম হইতেই বিষম জ্বরে পরিণত হয়। একুশ দিন জ্বর ভোগের পর নিবৃত্তি না পাইলে তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা হয়।

সাধারণ জ্বরে দোষ—আমাশকে আশ্রয়

করিয়া এবং বিষমজ্বরকে সপ্ত ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণ জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হয় এবং স্থল বিশেষে প্রথম হইতেই বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে।

দোষোঽল্পহিতসংভূতো জ্বরোৎ সৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষম জ্বরম্॥

অহিত সংভূত অর্থাৎ শরীরের অনিষ্টকর আহার, আচার, কাল, দেশ প্রভৃতির সেবা জন্য দোষের প্রকোপ হইলে সেই দোষ রসাদি সপ্ত ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এখানে প্রথম দোষের প্রকোপ অল্প থাকে, পরে নিদান সেবন জন্য দোষ লব্ধবল হইয়া ঐ জ্বর উৎপাদন করে, এই ভাবে যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে আরম্ভ হইতে বিষম জ্বর বলা হয়। আর একপ্রকার বিষম জ্বর জ্বরোৎ-সৃষ্ট অর্থাৎ যাহাদের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে — তাহাদের যদি দোষ একেবারে প্রকৃতস্থ না হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং রোগী যদি নিদান সেবন করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রকারে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বর ত্রিসপ্ত হ অতীত হইলে যদি প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা হয়।

ত্রিসপ্তাহ্ ব্যতীতস্থ জ্বরো যস্তনুতাংগত।
প্লীহাগ্নিসাদংকুরুতে সজীর্ণজ্বর উচ্যতে॥

এখন দেখা যাইতেছে যে—

(১) সাধারণ জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

(২) আরম্ভ হইতেই বিষম জ্বর হইতে পারে।

(৩) জ্বর উৎপন্ন হইয়া পরে জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়।

এতভিন্ন জ্বরের আর একটী অবস্থা দেখা যায়, তাহা জ্বরের পুনরাবর্ত্তন। জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে সম্যক্ বল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি সেবন করা নিষেধ হইয়াছে; সেই গুলি যদি সেবিত হয়, তাহা হইলে এবং দোষ সকল অনুচিত রূপে নিবৃত্ত হইয়া অল্প অপচারেই জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হয়।

অসঞ্জাতে বলো যস্ত জ্বর মুক্তো নিষেধতে।
বর্জ্জ্যামেতন্নবস্তস্য পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ॥
দুহৃতেষু চ দোষেষু যস্ত বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পে নাপ্যপচারেণ তস্য ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ॥

কালা-জ্বর বলিতে যে জ্বরকে বুঝায়, তাহা বিষমজ্বরের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমতঃ সাধারণ জ্বর হইয়া পরে বিষমত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার প্রথম হইতেই বিষমজ্বর রূপে দেখা যায়। বিষমজ্বর সন্ততঃ সততক, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক ভেদে পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে দোষ—রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্ততঃ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক, মাংসগত হইয়া অন্যেদ্যু, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইয়া চাতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। যেখানে বিষমজ্বর প্রথম হইতেই উৎপন্ন হয়। সেখানে সন্ততাদি অন্যতমরূপে প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষজ। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ যখন রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে' তখন সেই জ্বরকে সন্ততঃ জ্বর বলে। এই জ্বর হইতে নির্দ্দিষ্ট ভোগ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদী ভাবে থাকে। ত্রিদোষ রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক জ্বর উৎপাদন করে। এই

জ্বর দিবসে দুইবার বেগ দিয়া আইসে। দিবসে যে কোন্ সময়ে এই দুইবার বেগ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, দিনে দুই বার, রাত্রে দুইবার অথবা দিনে একবার ও রাত্রে একবার আসিতে পারে। মাংস ধাতুকে আশ্রয় করায় ত্রিদোষজ যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর।

এই জ্বর দিবসে একবার আইসে। তৃতীয়ক ও চাতুর্থকভেদে অপর যে দুই প্রকার জ্বর আছে, কালাজ্বর বলিতে যে জ্বর বুঝায় তাহাতে দেখা যায় না, সুতরাং তাহাদের আলোচনা করা অনাবশ্যক।

সাধারণ জ্বর বিষমজ্বরে পরিণত হইয়াই হউক, অথবা আরম্ভ হইতেই বিষম জ্বর উৎপন্ন হউক উহা যে একভাবে থাকে এমন কোন নিয়ম নাই।

ঋত্বহোরাত্র দোষাণাং মনসশ্চ বলাবলাৎ।
কালমর্থবশাশ্চৈব জ্বরস্তং তং প্রপদ্যতে॥

অর্থাৎ ঋতু, দিন, রাত্রি দোষের এবং মনের বলাবল হেতু এবং কর্ম্মবশতঃ এই জ্বর বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। যেমন বর্ষাকালে সমুৎপন্ন সন্ততঃ জ্বর শরৎকালে সততক রূপে পরিণত হয়। ঋতু সম্বন্ধে যে প্রকার দেখান হইল এইরূপ সকলগুলির সম্বন্ধেই দেখান যাইতে পারে। জ্বর জীর্ণ হইলে প্লীহা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ। প্লীহাভি বৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্লীহা উৎপন্ন হইলে রক্ত এবং কফ দুষ্ট হয়, প্লীহা রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলেন, "দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, মলগ্রহ, মূত্রগ্রহ, তমঃপ্রবেশন, পিপাসা, অঙ্গসাদ, কাস, শ্বাস, মৃদুজ্বর, আনাহ, অগ্নিনাশ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, পর্ব্বভেদ, কোষ্ঠে বাত বেদনা এবং উদর অরুণ বর্ণ বা গাত্র সমান বর্ণ এবং নীল, হরিৎ বা হরিদ্রাবর্ণ রেখা বিশিষ্ট হয়।

প্লীহা যেমন উদরের বামপার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বেও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্লীহা ও যকৃতের লক্ষণ তুল্যতা এবং চিকিৎসার তুল্যতা বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সন্ততঃ, সততক ও অন্যেদ্যুঃ ইহাদের অন্যতম জ্বর, প্লীহা এবং স্থল বিশেষে যকৃতের বিবৃদ্ধি, পেটের উপর নীল বা হরিদ্বর্ণের শিরারাজি বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু প্লীহা রোগী "কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুত ক্ষীণ বলোঽতি পাণ্ডুঃ" হয়। কফজন্য উপদ্রব রূপে কাস (Bronchitis & Pheumonia) এবং আমাশা (Dysentry) দেখা যায়। পিত্তজনিত উপদ্রবরূপে অতীসার ও স্রোতঃপাক (Cancrune Oris of Necro biosis) দেখা যায়। রোগী পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট হয়। পাণ্ডু শব্দের অর্থ ছাইয়ের বর্ণ। প্রথমতঃ রক্তহীনতা নিবন্ধন এইরূপই দেখায়। কিন্তু যখন পিত্ত বিদগ্ধ হয়, তখন হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। বিদগ্ধ পিত্ত অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া এবং পাণ্ডুরোগে রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হয় বলিয়া—পিত্তের অম্লরস—রক্তের ক্ষার ধর্ম্মকে কমাইয়া দেয়। কফ ও পিত্ত—দ্রব ধাতু বলিয়া রক্তের সহিত সহজেই মিশ্রিত হইয়া রক্তের দ্রবাংশ বাড়াইয়া দেয়। সেই জন্য যেমন রক্তের ঘনত্ব চলিয়া তদ্রূপ স্বাভাবিক রক্তে যে পরিমাণ শ্বেত ও রক্ত কণিকা

পাওয়া যায়, তাহা আর দেখা যায় না, প্লীহা জন্য মূত্রগ্রহ থাকায় রক্তের দ্রবাংশ বৃদ্ধি এবং রক্তকণার ক্ষয় জন্য রোগীর শরীরস্থ জলীয়াংশ পাদদেশে নিচিত হইয়া শোথরূপে প্রকাশ পায়, ক্রম রয়ে শোথের সর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ত্রিদোষ যখন রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্ততঃ জ্বর উৎপাদন করে, সেই সময় রোগীর গায়ে পীড়কোদ্গম এবং রক্তনিষ্ঠীবন দেখা যায়।

"রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মেহশ্ছর্দ্দন-বিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পীড়কা তৃষ্টা রক্তপ্রাপ্তেজ্বরে নৃণাম॥

এক্ষণে আমরা কালাজ্বর সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ মতে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি

(১) (ক) সাধারণ সন্নিপাত জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হইয়া সন্ততঃ, সতত এবং অন্যেদ্যু:—ইহাদের অন্যতম রূপে প্রকাশ পাইতে পারে।

(খ) আরম্ভ হইতে সন্ততঃ জ্বর হইয়া সততক বা অন্যেদ্যুঃ রূপে পরিণত হয়।

(গ) আরম্ভ হইতে সততক রূপে পরিণত হইতে পারে।

(ঘ) আরম্ভ হইতে অন্যেদ্যুঃ জ্বর উৎপন্ন হইয়া সন্ততঃ বা অন্যদ্যুঃরূপে পরিণত হইতে পারে।

(ঙ) এইরূপে উৎপন্ন সকল প্রকার জ্বরই কোন প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরাবর্ত্তক জ্বররূপে দেখা যায়। ইহার পরে যখন—

(২) প্লীহা দেখা দেয়, তখন স্থল বিশেষে যকৃতও দেখা যাইতে পারে। পিত্তাধিক্য থাকায় জন্য প্লীহা কোমল থাকে এবং কফাধিক্য হইলে উহা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়।

(৩) সন্ততঃ জ্বরে দোষ রসধাতুকে আশ্রয় করে বলিয়া রস দুষ্ট হয়। রস সকল ধাতুর মূল ধাতু; সুতরাং রস দুষ্ট হইলে পরবর্ত্তী ধাতু সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র দুষ্ট হয়। সেই জন্য শরীরের আর সম্যক উন্নতি সাধিত হয় না। রোগী দিনে দিন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকে এবং ক্রমে অবসন্ন প্রাপ্ত হয়।

(৪) যখন দোষ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক জ্বর রূপে প্রকাশ পায়, সেই সময় রক্তের সহিত পিত্ত ও কফ মিশ্রিত হওয়াতে রক্তের দ্রবাংশ বাড়িয়া যায় বলিয়া রক্তের ঘনত্ব কমিয়া আইসে এবং যে পরিমাণ রক্তে যে পরিমিত শ্বেত ও লোহিত কণা বিদ্যমান থাকে তাহা আর দেখা যায় না। রক্ত ধাতু দুষ্ট হয় বলিয়া তখন পীড়োকোদ্গম Pur puric patch) এবং রক্ত নিষ্ঠীবন দেখা যায়।

(খ) পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া গেলে অম্লতা প্রাপ্ত হয়—যদুক্তং "বিদগ্ধঞ্চাম্লতাং ব্রজেৎ" সুতরাং রক্তের সহিত মিশ্রিত বিদগ্ধ পিত্ত রক্তের ক্ষার ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(৫) ত্রিদোষ যখন মাংস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুক জ্বর উৎপাদন করে তখন পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং এবং সৃষ্টমূত্র পুরীষতা দেখা যায়। এই দোষ অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থিভেদ অর্থাৎ অস্থিতে ভগ্নবৎ পীড়া অনুভব হয়।

(৬) প্লীহায় রোগী—কফ ও পিত্তজনিত উপদ্রব থাকে বলিয়া কফ জন্য এবং পিত্ত জন্য অতিসার স্রোতঃ পাক ইত্যাদি উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী অবস্থা পাণ্ডু এবং পাণ্ডুজন্য রোগীর

গাত্র হরিৎ বা নীলবর্ণ ধারণ করে। ক্রমে রোগীর রক্তহীনতা জন্য শোথ ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

স্ত্রী চিকিৎসা। ডাঃ আর,এল, সুর এম-ডি প্রণীত, শ্রীরামলাল সুর কর্ত্তৃক ১০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা অতিসুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে স্ত্রীলোকেরা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। ডাক্তার সুর অশীতিপর বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসক। এই পুস্তকে স্ত্রী চিকিৎসা বিষয়ক যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ তাঁহার অভিজ্ঞতার দৃষ্ট ফল। পল্লীগ্রামে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগেরও এই পুস্তকের দ্বারা উপকার হইতে পারিবে।

Dictionary ডাঃ আর, এল, সুর এম-ডি প্রণীত। ৪র্থ সংস্করণ। মূল্য ২৲ স্থলে ১॥০ টাকা। ইহা একখানি ডাক্তারি অভিধান। ইহাতে মোটামুটি ডাক্তারী শব্দের দুরূহ ব্যাখ্যা সকল ল্যাটিন, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা ডাক্তারী ছাত্রগণ অনেক উপকার পাইবেন।

মূত্র পরীক্ষা। ডাঃ শ্রীমান্ আনন্দমোহন সুর প্রণীত। মূল্য ✓০আনা মাত্র। খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,শ্যামুয়েল এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত। মূত্র পরীক্ষার বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সহজ কথায় ইহাতে লিখিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণ এই পুস্তকের দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইবেন। আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

কদলীর উপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

১২। চিনি চাঁপা—একপ্রকার চাঁপা কলা, পূর্ব্বোক্ত চাঁপা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সুতার।

১৩। গিরী কদলী—মধুর, হিম, বলবীর্য্য বৃদ্ধিকারক তৃষ্ণা, পিত্ত দাহ ও শোষনাশক।

১৪। ঠোটে কলা—ছোট ছোট কলা, ঘোর সবুজ বর্ণ, পাকিলে অধিক সুমিষ্ট।

১৫। জিনকলা—ইহার অপর নাম ঠোটে বা লম্বির কলা, গোপীকলা ইত্যাদি।

১৬। কাচা কলা—ত্রিপুরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে কুড়োকাঠালি, ডিঙ্গামাণিক, পান্তরস, বগুনা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় ভুক্ত হয়, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও একটী প্রধান তরকারী, বিশেষতঃ কাচা কলা বিশেষ পুষ্টিকর, ধাতু বর্দ্ধক, উদরাময়ে পথ্য। ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহের গুণ আছে।

১৭। ডোগরে কলা—কলিকাতার নিকটে জন্মে, পাকিলে এত বীজ হয় যে, খাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মোচা সুস্বাদু, মোচার জন্যই চাষ করা হয়।

১৮। ঝামা কলা—বীচিভরা ঐ জন্য মানুষের খাদ্য মধ্যে প্রিয় নহে। ইহার পাতা, মোচা, থোড়, খোলা ইত্যাদি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গোজাতির খাদ্য।

১৯। দয়া কলা—ঝামাবসনা (বহু বীচি যুক্ত), শবরীকলা, জিন বা লম্বির কলা—(ইহাকে ঠোটে কলাও কহে) অধিক। তবে স্থানে স্থানে চিনি টোপা নামে একরূপ বড় বড় কলা আছে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে আবাদ হয়।

২০। সোণা কলা—দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার রং, মর্ত্তমানের জাতীয়, (বোম্বায়ে জন্মে)।

২১। বীচা কলা প্রথমে কাঁচা কলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভাযুক্ত হলুদ রং হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ, বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুমিষ্ট, পাড়া গাঁয়ে স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় ভাল বাসে।

২২। অগ্নীশ্বর—লাল রং ওজনে প্রায় ৩ ছটাক গরম ভাতে ডবাইয়া রাখিলে ঘৃতের মত গলিয়া যায় ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু।

২৩। ক্ষিত্র—ইহাও অগ্নীশ্বরের তুল্য গুণও তুল্যস্বাদ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু ছোট।

২৪। অনুপাম—মর্ত্তমান কলার জাতীয়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

২৫। বত্রিশছড়ী—বাঁকুড়া জেলায় জন্মে এক কাঁদিতে ঠিক বত্রিশ ছড়া কলা জন্মে, (চাঁপাকলার জাতীয়)।

২৬। শিঙ্গাপুরী—শিঙ্গাপুর হইতে আসে বড় বড় কলা হয়, পাকিলেও দেখিতে সবুজ, কিন্তু ভিতরে মোলায়ম ও সুস্বাদু।

২৭। মোহন বাঁশী—ইহা বিদেশী দ্রব্য ইহার অপর নাম কানাই বাঁশী। পেশোয়ার কাশ্মীর এবং পশ্চিম ভারত হইতে এই কলা আসিয়া বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা খাইতে অম্ল মধুর প্রায় এক হাত লম্বা হয় কিন্তু সরু বেশ হরিদ্রাবর্ণ, এই শ্রেণীর কালার সাধারণ নিয়ম এই যে ইহার বাকলা বড় পাতলা এবং পাকিলে কাল হইয়া যায়।

২৮। নদনা—কাঁঠালী কলারই জাতীয় অপেক্ষাকৃত একটু বড়।

২৯। তুলসী কলা—ছোট ছোট কলা হয়, বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধিন পশ্চিম দেশে পাওয়া যায়।

৩০। দয়ে কলা—যশোহর জেলায় জন্মে, ইহা এক প্রকার বীজ কলা, কিন্তু শাঁশ টুকু অতি মিষ্ট নরম ও সু-তার, চিনি সহ জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।
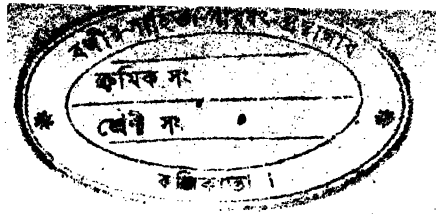
আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ সাল। | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

চিকিৎসায় রসৌষধ।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধাতব ঔষধ ব্যবহার করিবার পক্ষে একটু মুস্কিল আছে। যদিও লোকে কথায় বলে "লোহা খাইয়া হজম করিতে পারি",—তথাপি জীবের পরিপাক-যন্ত্রের এমন কোন শক্তি নাই—যাহা দ্বারা ধাতব পদার্থ সকল সে অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। এইজন্য ধাতব পদার্থ সকলকে ঔষধে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে জীব-শরীরের উপর কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। ঔষধে জীবন্যাস করিবার একটী প্রথা বিদ্যমান আছে। আজ যদিও উহা মাত্র একটী মন্ত্র উচ্চারণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি উহার একটী নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান আছে। আজ ঔদ্ভিদ দ্রব্য সকল স্বভাবতঃই জীবন স্বত্ব ইহারা সেবিত হইলে জীবের পরিপাক শক্তির প্রভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ষণ ও বর্দ্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কিন্তু ধাতব পদার্থগুলি তদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। যদিও পাচক রসের প্রভাবে তাহাদের দুই একটী জীব-শরীরে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তথাপি তাহাদের অধিকাংশই অবিকৃতাবস্থায় মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। পরন্তু গুরু পদার্থ সকল পরিপাক যন্ত্রের ভিতর থাকিলে নানাপ্রকার অনর্থ সংঘটিত হয়। এই সকল কারণে ধাতব ঔষধ সকলের জীবন্যাস করিয়া ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। জীবন্যাস শব্দের অর্থ এই যে, যুক্তি ও ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যকে জীব-শরীরে কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া লওয়া।

ধাতব পদার্থ সকলকে জীবশরীরের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে প্রথমতঃ তাহার দোষ দূর করিয়া লইতে হয়। এই দোষ দুই প্রকারের। এক, দ্রব্যের স্বাভাবিক দোষ, অপর সংসর্গজ দোষ। স্বাভাবিক দোষ যুক্ত দ্রব্য জীব শরীরে প্রযুক্ত হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধন করে, আর সংসর্গজ দোষ জন্য তাহার সহিত অপর জিনিসের সংমিশ্রণ থাকে বলিয়া তাহাদের দ্বারাও শরীরের অপকার সাধিত হয়। দ্রব্যের স্বাভাবিক ও সংসর্গজ দোষ জন্যই শোধনের ব্যবস্থা। শোধনানন্তর সেই দ্রব্য প্রযুক্ত হইলে, শোধনের পূর্ব্বে তাহা দ্বারা যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহা আর থাকিবে না। পরন্তু ভেষজ সংস্কার জন্য তাহায় শক্ত্যুৎকর্ষ সাধিত হইবে।

যে সকল দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যে শরীরে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তাহাদিগকে শোধন করিয়াই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যে, শোধন-ক্রিয়া করিলেও তাহা শরীরের কার্য্যোপযোগী হয় না। এইজন্য তাহাদিগের জারণ ক্রিয়া করিতে হয়। জারণ ক্রিয়ার ফলে দ্রব্যগুলি অতি সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে পরিণত হইয়া বারিতর হয়, এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়ে। বারিতর শব্দের অর্থ এই যে "মৃতং তরতি যত্তোয়ে লৌহং বারিতরং হি তৎ—" অর্থাৎ যে মৃতধাতু (ধাতুভস্ম) জলের উপর ভাসিতে থাকে, তাহাকে বারিতর কহে।

এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে জীবদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়। একটী প্রবাদ আছে, 'স্বভাব যায় না মলেও"। যদিও দ্রব্যগুলি জীবদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী হয়, তথাপি জীবদেহে অপকার করিবার শক্তিও তাহাদের থাকিয়া যায়। সেই সকল দোষ দূর করিবার জন্য দ্রব্যগুলির অমৃতীকরণ করিয়া লইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শোধিত, জারিত এবং অমৃতীকৃত ধাতব ঔষধগুলি জীবদেহে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান। রোগ নাশার্থে ইহাদের অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। সামান্য ২।১ রত্তি পরিমিত মাত্রাতেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, সুতরাং এই সকল ঔষধ সেবনে বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, পরন্তু সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। যেখানে রোগী রোগ যন্ত্রণায় অচৈতন্য বা অভিভূত হইয়া থাকে, সেই রূপ অবস্থায়ও এই সকল ঔষধ কোন ক্রমে প্রবেশ করাইতে পারিলেই তাহা উদরস্থ হইয়া কার্য্যকারী হয়। এই সকল ঔষধে ষড়রসের মধ্যে কোন প্রকার রসের উদ্ভূতত্ব না থাকায় ঔষধ সেবনে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করে না; সুতরাং কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রসবিশিষ্ট ঔষধ সেবনের জন্য অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ আইসে না। আহারে রুচি অব্যাহত থাকায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না বলিয়া শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। অধিকন্তু কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা রসৌষধ শক্ত্যাধিক্য বশতঃ উহা দ্বারা সত্বরই সুফল পাওয়া যায়। সন্নিপাত জ্বরে যেখানে রোগীর নাড়ী লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, সেরূপস্থলে দশমূল কিম্বা অষ্টাদশ মূল এবং মস্ত জাতীয় ঔষধ অপেক্ষা কস্তুরী ভৈরব বা সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধ অতি শীঘ্র যে স্থায়ী ফল প্রদান করে, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাষ্ঠৌষধ সকল অধিকাংশই শোধক। অনেক রোগই শোধ নাই নহে, এজন্য যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে যেখানে ক্ষয়ানুবন্ধ আছে, সেরূপ স্থলে কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা ধাত্বৌষধ সকল অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। কারণ, রসৌষধ গুলি শমন বলিয়া শোধনাদি না করিয়াই বিষম দোষকে সাম্যা বস্থায় আনয়ন করে এবং রসৌষধ মাত্রেই রসায়ন বলিয়া ক্ষয় নিবারণ করিতে সমর্থ।

বিরুদ্ধোপক্রম স্থলে কাষ্ঠৌষধ অপেক্ষা রসৌষধ প্রয়োগ অধিকতর উপযোগী; যেমন শোথাতীসার-চিকিৎসা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, শোথ কমাইতে গেলে অতীসার বাড়ে এবং অতীসার কমাইতে গেলে শোথ বাড়িয়া যায়—ইহাই বিরুদ্ধোপক্রম। এরূপ স্থলে কাষ্ঠৌষধ দিয়া চিকিৎসা চলেনা, কিন্তু পর্পটী, লালগুঁড়া, দুগ্ধবটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অচিরে সুফল পাওয়া যায়।

গোবিন্দ দাস তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

ন দোষানাং ন রোগানাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রস চিকিৎসিতে॥

এই শ্লোকটী দেখিয়া অনেকে নানা-প্রকার বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার একটী বর্ণও মিথ্যা নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, আয়ুর্ব্বেদ মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের ব্যবহৃত মকরধ্বজের সুফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া আজ কাল ছোট বড় সকল ডাক্তারই অ-বিচার শূন্য হইয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করিতেছেন, এমন কি, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম আশ্রয়স্থল সুদূর জার্ম্মেনী হইতে একণে উহা প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। "অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্"—যদিও শাস্ত্রে আমরা এই কথা দেখিতে পাই এবং এই বাক্যের অনুসরণ না করিয়াই যথেচ্ছাক্রমে ইহা প্রয়োগ করি, তথাপি ঔষধের এমনই মাহাত্ম্য যে, সেই যদৃচ্ছ ব্যবহৃত মকরধ্বজের প্রভাবে কিছু না কিছু সুফল পাওয়া যায়ই। এই সকল আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

অল্প মাত্রোপযোগিত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্যদায়িত্বাদৌষধে ভ্যোঽধিক রসঃ॥
সাধ্যেষু ভেষজং সর্ব্বমীরিতং তত্ত্ববেদিনা।
অসাধ্যেষ্বপি দাতব্যো রসোঽতঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

অর্থাৎ রসৌষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহা প্রয়োগে অরুচি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা দ্বারা অতিসত্বর আরোগ্য লাভ করা যায়। এই হেতু রসৌষধ সর্ব্ববিধ ঔষধ অপেক্ষা সমধিক গুণকারক বলিয়া জানিবে। পরন্তু পণ্ডিতগণ সাধ্য রোগেই অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বলিয়াছেন, অসাধ্য, রোগে কোনও প্রকার ঔষধেরই উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু রসৌষধ কর্ত্তৃক সাধ্য ও অসাধ্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইবার কথা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ অপেক্ষা রসৌষধেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ রসৌষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ]

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানামারোগ্যং মূল মুত্তমং"—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলস্বরূপ আরোগ্য। শরীর অথবা মনঃ ব্যাধিযুক্ত হইলে মানব এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোন একটীও লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ব্যাধিমুক্ত মানব মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কর্ম্ম-গগনে স্বেচ্ছায় বিচরণ ও শ্রেষ্ঠ স্থান অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। সর্ব্বজনবাঞ্ছিত এই আরোগ্য দান যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেই কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদান পুণ্যময় ভারতভূমিতে অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এতাদৃশ সর্ব্বজন কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাপদ্ধতি কি ভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত—মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া বামনের চন্দ্রস্পর্শ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্র। তথাপি আমি যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা বলিয়া কিছু লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবল মাত্র, আমি আয়ুর্ব্বেদের একজন শিক্ষাভিলাষী বলিয়া এবং সুশ্রুতোক্ত এই উপদেশ বাণী আমার তরল মনকে চঞ্চল করিয়াছে, সেই জন্যই সুধীজন সকাশে নিবেদন স্বরূপ আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। সুশ্রুতে উক্ত আছে:—

"যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ,
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবং॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র বহিষ্কৃতঃ
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি রাজতঃ॥

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু কর্ম্মকুশল নহেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরু ব্যক্তির ন্যায় আতুর প্রাপ্ত হইলে মোহ প্রাপ্ত হন। আর যিনি কর্ম্মকুশল কিন্তু ধার্ষ্ট্যতা প্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানে যত্নবান হন নাই—তিনি সজ্জন-সমীপে কখনও সম্মান পান না এবং রাজপুরুষের নিকট দণ্ডনীয় হন। এখন দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যথার্থরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে শাস্ত্র জ্ঞান এবং কর্ম্মাভ্যাস—এই উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন, এই উভয় গুণে ভূষিত না হইলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী কখনও চিকিৎসক পদারূঢ় হইতে পারেন না, অতএব আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা পদ্ধতি শাস্ত্র উপদেশের সহিত সেই উপদেশানুযায়ী কর্ম্মাভ্যাস-সম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক আসিলেন, তিনি যথাসম্ভব শাস্ত্রোপদেশ দিলেন, ছাত্রও যথাসম্ভব পরিশ্রম সহকারে শাস্ত্র আয়ত্ত করিল, কিন্তু কর্ম্মাভ্যাসে যত্নবান হইল না। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এই শিক্ষার্থী যখন ভিষকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগী উপস্থিত হইলে "স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য"—এই ঋষি বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইবেন

সংশয় নাই। আবার যিনি কেবল মাত্র কর্ম্মাভ্যাসেই সমধিক যত্ন করিলেন, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সকল বুঝিবার আবশ্যক মনে করিলেন না—তিনিও সংশয়যুক্ত ব্যাধি নির্ণয়কালে কোনরূপ কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে সমর্থ হইলেন না, অতএব তাঁহার এই কর্ম্মকুশলতা "সংস্থ পূজাং নাপ্নোতি"। এই শাস্ত্রহীন কর্ম্মকুশল যদি সংশয়যুক্ত রোগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ কোন বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া "বধশ্চার্হতি রাজতঃ" এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়া বসিবেন।

এই সমস্ত কারণে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল হইবারই সম্ভাবনা। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রারম্ভ ও কর্ম্মাভ্যাস এই উভয় বিষয়েরই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যচিকিৎসা বিদ্যালয়ে এই উভয়বিধ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া তথাকার শিক্ষিত চিকিৎসকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ আটটী অঙ্গে বিভক্ত। বঙ্গদেশের আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ভিষক্‌মণ্ডলী এতদিন কেবলমাত্র কায় চিকিৎসারূপ একটী অঙ্গেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন, অধুনা কয়েকজন কৃতবিদ্য আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহাত্মা সাষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রদান করে কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। পুনরায় নবভাবে, শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণের সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে ভিষক্ ব্যাধিপীড়িতজনের অশেষরূপে শান্তি দান করিতে পারেন—তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক মহর্ষির অমূল্য উপদেশ কর্ম্মাভ্যাস ও শাস্ত্রারম্ভ—এই দ্বিবিধ বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শল্যতন্ত্র অধ্যয়নের সমকালীন কর্ম্মাভ্যাস না করিলে, গর্দ্দভের চন্দনভার বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হইবে। স মুহুত্যাতুরং প্রাপ্য—এ ঋষিবাণী কখনও নিরর্থক নহে, এযে সকল কথার সার। কল্পনা করুন—একজন শিক্ষার্থী শল্যতন্ত্র অধ্যয়নের সময় বহু যত্নে শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ শিরা বিদ্যমান, কোথায় কোন ধমনী অবস্থিতি করিতেছে, কোথায় কোন আশয় অবস্থান করিয়া কোন্ কার্য্য করিতেছে, কেবলমাত্র শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞানলাভ করিল, আবার শস্ত্র কর্ম্ম কয়প্রকার, কোন স্থানে কি ভাবে শস্ত্রে প্রয়োগ করিতে হয়—এ সমস্ত ও কেবলমাত্র অধ্যাপকের মুখে শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইল, অথচ সমস্ত কর্ম্মের অভ্যাস করিল না, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া যখন সেই চিকিৎসক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, নিশ্চয়ই তখন কোনও রোগীর শস্ত্র কর্ম্ম করিতে উপস্থিত হইলে কর্ম্মে অনভ্যস্ত হেতু তাঁহার পরিশ্রমলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান হারাইবেন। 'ঐ যে রোগীর কাতরব্যঞ্জক বদন শস্ত্রকর্ম্ম ভয়ে আরও কাতর হইয়াছে, কিরূপে এতাদৃশ ব্যথিতের গাত্রে শস্ত্রক্ষেপ করিব, ইত্যাকার মানসিক দৌর্ব্বল্য যে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান

বিলুপ্ত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেই জন্যই ঋষি উপদেশ দিয়াছেন,—

"এতদবশ্যমধ্যেয়মধীত্যচ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপাসিতব্যম্"

শাস্ত্র অবশ্য অধ্যয়ন করিবে, আর অধ্যয়নের সহিত কর্ম্মও অবশ্য অভ্যাস করিবে। কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, অধ্যয়ন সমকালীন, কর্ম্মাভ্যাসের উপযুক্ত রোগী পাওয়াতো মুখের কথা নয়, অতএব কিরূপে অধ্যয়নের সমকালীন কর্ম্মাভ্যাস হইবে? সে কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অন্য শাস্ত্রের ন্যায় হইলে চলিবে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে হইলে বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ করিতে হইবে। তথায় যে ভাবে শিক্ষা প্রদান হয়, তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিতে না পারিলে শল্যতন্ত্রমূলক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দান কিছুতেই সফল হইবে না। পাশ্চাত্যশারীরতত্ত্ববিদ মনিষীগণ বর্ত্তমানযুগে শারীরতত্ত্বে পারদর্শী, অতএব তাঁহাদের নিকট এইগুলি বিশেষ ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে, ঋষিও বলিয়াছেন ;—

তদ্বিদ্যেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যং।

আর এক কথা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সমকালীন সেই সেই কর্ম্মাভ্যাসের উপযোগী বস্তুর যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে তৎসদৃশ কোন দ্রব্যেও কর্ম্মাভ্যাসের উপদেশ দিতে হইবে। ঋষি তজ্জন্যই যোগ্যাসূত্রীয় নামক একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন ;—

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি,
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বানো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নি-কর্ম্মসু
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ॥

কর্ম্ম পথের উপদেশ চাই ই চাই, নচেৎ "সুবহুশ্রুতোঽপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি"। কর্ম্মানুশীলন না করিলে পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারাও কর্ম্মক্ষেত্রে অযোগ্য হয়।

মহর্ষির এই সমস্ত অমৃতময় উপদেশ বাণী স্মরণ করিলে কোন্ ভারতবাসীর আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে না? আমরা ঋষির এই সকল উপদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম বলিয়াই শল্যতন্ত্রে এতাদৃশ দীনতাপ্রাপ্ত হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে, দেশবাসীর মতি রতি পুনরায় ঋষিবচনে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অমৃতময় আদেশ পালনে আবার ভারত সন্তানের আকাঙ্খা জন্মিয়াছে, তাই প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে "সংশোধিয়ামৃতং সম্যক কুর্য্যাদঙ্গবিনিশ্চয়ং, এই সমস্ত আদেশ পালনের অনুষ্ঠানোপক্রম হইয়াছে।

এই শুভলগ্নে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞান, ও কর্ম্মাভ্যাস— এই উভয়বিধ শিক্ষা পাইয়া উভয়জ্ঞ হইয়া উঠে, সে বিষয়ে প্রত্যেকে আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহাত্মাগণের লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীগণ শাস্ত্র জ্ঞান ও কর্ম্মাভ্যাস—এতদুভয়ের একটিতে জ্ঞানলাভ করিলে চলিবে না, শুধু শাস্ত্রজ্ঞানী অথবা শুধু কর্ম্ম এ উভয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে অসমর্থ হয়।

"উভাবেতাবনিপুনাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মনি,
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেক পক্ষাবিব দ্বিজৌ॥

মহর্ষির এই কথাটী স্মরণ করিয়া শিক্ষার্থীগণও উভয় বিষয়েই সমধিক পরিশ্রম করিয়া উভয়েই কুশলী হইবেন। এই উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে অর্থসাধনে সমর্থ হইয়া প্রকৃত ভিষক্ পদবাচ্য হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঋষিও বলিয়াছেন ;—

যস্তু ভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থে ইর্থে সাধনে,
আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃস্যন্দনোযথা॥

বিসর্প।

(শ্রীশতীশচন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

—:০:—

এবার কি প্রকার উৎকট গরম গ্রীষ্মকালে হইয়াছিল তাহা পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণ বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন। বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আমার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম। পুত্রটির জন্মের পর তাহার প্রস্রাব হয় না। প্রথমতঃ ডাক্তারি ঔষধ দ্বিতীয় দিনে দেওয়া গেল, তাহাতে কিছুই হইল না। তাহার পর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। তৃতীয় দিনে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানা গেল যে, মূত্রদ্বারে ছিদ্র আছে। তৃতীয় দিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে কিছু হইল না। চতুর্থ দিনে অতি কষ্টে গাঁদা ফুলের গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া সোরার সহিত উহা পেষণ করিয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই প্রস্রাব হইয়া গেল।

বালকটি যখন ২৬ দিনের, তখন প্রাতে দেখা গেল যে, জড়সড় হইয়া কোঁথাইতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখা গেল যে, গা গরম। বালকের কোঁথানর কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ডাক্তার ডাকিলাম, তিনি আসিয়া থার্ম্মমিটার দিয়া দেখিলেন যে, জ্বর ১০৪° (ডিগ্রী)। শিশুর এত বেশী হঠাৎ জ্বর দেখিয়া তিনি অন্য কারণ স্থির করিতে না পারিয়া উহা ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া স্থির করিলেন ও সেইমত ডাক্তারি ঔষধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর বা শিশুর কষ্ট কমিল না। বৈকালে তাহাকে কোলে লইতে যাওয়ায় পাছায় চাপ পড়ায় খুব কান্দিয়া উঠিল। পাছার উপর হইতে হাত সরাইয়া দেখা গেল যে, পাছায় যে একটু ফুস্কুড়ি হইয়াছিল তাহার চতুঃপার্শ্ব সামান্য ফুলিয়া খুব লাল হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিয়া দেখান হইল, তখন তিনি উহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, শিশুর ইরিসীপ্লাস অর্থাৎ বিসর্প হইয়াছে। শুনিয়া ও দেখিয়া আমিও বড়ই চিন্তান্বিত হইলাম। তিনি তখন যাহাতে ঐ রক্তবর্ণ স্থান আর না বাড়িতে পারে তজ্জন্য ঐ স্থানে টিংচার ষ্টীল দিলেন ও উহার চতুঃপার্শ্বে টিংচার আইওডিন দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে শিশুর যন্ত্রণা আরও বেশী হইতে লাগিল ও

জ্বর কখনও ১০৩° কখনও ১০৪° হইতে লাগিল ও ঐ ফুলা রক্তবর্ণ স্থান ক্রমশ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ চর্ম্মের রক্তবর্ণতা ও স্ফীতি নিম্ন দিকে বিস্তৃত হইয়া পাদদ্বয়ের তলে আসিল। উপরের দিকে বিস্তার সামান্তই হইল। কিন্তু যখন পদতলে রোগের বিস্তার আসিল তাহার পরই উপরের দিকে বিস্তার বেশী হইতে লাগিল। রোগের নিম্নগতি দেখিয়া ডাক্তার বাবু বিপদের কারণ কমই বলিতেছিলেন, কিন্তু উপরের দিকে তাঁহার বিস্তার দেখিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া ইঞ্জেক্‌সনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। জ্বর একদিনও ১০২°এর নীচে নামে না। রোগের যাতনা ও তাহার উপর ঐ সকল বাহ্য প্রয়োগের ঔষধে শিশুর এত যাতনা হইতে লাগিল যে, টিংচার স্টীলও টিংচার আইওডিন প্রয়োগের সময় মনে হইত যে, শিশুকে বড়ই কষ্ট দেওয়া হইতেছে কিন্তু কি করা যায়, রোগ আরোগ্যের আশায় ঐ ভীষণ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিতে হইল। রোগ যখন উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল, তখন পেট ফাঁপাও বাড়িতে লাগিল। ডাক্তারি ঔষধে উপকার না হওয়ায় স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহোদয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনিও যথাসাধ্য যত্ন করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলেন, তাহাতে পেট ফাঁপা কমিতে লাগিল ও জ্বর কিছু কমিতে লাগিল, কিন্তু যে সব স্থানে একবার হইয়া সারিয়া আসিয়া ছিল, সেই স্থানের চর্ম্ম একবার উঠিয়া যাওয়া সত্বেও আবার সেই সব স্থানে উহা দেখা দিতে লাগিল ও উপরের দিকেও রোগ বাড়িতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে, টিংচার আইডিন ও টিংচার ষ্টিল নূতন চর্ম্মের উপর দিয়া অনর্থক শিশুকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তখন আমি আয়ুর্ব্বেদীয় শরণাপন্ন হইলাম। স্থানীয় একজন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট কোন ঔষধ বা তৈল না থাকায় নিজেই পুস্তক দেখিয়া ঔষধ নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিলাম। রোগের লক্ষণ মিলাইয়া উহা পিত্তজ বিসর্প স্থির করিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুতের উপায় দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে রোগের উর্দ্ধগতি দেখিয়া ডাক্তার বাবুকে আবার ডাকিলাম। তিনি বলিলেন যে ইঞ্জেক্‌সনের ঔষধ শীঘ্র আনান হউক। বাথগেটের ওখানে ঔষধের জন্য পত্র দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে এখানকার আমার বন্ধু উকীল শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কার্য্যগতিকে কলিকাতা হইতে আসিলেন ও তাঁহাকে ডাকাইয়া দেখাইলাম তিনি বলিলেন, আমাকে তিনদিন সময় দেন, আমি রোগ কমাইয়া দিতেছি ও ৮ দিনের মধ্যে রোগ উপশম করিয়া কলিকাতা যাইব। ইনি হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সহকারী, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইল। উহার দ্বিতীয় দিনে রক্তবর্ণ স্থান থাকিল দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় বলিলেন,

দেখুন আজ জ্বর কত বেশী হয়, কিন্তু জিতেন্দ্র বাবু বলিলেন ঔষধে ফল ধরিয়াছে। বাহ্য প্রয়োগের দ্বারা উপরের রোগ গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা ভিতরে ছিল বলিয়া পুনঃ প্রকাশ হইল। তাঁহার কথাই ঠিক হইল। জ্বর আর বাড়িল না, টিংচার ষ্টিল ও আইওডিনের জন্য প্রলেপ বন্ধ করায় শিশু অনেকটা সুস্থ থাকিতে লাগিল। পেট কাঁপা কথনও কমিতে লাগিল কথনও বাড়িতে লাগিল, কিন্তু জ্বর কম হইতে লাগিল, তখন ১০০° হইতে ১০২° পর্য্যন্ত জ্বর হয়। সেই সময় শিশুর মাথায় কপালে অনেকগুলি উৎকট বিস্ফোটক বাহির হইয়া তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। আমি ইতিমধ্যে শিশুর মাতাকে "অমৃতাদি কষায়" সেবন করাইতে লাগিলাম। অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটা বিশেষ ভুল হইতে লাগিল যে, স্তন্যপায়ীর শিশুর মাতাকে ঔষধ সেবন করাইতে হয় না। কাজেই তাহা হইতেছিল না। আয়ুর্ব্বেদ মতে যে শিশু কেবল স্তন্য পান করে, অন্য খাদ্য খায় না তাহাকে ঔষধ সেবন না করাইয়া তাহার মাতাকেই শিশুর রোগের ঔষধ সেবন করাইতে হয়। এই নিয়মের জন্য আমি শিশুর মাতাকে অমৃতাদি পাচন সেবন করাইতে লাগিলাম। সাত দিন এই প্রকার সেবন করানয় তাহার কপালে যে সকল বিস্ফোটক হইয়া ছিল, তাহা সমস্ত চুঁইয়া গেল, ও বেদনা বা নূতন স্ফোটক কিছুই থাকিল না। তাহাতেই মনে হইতে লাগিল যে, ঐ পাচন ও স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা শিশুর উপকার হইতেছে ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহায়ক হইতেছে। ইতিমধ্যে আমি করঞ্জ তৈল উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের যুক্তি লইয়া ও তাঁহার সাহায্যে তৈয়ার করিলাম, কিন্তু ক্ষত জ্বরের উপর উহা দিতে সাহস পাইলাম না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সরতোলা দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ করিতে বলিতে ছিলেন, কিন্তু জ্বরের উপর ঠাণ্ডা দিলে অন্য রোগের আশঙ্কায় ভয়ে উহা দিই নাই। তবে ভাবিলাম যে, যে কি অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, যেখানে আয়ুর্ব্বেদমতে মৃণাল প্রয়োগ করিতে হয় হোমিওপ্যাথিক মতে সরতোলা দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েলে দিতে হয়, সে খানে ভীষণ জ্বালাকর টিঞ্চার আয়োডিন দিয়া শিশুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। বিধাতা যেন আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারের জন্যই এই শিশুকে এই ভীষণ রোগ দিয়াছিলেন। অনেক দিন পূর্ব্বে এই সমাচার "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজের অসুখ ও আলস্যে উহা ঘটিয়া উঠে নাই।

যখন রোগ গণ্ডস্থলে পর্য্যন্ত আসিল তখন ডাক্তার মহাশয় ইঞ্জেকশন নর জন্য জিদাজিদি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিলাম যে, দেওঘরে একটী ৭ বৎসরের বালিকাকে ১২টা ইঞ্জেকসান দিয়াও সেখানকার ডাক্তার রোগের বিস্তার ও জ্বর কমাইতে পারেন নাই, তখন ইঞ্জেকসান দিয়া শিশুকে বিপদাপন্ন করিতে পারি না।

যাহা হউক আমিও তখন খুব চিন্তিত হইয়াই যেন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া একটি গণ্ডে করঞ্জ তৈল লাগাইয়া দিলাম। ঐ তৈল লাগানর ২ ঘণ্টা পরে দেখিলাম ঐ গণ্ডের লাল স্থান কাল হইয়াছে ও ফুলাও কমিয়াছে।

তখন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়কে ডাকাইয়া দেখাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ঐ তৈল মাখাইবার অনুমতি চাহিলাম। তিনিও ঐরূপ দেখিয়া আমাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া ভাবিয়া অনুমতি দিলেন। আমি তখন ধন্বন্তরি ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ঐ করঞ্জ তৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলাম। ইহার দুই ঘণ্টা পরে শিশুর শরীরের সমস্ত রক্তবর্ণ স্থান কাল হইয়া গেল ও যে জ্বর ২৭ দিন ছাড়ে নাই, তাহা ছাড়িয়া গেল। উভয় চিকিৎসকই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শিশুর মাতাকে "অমৃতাদি পাচন" সেবন ও শিশুকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ও করঞ্জ তৈল মাখান চলিতে লাগিল। ঐ তৈল মাখানর সময় মধ্যে মধ্যে এক একটা লাল দাগ শরীরের কোন কোন স্থানে বাহির হইতে লাগিল ও সেইখানে কাপড় দিয়া ভিজাইয়া তৈল প্রয়োগে ২।১ ঘণ্টায় উহা লোপ পাইতে লাগিল। তৃতীয়দিনে শরীরের নানাস্থানে ১২।১৩টি ছোট আলুর মত গোল গোল স্ফীতি দেখা গেল। উহা যেমন ২।১টি করিয়া পাকিতে লাগিল, তেমনি ডাক্তার মহাশয় কাটিয়া দিতে লাগিলেন, তাহা হইতে তরল পুঁজ খুব বাহির হইতে লাগিল। জ্বর আর একদিনও হইল না ও শিশু ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল।

অমৃত্তা বৃষ পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণী
খদিরমসিত বেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধ বিষ বিসর্পান কুষ্ঠ বিস্ফোটকণ্ডু,
অপনয়তি মসূরিং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ট, কৃষ্ণবেতের মূল, নিম্বপত্র হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা—সমভাগে ২ তোলা, সর্ব্ব সমেত জল অর্দ্ধসের, পাকশেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কষায় সেবনে বিবিধ বিষ দোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরী শীতপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়।

করঞ্জ তৈলম্।

করঞ্জ সপ্তচ্ছদ লাঙ্গলীক
স্নুহ্যর্ক দুগ্ধানল ভৃঙ্গরাজৈঃ।
তৈলং নিশামূত্র বিষৈর্বিপক্বং
বিসর্প বিস্ফোট বিচর্চ্চিকাঘ্নম্॥

তৈল ৪ সের। কল্ক:——ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, ঈশলাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আটা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও মিঠা বিষ মিলিত ১ সের, গোমূত্র ১৬ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা রোগ নিবারিত হয়।

এই তৈলে এখনকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগেনেয়ী পুত্রের সর্ব্বাঙ্গের একজিমা চর্ম্ম রোগ ভাল হইয়াছে।

শিশুর বিসর্প সারিয়া গেল তাহার পর শিশুর সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি হইল। রংপুরের একজন কবিরাজ মহাশয়ের পরামর্শমত তাঁহার নিকট হইতে বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল আনাইয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে মাখানয় দাগগুলি সারিয়া গেল। তাহার পর মাথায় কতকগুলি ক্ষত দেখা দিল ও তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাহাতে করঞ্জ তৈলে বিশেষ উপকার হইল না। কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, দেখিয়া বলিলেন, উহা এক জিমা অফ্ দি স্ক্যাল্প।

তিনি একটী মলমের ঔষধ লিখিয়া দিলেন। মলমের কয়েকটি ঔষধ এখানে পাওয়া গেল না। মনে করিলাম কলিকাতা হইতে ঔষধটি আনাইব। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানীয় কবিরাজ মহাশয় বলিয়া দিলেন যে, বটের শুষ্ক পত্র পোড়াইয়া সেই ছাই নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সামান্য কর্পূর দিয়া লাগান। আমি তাহাই লাগাইতে লাগিলাম। তাহাতে ঘা শুকাইতে লাগিল। তাহার পর একজন তামাক পোড়া একটু মিশাইয়া দিতে বলিলেন, তাহাও দিলাম। তাহাতে ক্ষত ৭।৮ দিনের মধ্যে শুকাইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক মতে চর্ম্মরোগে মলম দিয়া ক্ষত আরোগ্য করিলে অন্যান্য রোগ হইতে পারে বলে, সেইজন্য সেবনের ঔষধ দিয়া উহা আরোগ্য করিতে হয়, অ্যালোপ্যাথিক মতে মলমে ক্ষত সারানর ব্যবস্থা আছে। শিশুর মাথার ক্ষতে নানা প্রকার ডাক্তারি মলম লাগাইয়া কোন ফলই পাই নাই। সামান্য বট পাতার ভস্মে ক্ষত ভাল হইল।

পরম করুণাময় জগদীশ্বর লোকের ব্যাধিও কষ্টে কাতর হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারে পৃথিবীতে চর রূপে অবতীর্ণ হইয়া চরক নাম ধারণ করিয়া বহু রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার কবে এই দারিদ্র্য দুঃখ প্রপীড়িত ব্যাধি বহুল ক্ষীণদেহ ধারী ভারতবাসীগণের অশেষ মঙ্গলের নিদান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইবে? লোকের রুচি পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন আয়ুর্ব্বেদ ভিষক্‌গণ সাবধান। আজ আপনারা স্বার্থ ত্যাগ করি। যথানিয়মে পবিত্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য কম মূল্যে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

আয়ুর্ব্বেদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান কামনায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ "আয়ুর্ব্বেদে" পাঠাইলাম।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি পাকের প্রকৃত বিধি।

(কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

আপনাদের সম্পাদিত আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায় প্রকাশিত "আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈল পাকবিধি" শীর্ষক প্রবন্ধের মর্ম্ম অবগত হইয়া 'ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের' কথা মনে পড়িল। পূর্ব্বে কোনও বড় সাহিত্যিক কোন অর্দ্ধশিক্ষিত লেখকের রচিত ভ্রম পরিপূর্ণ একখানা পুস্তকের সমালোচনা কালে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলা ভাষাটা যেন ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের মত হইয়াছে, যাহার ইচ্ছা সেই আসিয়া গাছ নাড়া দিতেছে, তাহাকে নিবারণ করিবার বা শাসন করিবার কেহই নাই। আজকাল আয়ুর্ব্বেদের

সংস্কারের কথা শুনিলেই আমাদের সেই মহাকবির ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছের কথা মনে পড়ে। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই আয়ুর্ব্বেদের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া তাহার সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছেন, আয়ুর্ব্বেদের কতকগুলি চিরন্তন প্রথাকে কুসংস্কার প্রক্ষিপ্ত ভ্রম পরিপূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন পূর্ব্বক সেই সকল দোষ বর্জ্জন করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ-হিতার্থী গণকে অনুরোধ করিতেছেন।

আজ আয়ুর্ব্বেদে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটী লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রবন্ধের প্রতি অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়গণের কিছু দৃষ্টি পড়া উচিত ছিল, যে হেতু তাঁহারা সকলেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং আয়ুর্ব্বেদের সংস্কারের জন্য তাঁহারাই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রবন্ধটী পড়িয়া আমিও সকলের মত নীরব থাকিতাম, কিন্তু প্রবন্ধলেখক পরের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাচীন বৈদ্যদিগের ঔষধে যথেচ্ছচারিতা ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রচলিত বৃদ্ধ বৈদ্য পরম্পরায় আগত কতকগুলি ঔষধ পাকের বিধিকেও অবিধি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া সেই মতের সমর্থন জন্য রাজসাহী নিবাসী পূজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সেই পত্রের লিখিত বাক্যই অপ্তোপদেশ স্বরূপ জানিয়া প্রাচীন বৈদ্যগণ যে ভ্রান্ত ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পত্র পড়িয়া মনে হয় না যে, উহা উক্ত চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়, লিখিতে পারেন, কারণ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আলাপ না থাকিলেও পরম্পরায় শুনিয়াছি, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শিবাবতার গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র বলিয়াতাঁহার উপর অনেকের শ্রদ্ধা আছে। যে বিধি নিয়ম পূজ্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—সেই বিধি তিনি অমান্য করিয়াছেন বা শাস্ত্রে দেখিতে পান নাই—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? যাহা হউক উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের পত্রের জন্যই প্রবন্ধের উপর কিছু লিখিতে বাধ্য হইতে হইল।

লেখক ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে "তৈলাদির পাক বিধি" লইয়া কি লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখি নাই, সকল সময় আয়ুর্ব্বেদ পত্র পড়িবার আমার সৌভাগ্য হয় না, তাহা হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ ও চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়ের পত্র হইতে তাহার সার মর্ম্ম বুঝা যায়।

পূজনীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রে আছে, "তৈলের মূর্চ্ছা ও দগ্ধপাকের কোন বিধি আছে বলিয়া জানি না, অর্থাৎ উহা শাস্ত্রীয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। প্রাচীন বৈদ্যগণ সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য গন্ধপাক দিয়া থাকেন, মুর্চ্ছপাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন, উপরোক্ত পত্র হইতে সংকৃত সমালোচনার কতকগুলি বিষয়ে সমর্থন সূচীত হইতেছে যথা:—

১। ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছাবিধি ও তৈলের গন্ধপাক বিধি প্রাচীন নহে। উহা আধুনিক, প্রক্ষিপ্ত ও অশাস্ত্রীয়।

২। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকে, তৈল সুগন্ধ ও অরুণ বর্ণ উৎপাদনে বিলাস পরায়ণ রাজা

মহারাজা এবং সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কোন প্রাচীন বৈদ্য কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং কালক্রমে চিকিৎসক সমাজে উহা এতদূর বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। উপরোক্ত পত্র হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

৩। "মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়, এই উক্তি হইতে পক্ষান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না কি যে, স্নেহের আমদোষ কল্পনা অস্বীকার্য্য এবং সর্ব্বত্র মূর্চ্ছাপাকের জন্য অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপমাত্র।

৪। উপরোক্ত পত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহের গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা তাহা কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং ঘৃতের মূর্চ্ছা বিধিতে লিখিত "বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ী" এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দাঁড়ায় নাকি?

৫। তিল তৈলে গন্ধপাকে ক্ষেত্র বিশেষে গুণহানি হইতে পারে—একথাও স্বীকার্য্য।

প্রবন্ধের স্থানান্তরে আছে "আরও আমার পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক, এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি প্রাচীন, যেহেতু তিনি চরক সুশ্রুতের কথা দূরে থাকুক কিঞ্চিৎ আধুনিক বাগ্‌ভট্টাচার্য্য, চক্রপাণিদত্ত, শার্ঙ্গধর, শ্রীমিশ্রভাব প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের প্রস্তুত ঘৃত তৈলাদিতেও মূর্চ্ছাদি পাকবিধি দেখিতে পান নাই।

বঙ্গবাসীর ছাপা যশোদানন্দ সরকারের অনুবাদ সম্বলিত চরকের অনুবাদে কল্পস্থানের ১২ অধ্যায়ে অনুবাদক বলিয়াছেন যে, "তৈলাদিতে মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক চরকমত সিদ্ধ নহে"। ঐ অনুবাদ পড়িয়াই সম্ভবতঃ প্রবন্ধ লেখক মহাশয় তৈলাদির মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক শাস্ত্রীয় নহে বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

তৈলাদির মূর্চ্ছাপাক শাস্ত্রীয় কিনা—প্রথমতঃ তাহারই সামান্য অনুসন্ধান করা যাউক। তৈলাদির মূর্চ্ছাপাক বিধি অধুনা প্রচলিত চরক, সুশ্রুত, শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত নাই, তবে উহা সমস্ত চিকিৎসক সম্প্রদায়ে স্বীকৃত কেন? তবে কি বাস্তবিকই উহা চক্রবর্ত্তী কবিরাজ মহাশয়ের মত সিদ্ধ তৈলের ভাল বর্ণ ও সদ্‌গন্ধের দ্বারা বড়লোকের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়া প্রাচীন বৈদ্যগণ টাকাকড়ি কিছু বেশী পাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন? না কিছু মৌলিকতা আছে? প্রাচীন স্পৃহাশূন্য ঋষিকল্প বৈদ্যদিগের উপর এইরূপ দোষারোপ অন্ততঃ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র পূজনীয় হারাণ কবিরাজ মহোদয় কিরূপে করিলেন? আমার পিতামহ স্বর্গীয় কবিরাজ ৺গয়ানাথ সেন এবং পিতৃদেব কবিরাজ ৺কেদারনাথ সেনও গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেবের মুখে এবং যাঁহারা উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের মুখেও ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের তেজস্বীতা ও নিঃস্পৃহতার কথা শুনিয়াছি। বড় লোকের তুষ্টির কথা দূরে থাকুক, চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইলে নবাব মহারাজকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন। বড়লোক হইবার জন্য ধনের কামনায়

কখনও নিজ তেজস্বিতা ত্যাগ করেন নাই। আমার পিতামহও বড়লোকের স্বেচ্ছা প্রদত্ত ও অধিক অর্থাদি গ্রহণ করিতেন না; কেবল বৃত্তির জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই গ্রহণ করিতেন। এখনও বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান জেলার বহু বড় লোকই তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর সেই পুরাকালের বৃদ্ধবৈদ্যগণ কেবল বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্যই অশাস্ত্রীয় হইলেও বর্ণ ও গন্ধের জন্য তৈলে মূর্চ্ছাদি পাক বিধান করিয়াছিলেন, ইহা একবার চিন্তা করাও কি অপরাধ বলিয়া মনে করা উচিত নহে?

মূর্চ্ছা পাক শাস্ত্রীয় বিধান কিনা, ইহার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যথা—অধুনা প্রচলিত সুশ্রুত ও চরক সংহিতায় যাহা আছে, তাহাই ঔষধাদির পাক, প্রয়োগ, শোধন, সংস্কারাদি বিষয়ে যথেষ্ট, না ঐ সংহিতা দ্বয়ের সূক্ষ্মার্থ, সন্দিগ্ধার্থ, লেশোক্ত ও অনুক্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য বা ব্যবহারের জন্য অন্য পুস্তকের ও পরিভাষায় সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়? যদি কেহ বলেন চরক সুশ্রুতে যে পরিভাষা আছে, তাহাই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমুদায় ঔষধাদির পাক, শোধন, সংস্কারাদি বিষয়ে যথেষ্ট, তবে তাঁহাকে চরকের কল্পস্থলের শেষ অধ্যায়ের লিখিত কয়টি পরিভাষা, এবং সুশ্রুতের স্নেহবিধি কল্পনাধ্যায়ে লিখিত কয়টি পরিভাষা দেখিতে অনুরোধ করি। উক্ত পরিভাষা অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার দ্বারা চরক সুশ্রুতের সমস্ত তৈল, ঘৃতও পাক করা যায় না, অন্যান্য ঔষধের কথা দূরে থাকুক। এই বিষয়টী একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যথা সুশ্রুতের মহাবলা তৈল, চক্রদত্তের বাতব্যাধি চিকিৎসায় লিখিত আছে।

সুশ্রুতে ঐ তৈল কত পরিমাণে পাক করিবে তাহার উল্লেখ নাই, এই জন্য টীকাকার লিখিতেছেন, তৈলক্ষমান বিশেষা নির্দ্দেশাৎ প্রস্থপরিমিতমেব গ্রাহ্যং যথা অনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানাং তৈলানাং প্রস্থ ইষ্যতে" এই পরিভাষা অবলম্বন করিয়াই টীকাকার উক্তমত প্রকাশ করিলেন কিন্তু ঐরূপ পরিভাষা সংহিতাদ্বয়ে বা চক্রদত্তে নাই।

> কৃৎস্নে বৃষে তৎকুসুমৈশ্চ মিদং
> সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
> যস্মাৎ সেতৎ প্রবলং চ কাসং
> শ্বাসং চ হন্যাদপি পাণ্ডুতাং চ। ইতি
> সুশ্রুত।

বাসাং সশাখাং সফলং সমূলাং ইত্যাদি (চরক) বাসাদ্য ঘৃত।

এই ঘৃতে বাসকের সমূল পত্র শাখা অঙ্কুর প্রভৃতির কাথ ও বাসকের পুষ্প কল্ক দ্বারা পাক করিতে হয়। এস্থলে কত পুষ্প কল্কে লইতে হইবে। "কল্কস্তু স্নেহপাদিকর" এই সংহিতা দ্বয়ের মতানুসারে স্নেহের চতুর্থাংশ, না

> শনস্য কোবিদারস্য বৃষস্য চ পৃথক্ পৃথক্,
> কল্কাদ্যাত্তাৎ পুষ্প কল্কং প্রস্থে পল চতুষ্টয়ং॥

এই পরিভাষানুসারে স্নেহের অষ্টমাংশ? উক্ত পরিভাষানুসারে অষ্টমাংশই চক্রদত্ত প্রভৃতি সম্মত ও বৈদ্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত। উক্ত পরিভাষাও চরকাদিতে নাই।

চরকের চিকিৎসিত স্থানে ১৯ অধ্যায়ের

পঞ্চমূলাভয়া ব্যোষ বিড়ঙ্গ শঠীভির্ঘৃতং।
শুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ॥
শুষ্কমূলক কোলাম্বু চুক্রিকা দাড়িমস্য চ।
তক্রমস্তু সুরামন্ড সৌবীরক তুষোদকৈঃ।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পক্বং মগ্নিদীপ্তিকরং পরং॥

ইত্যাদি পঞ্চমূল্যাদি ঘৃত ও—

"সিদ্ধমভ্যঞ্জনার্থঞ্চ তৈলমেতৈঃ প্রয়োজয়েৎ" ইতি পঞ্চমূল্যাদি তৈলের উক্তি আছে।

এই তৈল বা ঘৃত, পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও শঠী এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক, শুষ্কমূলা কুল, বালা, আমরুল ও দাড়িমের কাথ, শুক্ত, মাতুলুঙ্গের রস, আদার রস, তক্র মস্তু, সুরামণ্ড সৌবীরক, তুষোদক ও কাঁজি এই সমস্ত দ্রব দ্রব্য দিয়া পাক করিতে হইবে। এস্থলে দ্রব দ্রব্য দশ প্রকার, (মতান্তরে তক্রাদি তুষোদক পর্য্যন্ত মিলিত দ্রব ১ ভাগ, সেই মতেও ছয় প্রকার)।

এই ঘৃত ও তৈল চরক সুশ্রুতের কোন্ পরিভাষা মতে পাক করিতে হইবে? "স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণং" এই মতে কাথ ও অন্যান্য সমস্ত দ্রব দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে? না চক্রদত্ত প্রভৃতি স্বীকৃত সর্ব্ববাদিসম্মত পঞ্চ প্রভৃতি

যত্র স্যু র্দ্রবানি স্নেহ সংবিধৌ।
তত্র স্নেহ সমান্যাহু রর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণং।

এই মতে প্রত্যেক দ্রব পদার্থ স্নেহের সমান লইতে হইবে। স্নেহের সমান হইলে চরক সুশ্রুতোক্ত চতুর্গুণ দ্রব দ্রব্য দ্বারা স্নেহের পাক হইয়া দশ গুণ, বা ষষ্ঠ গুণ দ্বারা পাক হয়।

যেস্থলে তিনের অধিক চার, পাঁচ, ছয় বা দশটী দ্রব দ্রব্যের দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হয়, সেই স্থলেই দ্রব দ্রব্য স্নেহের সমান লইতে হয়। সম্প্রদায় পরম্পরায় বৈদ্য সমাজে ঐ ভাবে পাকই প্রচলিত, ঋষি কথা চক্রদত্ত প্রভৃতি দ্বারাও ইহা স্বীকৃত।

কিন্তু "পঞ্চ প্রভৃতি যত্রস্যু" ইত্যাদি পরিভাষা চরক সুশ্রুতে নাই। আর একটী বিশেষ উদাহরণের দিকে পাঠকগণ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে প্রচলিত চরক সুশ্রুতের ঔষধের জন্য অপর পুস্তকের আশ্রয় না করিলে চলিতেই পারে না। চরকে হিক্কা শ্বাস চিকিৎসিতাধ্যায়ে মুক্তাদ্য চূর্ণ নামে একটী ঔষধ আছে। তাহাতে মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য শঙ্খ, স্ফটিক, রসাঞ্জন, কাচ, গন্ধক, তামা, লোহ, রৌপ্য এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আছে। এইরূপ চরক সুশ্রুতের বহু ঔষধে স্বর্ণাদি, হরিতাল, মনঃশিলা, সীসক, রসাঞ্জন তুঁতিয়া প্রভৃতির প্রয়োগ আছে, ঐসকল দ্রব্যের শোধন ও মারণাদি ক্রিয়া করিয়াই ঔষধে প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাতে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ নাই। যেহেতু শোধানাদি না করিয়া প্রয়োগ করিলে সে ঔষধ প্রাণ রক্ষক না হইয়া বিষবৎ প্রাণনাশক হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকলের মিশ্রণই সম্ভব হইবে না। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে সকলগুলির শোধন সংস্কার, মারণাদি ক্রিয়া চরক-সুশ্রুতে এমন কি চক্রদত্তেও নাই, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে ঐ সকল দ্রব্যের শোধানাদি ক্রিয়া অবগত হইয়া তদনুযায়ী শোধনাদি সংস্কারের পর ঔষধার্থ প্রয়োগ করা হয়। সেই সকল

শোধনাদি ক্রিয়াও বৈদ্য সম্প্রদায় ভেদে নানাপ্রকারে প্রচলিত আছে। অনেক সম্প্রদায় ঐ শোধনাদি, ক্রিয়ার মূল পুস্তক দেখাইতে না পারিলেও প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বৃদ্ধ পরম্পরা ক্রমে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সেগুলিও কাহারও মনগড়া নয়, তাহারও মূলে কোন শাস্ত্র ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কালচক্রে সে সকল শাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে চরক, সুশ্রুত, সংগ্রহ শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত, ভাব প্রকাশে স্পষ্টতর না থাকিলেই যে তৈলাদিতে মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাক অশাস্ত্রীয় হইয়া যাইবে, বড় লোকের মনস্তুষ্টির জন্য বৃদ্ধ বৈদ্যদের কল্পিত হইবে, ইহার প্রমাণ কি? ইদানীং যে চরক সুশ্রুত প্রচলিত আছে, ইহা ও মূলগ্রন্থ নহে। চরক সংহিতার কিয়দংশ চরকের, কিয়দংশ দৃঢ়বলের সংস্কৃত, সুশ্রুত নাগার্জ্জুনের সংস্কৃত। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা বা সুশ্রুত সংহিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই বলিয়া কি প্রচলিত চরক সুশ্রুতেও অবিশ্বাস করিব?

এখন বিচারক পাঠকগণ দেখুন অপ্রাচীন চরক সুশ্রুত ও লেখকের মতে কিঞ্চিৎ আধুনিক চক্রদত্তের লিখিত বহু ঔষধের প্রস্তুত নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্রের পরিভাষা তুত্থে, হরিতাল বৈদূর্য্যাদি দ্রব্যের শোধন সংস্কারে মারণাদির জন্য অপর গ্রন্থ মানিয়াও চলিতে হয়, সেই সকল মূল শাস্ত্র দৈব দুর্ব্বিপাকে অন্তর্হিত হইয়া গেলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ সেই শাস্ত্রই শ্রুতি পরম্পরায় স্মরণ রাখিয়া পরে সংগ্রহ রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, পরিভাষা সংগ্রহকারদিগের সময়েও দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া সংহিতা দ্বয়ে অনুক্ত নূতন নূতন ভাবে দ্রব্যের শোধনাদি সংস্কার, ও কোন পারিপাটী ক্রমে করিলে ঔষধের বীর্য্য অধিক হইবে এরূপ সংস্কার করিবার বহু বৈদ্য ছিল। চক্রদত্তে বহু ঔষধ ও পাচন আছে যাহা দৃষ্টফল সেগুলি প্রচলিত সংহিতাদ্বয়ে না থাকিলে এবং সেই সকল ঔষধের প্রকাশক বা তৎ তৎ মূল, গ্রন্থ না পাইলেই কি মনে করিতে হইবে যে ঐ সমস্ত ও প্রক্ষিপ্ত?

চরক সুশ্রুত নিজের উপরই সমস্ত ভার লইয়া ছিলেন, না

(সুশ্রুত)

একং শাস্ত্র মধীয়ানো ন বিদ্যা চ্ছাস্ত্র নিশ্চয়ং
তস্মাৎ বহুশ্রুত শাস্ত্রং বিজানীয়া চিকিৎসকঃ॥

"তথাদনন্তি সংক্ষেপনে অনতি বিস্তরেণ চোদিষ্টাং
এতাবন্তো হি অল্পবুদ্ধিনাং ব্যবহারায়। বুদ্ধিমতাঞ্চ স্বালক্ষণ্যানুমান যুক্তি কুশলানাং অনুক্তার্থ জ্ঞানায়' (চরক) বলিয়া অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও যথাযথ সার সঙ্কিদ্ধার্থ অনুক্তার্থের বিবরণ জানিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক যেমন পরিভাষাকর ও বৃদ্ধ বৈদ্যগণকে বড়লোকের স্তাবক, অজ্ঞ মনে করিয়াছেন, চরক প্রভৃতি ও তেমনই।

"ঔষধিং নামরূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে
অবিধাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ

বলিয়া ছাগল ভেড়ার রাখালদের নিকট ও চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ সম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য উপদেশ লইতে বলিয়াছেন।

চরকাদিতে না থাকিলে ও যেমন বহু বিষয় আমাদিগকে সম্প্রদায় ক্রমে প্রচলিত ও

প্রসিদ্ধফল বলিয়া মানিতে হইতে বাধ্য হইতে হইতে হয় সেইরূপ চরক-সুশ্রুত,—এমনকি চক্রদত্তাদিতে না থাকিলেও তৈলাদি মূর্চ্ছা-পাকেও বহু তৈলে গন্ধপাক বা ভাল বর্ণের জন্যই মূর্চ্ছাগ্নির পাক বিধান করেন নাই। (এখানে আরও একটু বলিয়া রাখি, পরিভাষাকার সংগ্রাহক মাত্র, প্রাচীন ঋষি প্রণীত গ্রন্থেরই মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) যদি কেবল গন্ধ ও বর্ণের জন্যই মূর্চ্ছাদি পাক বিধান করিতেন, তবে তিলতৈল, সরিষারতৈল, এরণ্ডতৈল প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দিয়া মূর্চ্ছাপাকের ব্যবস্থা করিবেন কেন? ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা মূর্চ্ছাপাকের বিধান করায় ইহাও কি প্রমাণ হয় না যে, প্রত্যেক তৈলেরই বিভিন্ন বিভিন্ন দোষ গুণ আছে, যাহার জন্য একরূপ দ্রব্য দ্বারা সকল তৈলের শোধন সংস্কার এবং আনুষঙ্গিক বর্ণও সম্পন্ন হইতে পারেনা; সেই সকল স্বাভাবিক দোষ দূর করাই মূর্চ্ছাপাকের প্রধান কার্য্য। শোধনের জন্যই সকল ক্রিয়ার প্রথমেই তৈলে মূর্চ্ছাপাক করিতে হয়। কেবল বর্ণ ভাল গন্ধের জন্য ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইলে ক্কাথ ও কল্কাদি পাকক্রিয়ার পরেই উহা করা উচিত ছিল। নতুবা প্রথমে মূর্চ্ছা পাক করিলে এবং অপরাপর দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যের ক্কাথ ও কল্কাদিয়া পরে তৈলের পাক হইলে তৈল সেই সেই ক্কাথ ও কল্ক দ্রব্যের গন্ধ-বর্ণই পাইবে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। তাহাতে প্রথম পক্ক মূর্চ্ছা দ্রব্যের গন্ধ বর্ণ থাকিতে পারে না। তিল তৈল মূর্চ্ছা বিধির শেষ পাদে।

"দুর্গন্ধং বিনিহত্যা তৈলমরুণং সদ্‌গন্ধমা-কুর্ব্বতে"—এই অংশটী দেখিয়া মূর্চ্ছাপাকে কেবল তৈলের বর্ণ ভাল হয় বা সদ্‌গন্ধযুক্ত হয়, আর কোনরূপ শোধন সংস্কার ইহার মূলে নাই এরূপ কল্পনা কত দূর সঙ্গত তাহা যাঁহারা প্রাচীন বৈদ্যদিগের মতানুসারে মূর্চ্ছাদি পাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন বা ঐরূপ তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারই বিচার করিয়া দেখিবেন। কবিরাজী তৈলের মধ্যে কোনটী দেখিতে মনোহর বা অরুণ সৌগন্ধযুক্ত, যাহার জন্য জবাকুসুম তৈলের মত ইহার বিক্রয় বা বহুলোকের মনস্তুষ্টি হইতে পারে? শ্রীগোপাল প্রভৃতি তৈলে কস্তুরী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য দিয়াও ইহার মনোহর গন্ধ বাহির করিতে পারা যায় নাই। কলিকাতায় ব্যবসা

ক্রমশঃ

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও পাচন চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী বিদ্যারত্ন।)

অনেক সময় দেখা যায় যে, নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সামান্য একটী মুষ্টিযোগ রোগের সমতা হইয়া থাকে। এরূপ সামান্য সামান্য

মুষ্টিযোগ জানা থাকিলে কার্য্যকালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তা' বলিয়া যা'র তা'র নিকট শ্রুত এবং বিশেষরূপে অপরীক্ষিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ যে মুষ্টিযোগে যাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছে—তাহার কি প্রকৃতির রোগ হইয়াছিল, তাহা বিশেষ জানিয়া তবে নিজে বা অপরের শরীরে সেই ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক স্থলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণে বিশেষতঃ প্রাচীনা স্ত্রীলোকগণ শত শত স্থলে পরীক্ষিত নানাবিধ মুষ্টি-যোগ জানিতেন এবং ছেলে মেয়েদের সামান্য সামান্য রোগে নিজেরাই চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাড়া জ্ঞান এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, অধুনা অনেক শিক্ষিতাভিমানী কবিরাজদের তাহা নাই। সেরূপ স্ত্রীলোক বা পুরুষ আজকাল যে একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে, কিন্তু যেরূপ সময়ের স্রোত পড়িয়াছে, তাহাতে কালে এরূপ দুই একজনও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। যাহাতে আবার প্রসূতিগণ আপন ছেলে মেয়েদিগকে সামান্য সামান্য রোগে মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি দ্বারা সুস্থ করিতে পারেন, সদা অসচ্ছল ও দুঃখময় সংসারে সকলেই যাহাতে কথঞ্চিৎ শান্ত সুখ আনয়ন করিতে পারেন—তজ্জন্য আমাদের এই উদ্যোগ, এখানকার শিক্ষাব্রত হৃদয় অবশ্যই ইহা স্থান পাইবে আশা করি।

জ্বর,—(১) মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল শিরঃপীড়া ও শিরশ্চালন থাকিলে—সোরা ও নিশাদল জলে ভিজাইয়া সেই জলসিক্ত বস্ত্র দ্বারা মগে ও ব্রহ্ম তালুতে পটী দিবে, শিরঃপীড়া প্রভৃতির শান্তি হইলে আর জল দিবার প্রয়োজন নাই। (২) কনক চাঁপার ফুল কাঁজির সহিত বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে জ্বরকালীন মস্তক বেদনা প্রশমিত হয়, (৩) কৃষ্ণ জীরা বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিলে ক্ষণকাল মধ্যে মস্তক বেদনা নিবৃত্তি হয়। (৪) নারিকেল পুষ্প, দারু চিনি ও লবঙ্গ এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া কপালের দুই ধারে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তক বেদনা প্রশমিত হয়, (৫) সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের পক্ক বীজ বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়, (৬) যন্ত্রণা দায়ক মাথার কামড়ানি উপস্থিত হইলে কুড় কাষ্ঠ জলের সহিত উত্তমরূপে চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া কপাল জুড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

জ্বরে পিপাসাদমনোপায়—(১) আম ও জামের কচি পাতা, বটের শুঁয়া ও বেণার মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ওজনে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া আধ সের গরম জলে ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল অল্প চিনি সংযুক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি এবং জ্বরাবস্থায় বমন, অতিসার ও মূর্চ্ছায় বিশেষ উপকার দর্শে। (২) মরিচ, যষ্টিমধু পেয়ারার কচি পাতা ও গঁদির ফুল প্রত্যেক আধ তোলা, অল্প ছেঁচিয়া এক পোয়া জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় এবং বমনে ও বিশেষ উপকার দর্শে, (৩) এক কাচ্চা

পরিমাণ ধনিয়া ও মৌরী অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া এক পোয়া গরম জলে ২ ঘণ্টা কাল, ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে ছাঁকিয়া ঐ জল পিপাসার সময় মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। (৪) অর্দ্ধ সের পরিমিত শীতল জলে ১ বা ২ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। (৫) যষ্টিমধু ১ তোলা, মৌরী এক তোলা পাক জন্য জল ⁄৪ সের শেষ ⁄২ সের, থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে পান করাইলে পিপাসার শান্তি, উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রবেরও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (৬) কুড়, বটাঙ্কুর ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলেও পিপাসার শান্তি হয়।

জ্বরে বমন ও রক্ত বমন প্রশমনে—(১) ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম নারী—দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমি অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (২) দুই আনা পরিমাণ শশা।বিচির শাস—নারী দুগ্ধের দ্বারা বাটিয়া আলতা গোলা জলের সহিত পান করাইলে বমি প্রশমিত হয়। (৩) খৈ ৫ তোলা, মিছরী ২॥০ তোলা— এক পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, মিছরী গলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহাতে লেবুর রস এবং কিঞ্চিৎ গোলাপ জল দিয়া পান করিতে দিলে উপস্থিত বমন প্রশমিত হয়। (৪) সংবৎসরাতীত তেঁতুল ২ তোলা লইয়া একটী গোলক বাঁধিবে, কোন প্রস্তর বা কাঁচ পাত্রে সেই গোলক রাখিয়া তাহাতে এক পোয়া জল দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে, যখন দেখিবে যে জল রঞ্জিত হইয়াছে, তখন উক্ত গোলক উঠাইয়া সেই জল অম্ল মধুর হয়—এরূপ উপযোগী ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিতে দিবে, ইহাতে প্রায় সর্ব্বপ্রকার বমন নিবৃত্তি হয়। (৫) মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি, শশাবীজের শাঁস দুই আনা, কর্পূর অর্দ্ধ রতি, আলতা গোলা দুগ্ধ ৪ তোলা, একত্র পান করিলে পিত্ত, বাতপিত্ত এবং সন্নিপাত জ্বরে লাক্ষনিক ও ঔপদ্রবিক বমন প্রশমিত হয়। (৬) যষ্টিমধু ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা—উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে পেষন করিয়া বার তোলা তণ্ডুলোদকে ভিজাইয়া রাখিবে, কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া প্রয়োগ করিলে নানাপ্রকার বমন প্রশমিত হয়। (৭) বন্ধা দুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন ঘসিয়া সেই ঘসা ২ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ দুই আনা, একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৮ তোলা বন্ধা দুগ্ধে ককিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। (৮) পাকা যজ্ঞ ডুম্বুর ৫।৬টা, ছোট আলতার পাত ৫।৬ খান, বন্ধা দুগ্ধ ৮ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। (৯) অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল আগুনে পোড়াইয়া পরিষ্কার জলে ফেলাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে, শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বমন প্রশমিত হয় এবং হিক্কাও নিবারিত হইয়া থাকে। (১০) অর্দ্ধ রতি লৌহ ভস্ম অর্দ্ধ ছটাক থোড়ের রসে গুলিয়া পান করিতে দিলে বমন নিবারিত হয়। (১১) খৈ ৫ তোলা, কাঁচা নিমের পাতা এক কাঁচ্চা, এক পোয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ৩।৪ বার পান করিলে বমি নিবারণ হয়। (১২) বড় এলাইচ—গোবরের মধ্যে পুরিয়া দগ্ধ করিবে, পরে তাহার চূর্ণ মধুসহ

সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়। (১৩) আতপ চাউল এক মুঠা ধৌত করা মুথা ১০।১৫টা, শশা বীজের শাস ১০।১৫টা, জায় ফল সিকি ভাগ (সিকি খানা) এক পোয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া রাখিয়া দিবে, ইহাতে বমি নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আধ ছটাক পরিমাণে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

জর গাত্র দাহ নিবারণোপয়,—(১) পলাশ বৃক্ষের কোমল পত্র কাঁজি দ্বারা বাটিয়া দাহ পীড়িত ব্যক্তির মস্তকে (মস্তকের চুল ফেলিয়া) প্রলেপ দিলে গাত্র জ্বালা প্রশমিত হয়। (২) ভূমিকুষ্মাণ্ড, সরস দাড়িম্বের বীজ, লোধ, কয়েদ বেলের শাঁস এবং ছোলঙ্গ লেবুর কেশর—এই সমস্ত দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া দাড়িম্বের রসের সহিত অথবা জলের সহিত বাটিয়া (মস্তকের চুল ফেলিয়া) মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্র দাহ প্রশমিত হয়। (৩) জরে অতিরিক্ত গাত্র দাহ থাকিলে বেশী পরিমাণে কাঁচা নিমপাতা বিছানায় পাতিয়া তাহার উপর রোগীকে শয়ন করাইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাত্র জ্বালা প্রশমিত হয়। (৪) পিত্তজ্বরে অত্যন্ত দাহ থাকিলে কাঁজি দ্বারা বস্ত্র আদ্র করিয়া শরীর অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নিবৃত্তি হয় (৫) কুলের কচিপাতা প্রথমতঃ অম্ল কাঁজির সহিত বাটিয়া অধিক পরিমাণে কাঁজির সহিত মন্থন করিতে থাকিবে, মন্থন করিলে যে ফেনা উঠিবে সেই ফেনা গাত্রে মালিস করিলে গাত্র জ্বালার শান্তি হয়। উপরোক্ত নিয়মানুসারে নিম পত্রের ফেনা গাত্রে মালিস করিলে গাত্র দাহ প্রশমিত হয়। (৬) জরে অত্যন্ত দাহ ও বহির্দাহ থাকিলে ধনে ২ তোলা কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে, পরদিন ছাঁকিয়া অর্দ্ধতোলা ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিতে দিবে। সর্ব্বপ্রকার দাহ প্রশমনার্থ ইহা মহৌষধের মধ্যে পরিগণিত। (৭) তেলাকুচার পাতার রসের সঙ্গে অল্প ভাজা যোয়ানের গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া হাতের ও পায়ের তলে মালিস করিলে হাত ও পা জ্বালা নিবারণ হয়। (৮) দাহ যুক্ত জ্বরিত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাভির উপর তামার, কাঁসার, বা পিতলের একটা বড় বাটী স্থাপন করিয়া পুনঃরপি ধারা দিবে। পাত্রটী পূর্ণ হইলে জল পরিত্যাগ করিয়া পুনরপি ধারা দিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দাহ নিবারণ হয়। ইহার দ্বারা হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে।

জরের মুখে দুর্গন্ধ নিবারণোপায়।—(১) আদার রস দ্বারা কয়েক বার কুলকুচা করিলে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয় ও মুখ পরিষ্কার হয়। (২) শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া বাটিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ ও জল সহযোগে কুলকুচা করিলে মুখের দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্ম লিপ্ততা দূরীভূত হইয়া থাকে।

জরে হিক্কানিবারণোপায়।—(১) মকরধ্বজ অর্দ্ধরতি, মৃগনাভি ১ রতি, কর্পূর ১ রতি সহ মিশ্রিত করিয়া লাটয়ের আঁকড়ার রস দিয়া সেবন করাইলে হিক্কা নিবারণ হয়। একবার প্রয়োগে ফল না দর্শিলে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। এই যোগ বিকারেও বটে। (২) মরিচের ধূম অথবা তাম্বূল

কোন তীক্ষ্ণ ধুম নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা নিবৃত্তি পায়। (৩) পেটে ভাতের পুল্‌টিস্ দিলেও হিকাশান্তি হয়। (৪) ডুমুরেকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল আধঘণ্টা অন্তর আধছটাক পরিমাণে ৩।৪ বার সেবন করাইলে নিশ্চয়ই হিকার শান্তি হইয়া থাকে। (৫) হিং ও মাসকলাই নির্ধুম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধুম পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। (৬) চিনি ও মরিচ মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

জ্বরে শ্বাস নিবারণোপায়,—(১) বহেড়ার বীজের শাঁস ৫ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি মধু যোগে সেবন করাইলে শ্বাসের শান্তি হইয়া থাকে, (২) ময়ুর পুচ্ছ ভস্ম ৩ রতি, পিপুল চূর্ণ ৩ রতি একত্র মধুর সহিত লেহন করাইলে শ্বাস প্রশমিত হয়, (৩) যোয়ান চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ এবং আকরকরা বচ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের মুখ কাটিয়া বীজ ফেলিয়া দিবে এবং তাহার মধ্যে ঐ মিশ্রিত চূর্ণ আল্‌গা ভাবে পুরিয়া মুখটির দ্বারা বন্ধ করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিবে, তৎপরে কাদা দিয়া লেপিয়া ঘুঁটিয়ার আগুনে পোড়াইবে, লেপ শুষ্ক হইলেই তুলিয়া লইবে, শীতল হইলে খুলিলে দেখা যাইবে ধুতুরার রসে চূর্ণগুলি কাদার ন্যায় হইয়াছে, তখন বাহির করিয়া মর্দ্দনের পর ২।৩ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। দিবসে ৩।৪ বটী গরম জলের সঙ্গে সেবন করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা সহজে নিঃসৃত হয় তজ্জন্য শ্বাস কাস রোগেও উপকার হয়। (৩) কাবাব চিনি চূর্ণ ২ রতি, কর্পূর আধরতি একত্র মধুর সহিত লেহন করিলে কাস নষ্ট হয়। (৪) পানের রস ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ রতি ও মধু এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কাস নিবারিত হইয়া থাকে, (৫। পান, কালতুলসীর পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া রস গ্রহণ করিবে, সেই রস ২ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ২ রতি এবং কর্পূর আধরতি একত্র মিশাইয়া পান করাইলে কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। (৬) ব্যাকুড় গাছের সরু শিকড় বা বড় বড় শিকড়ের ছাল, গাছের পাতা, ছাল, ফল এবং ফুল এক সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল দিয়া উত্তমরূপে ছেঁচিবে, সেই ছেঁচা দ্রব্য কলা পাতায় বাঁধিয়া আগুনে তপ্তকরতঃ ২ তোলা রস গ্রহণ করিবে, উহার আধতোলা মধু মিশাইয়া সেবন করাইলে কাসে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বরে হৃদ্‌ব্যথা প্রশমনোপায়।—(১) বুড়ি পানের রসে লবণ সংযোগ করিয়া মর্দ্দন করিলে হৃদ্‌ব্যথার শান্তি হয়। (২) রস সিন্দুর উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকাঞ্চনের রসে মর্দ্দন করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে উক্ত প্রকারের ব্যথা নিবৃত্তি হয়, শুষ্যমান প্রলেপ উষ্ণ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে। (৩) কর্পূর চূর্ণ দশ আনা, সর্ষপ তৈল অর্দ্ধ ছটাক এবং সর্ষপ চূর্ণ পাঁচ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল দর্শে। (৪) পুরাতন ঘৃত ও আদার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর চূর্ণ সহ ফেনাইয়া বেদনা স্থানে মর্দ্দন

করতঃ তদুপরি আকন্দের পাতা তপ্ত করিয়া বেঁধে দিলে হৃদ্‌ব্যথা শান্তি হয়। (৩) পালিধা মাদারের বীজ চূর্ণ, সর্ষপ তৈল, আদার রস ও কর্পূর চূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রতপ্ত করতঃ বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

ক্রমশঃ

ফাগুনে হাওয়া।

(শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,)

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় প্রায়ই লোকের অসুখ হয়। শীতের আরম্ভ ও অবসান এই দুইটি সন্ধিস্থল প্রীতিকর ও আরামদায়ক হইলেও কতকগুলি রোগের আকর। ছয়মাস লোকে খোলা গায়ে হাওয়া লাগাইয়া থাকিল; পরিধানের পাতলা কাপড় খানা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া ফেলিলে বাঁচে, গরমে গুমটে এতই অশান্তি বোধ হয়। তারপর যেই কার্ত্তিক মাস আসিল, অমনি জামা মোজা, লেপ, কাঁথার যোগাড় কর। আশ্বিন মাস হইতেই একটু একটু হিম পড়িতে থাকে। তখনও কন্‌কনে শীত না পড়ায় লোকে অসাবধানতা বশতঃ নিয়মিতরূপে গরম কাপড় চোপড় ব্যবহার করে না এবং হিম লাগায়। গত বৎসরের শীতের অভিজ্ঞতা জর জ্বালা ভুলাইয়া দেয়; কাজেই তখনও শরীর শীতসহ না হওয়ায় সহসা একটু অনিয়মেই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভাদ্র আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত অনেক রুগ্ন বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী ভবলীলা সাঙ্গ করে।

বিশেষতঃ শিশু ও দীনদুঃখী মরে শীত কালে। অভাব বশতঃ ভাল খাবার খাইতে পায় না এবং গরম কাপড় চোপড় না থাকায় হিম লাগায়। কাজেই ফুস্‌ফুস্ ঘটিত ব্যারাম যেই ধরে সেই আর রক্ষা নাই। এইরূপ আবার ফাল্গুনের আরম্ভেই লোক মরে বসন্ত, ইন-ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা প্রভৃতি ব্যারামে। দুপুর বেলা একটু তাপ ফুটিলেই লোক মনে করে, শীত গিয়াছে, আর অমনি জামা কাপড় খুলিয়া সকাল সন্ধ্যায় খোলাগায়ে ঠাণ্ডা লাগায়, গলার বীচি ফুলিয়া উঠে এবং সর্দ্দি জর, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। ছোট শিশুদের হামজর, পানিবসন্ত, প্রভৃতি ব্যারাম সচরাচর এই সময়েই হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যখন যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন না, তখন পরনির্ভর অনভিজ্ঞ শিশু যে অসাবধান হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

নানা দোষ থাকিলেও ফাল্গুনের গুণও আছে অনেক। নির্দ্দোষ কেহ জগতে আছে কি? এমন যে চাঁদ তাহাতেও কলঙ্ক! তবে আর ফাল্গুনের সামান্য দোষ ধরিয়া লাভ কি?

ভোগ বিলাসী ত্রিতলবাসী সৌখিন বিরহী-বিরহীণীরা ফাল্গুনের উপর নাকি বড়ই চটা।

তাঁহারা মনের দুখে বলেন, "ফাল্গুনে আগুন লাগুক, কোকিলের কণ্ঠরোধ হোক, মলয় হাওয়ার কাণে কথা কহা ঘুচে যাক।" বিরহী বা প্রোষিক ভর্তৃকা যাহাই বলুন, ফাল্গুনের কাছে পল্লীবাসী চির ঋণী। এ ধার পরিশোধ করিতে আমরা কখনই পারিব না ফাল্গুন আছে তাই বাঙ্গলার পল্লীতে এখনও মানুষ বাঁচিয়া আছে; নতুবা কোন্ কালে পল্লী জনহীন শ্মশানে পরিণত হইত।

ফাল্গুনের অভাবে যদি পল্লীতে আগুন লাগিত, তাহা হইলে পল্লীর ভাগ্যে যাহা ঘটিত তাহা ত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হায়! সহরের দশা কি হইত? এখনও এইসব মরা পল্লীর হাড় চামড়া হইতে রস বাহির হইয়া মোটা মোটা গোদা গোদা সহরগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এইসব ম্রিয়মাণ পল্লী হইতেই যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া সহরের বুক ভরাইতেছে। মরা হাতী লাখ টাকা। এখনও এই মরা গ্রাম গুলিই জীবন্ত সহরের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। যদি সত্যই ভগবানের অভিপ্রায়ে কালক্রমে গ্রামগুলি মরিয়া যায়, তাহা হইলে সুশিক্ষিত নগর বাসী ভদ্রমহোদয়গণ কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সহর বা সহরতলীর নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে লাঙ্গল দিয়া ফসল উৎপাদন পূর্ব্বক এই নিদারুণ অন্নসমস্যার সমাধান করিবেন? জানিনা তাঁহাদিগের অসাধারণ উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে কি উপায় উদ্ভাবিত হইবে। আমাদের কিন্তু সহজ সাধারণ স্বল্প বুদ্ধিতে এইমাত্র মনে হয়, অসভ্য চাষাই সহরের সৌন্দর্য্যের বনিয়াদ। এই পল্লীবাসী কৃষক বন্ধুর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এখনও এই সব মরা পল্লীর অনুগ্রহেই চারটী ডাল ভাত পাইতেছি; পল্লী মরিলে, আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া ক্ষুন্নিবারণ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিবে না।

ফাগুনে হাওয়ায় তরুলতা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ-জীবজন্তু সকলেই নব জীবন লাভ করিয়া পুলকিত। নূতন রস সঞ্চারে সকল পদার্থই আজ হর্ষোৎফুল্ল। পাদপ নিচয় দারুণ শীতের সহিত লড়িয়া যেন পরাভব স্বীকারে জড় সড়ও নিস্তেজ হইয়াছিল। বসন্ত সমাগমে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নবকিশলয় গুলি মনের আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া মলয়সমীরের সহিত খেলা করিতেছে। তাহাদের এ খেলা রাত্রিতে আরও মধুর। চাঁদের জ্যোৎস্না মাখিয়া যখন তাহারা দখিনে হাওয়ার সহিত গলাগলি করে, তখন দেখিলে প্রাণ এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হয়। এ আনন্দের ভাগ হতভাগ্য পল্লীও একটু পাইয়াছে, গায়ের জামা খুলিয়া খোলস ছাড়িয়া হাওয়া খাইয়া তাহার জ্বালার প্রাণ জুড়াইল, মৃতদেহে যেমন জীবন সঞ্চার হইল।

পল্লী হইতে ছানা বিক্রেতা সহরে ছানা বেচিয়া গৃহে ফিরিবার সময় আর জারমলীন বা পাইরেক্স লইয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে মশাই, এ বছরের মত বেঁচে গেলাম। ফাগুনে হাওয়ায় ছেলে মেয়ের ফুলো মাষ লেগেছে। সহরে যাহারা তরকারী বেচিতে আসে, তাহারা বাড়ী যাইবার সময় তেল, নুন, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত টনিক, ডিগুপ্ত বা গেলের পাচন লয় না। তাহারা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া

বলে,—ফাগুনে হাওয়ায় নূতন রক্ত হয়েছে; আর ওষুধ পথ্য খরচে এখন কিছুদিনের জন্য হয়রাণ হ'তে হবে না। এবার জ্বরে বড় দুঃখ পেয়েছি, সে জ্বালা ভুলিবার নয়। উঃ! কত দিনে আমরা এই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব!!

যিনি যাহাই বলুন, ফাগুনের গুণের অন্ত নাই। ব্রহ্মার ন্যায় পঞ্চমুখ পাইলেও ফাগুনের প্রশংসা কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

অনেকে বলেন, ফাগুন মাসটা বড় খারাপ, কেননা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় হাম, বসন্ত, চোখউঠা, সর্দ্দিজ্বর, কাশি, কলেরা, প্রভৃতি জ্বর জ্বালার প্রকোপ হয়। এ সব না হয় তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম, কিন্তু ফৌজদারীতে যে নাকাল ও হয়রাণি, দেওয়ানীতে তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার বাড়া দুঃখ জগতে আর আছে কিনা জানি না। গুরুগুর্ করে পাঁজর দিয়ে শীতটা যখন উঠে আর অমনি তিন খানা লেপ চাপিয়ে ধ'রে থাকলেও শীত ও কম্প থামে না। তারপর কি ভীষণ দাহ, গাত্র জ্বালা, শিরঃপীড়া ছটফটানি প্রভৃতি অসহ্য যন্ত্রণা যখন হয়, তখন ভুক্তভোগী মাত্রেই প্রাণে উপলব্ধি করেন, দেওয়ানী ম্যালেরিয়া কি বীজ। রক্ত শুষিয়া রাক্ষসী ক্রমে রোগীকে ক্ষীণ ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে; তাই সহজেই অন্য ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়।

ফল কথা ফাগুন আছে বলিয়াই এখনও পল্লী নির্জ্জন হয় নাই। যাঁহারা সহরে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করেন, মোটর গাড়ীতে যাতায়াত করেন, মাটিতে বড় বেশী পা দেন না, তাঁহারা ম্রিয়মাণ বঙ্গ পল্লীর দুঃখ বুঝিবেন না যার জ্বালা সেই জানে। কৃষিজীবী পল্লীবাসী, মাটি লইয়াই জীবন সংগ্রামে দাঁড়াইয়া আছে। বন-জঙ্গল-পচাজল-কাদা-মাটিতেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; কিন্তু মাটি ছাড়িলে সে খাইবে কি? শুধু তাহারই বা কেন, যে মাটি হইতে অন্নের উদ্ভব, তাহা যে দুনিয়ার জীবন! ফাগুনে খাল বিল গর্ত্ত ডোবা শুষ্ক প্রায়; চতুর্দ্দিক খটখটে খোলা ময়দান। পাতা পচা বন্ধ হইয়াছে। ফাঁকা মাঠের মিঠা হাওয়ায় হাড়ের জ্বর ছাড়িয়াছে।

অনেকে ভাদ্র হইতেই এবার পড়িয়াছিল। কত জারজলীন জ্বরের যম, কত সর্ব্বজ্বর গজসিংহ, কতসপ্তত্তিক্ত ব্যাধিশার্দ্দূল, কত গুপ্ত, সেন, পাল বোতল বোতল খাইল, তথাপি জ্বর ছাড়ে নাই। কেমন একটু মুখতিক্ত, মাথাভার, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাজে আলস্য ও ঔদাস্য প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার জের আর কিছুতেই যায় না। সব আধি ব্যাধি সারাইয়াছে, ফাগুনের প্রীতিকর রবির করও মৃদুমন্দ মলয়ানিল।

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ একবার মার্কিন দেশে কোন এক সভায় মনে হয় এই ভাবের একটা কথা বলিয়াছিলেন,—ভারতে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; ধর্ম্মের অভাব ভারতে নাই, অভাব হইয়াছে রুটির। যদি ভারতের দুঃখে কাতর হইয়া থাক, যদি যথার্থ সমবেদনা প্রকাশ করিতে চাও, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িও না; তাহাকে ক্ষুধার অন্ন খাইতে দাও; তাহার রুটির ব্যবস্থা কর। এই সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আজ কাতর-

কণ্ঠে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, ওগো মার্জ্জিত রুচি সুশিক্ষিত সুসভ্য সুদূরে বাবু, পল্লীতে অরণ্য পাচনের উপাদান যথেষ্ট আছে; সেইগুলির প্রতি যাহাতে এই গরীব দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ে—এইরূপ আন্দোলন এখন করিতে হইবে; ভেজাল নোংরা খাদ্য খাইয়া সংযমহীন দেশ দিন দিন ব্যাধিজর্জ্জরিত দেহে মৃত্যুর পথে তীরবেগে ধাবমান; কি উপায়ে আবার লোক সংযম শিক্ষা করিতে এবং বিশুদ্ধ ঘৃত, দুগ্ধ, ময়দা, তেল ও চিনি পাইতে পারে, তাহার সম্যক আলোচনা এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আর সুন্দর সুন্দর শিশি বোতলে ভরিয়া নূতন নূতন ঔষধ পাঠাইয়া দরিদ্র সরল অশিক্ষিত পল্লীর কষ্টের কড়ি ফাঁকি দিয়া লইবেন না। শুধু ঔষধে আর ফল হইবে না। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কত ঔষধ পাঠাইলেন, কিন্তু রুগ্ন পল্লীর হাড়ের জ্বর একবারে ছাড়িল না, অথচ ধনে প্রাণে বেচারারা মরিল। কাঙ্গালের ধন ভুলাইয়া লইতে কি কাহারও প্রাণে বাজে না! অহো মায়াবিনি-বর্ত্তমান সভ্যতে! ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ। আত্মরক্ষা ও স্বার্থসেবার জন্য সামান্য একটু ঔষধ পাঠাইয়া পল্লীগুলিকে আর কই-মাগুরের মত জীয়াইয়া রাখিবেন না। দীন পল্লীর ক্ষীণ আহ্বানে দয়া করিয়া একটু কর্ণপাত করুন। মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিবেন না। মনভুলান কাগজের বাক্সের ভিতর চমৎকার শিশি বোতলে ভরিয়া নানাবর্ণের নয়নাভিরাম ঔষধ পাঠাইয়া আর জীর্ণ পল্লীর রক্তশোষণ করিবেন না। ম্রিয়মাণ গ্রামগুলির প্রতি যদি সত্যই আপনাদের লক্ষ্য পড়িয়া থাকে, যদি পল্লীর জীবনরক্ষা যথার্থই সহরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; যদি বাস্তবিক আপনাদের প্রাণ—পল্লীর জন্য কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদের শক্তিসামর্থ্য, বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানালোকদানে পল্লীর পুঞ্জীভূত অজ্ঞান তিমির নাশ করুন; একটু অকৃত্রিম প্রেম, প্রাণের সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠাইয়া দেখুন, নির্জ্জীব পল্লী আবার সজীব হইয়া উঠে কি না। অশ্রুর বাড়া সঞ্জীবনী সুধা আর আছে কি? স্বার্থ মূলক সভ্যযুগের ব্যবসায়িক চাতুরী ও রাজনীতিক কৌশল ছাড়িয়া একটু আন্তরিক সহৃদয়তা ও প্রাণবত্তা পাঠাইয়া দেখুন, শ্রীহীন পল্লী আবার সুখসমৃদ্ধি লাভ করে কি না।

হাড় থাকিলেই মাষ লাগে। ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল রাক্ষসীর সহিত লড়িয়া পল্লীর হাড় কয়খানা ছিল, এখন মাষ লাগিয়াছে; মাথায় নূতন চুল উঠিয়াছে; সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর আর মুখ তিক্তবোধ হয় না; ক্ষুধার জোর হইয়াছে; পাঁজরে শীত শীত ভাবটা গিয়াছে; মাথা ডিঙ্গাইয়া একটু গরম জল ফেলিয়া আর স্নান করিতে হয় না; দীঘি-পুকুর বা নদীর শীতল জলে অবগাহন সহ্য হইয়াছে: শাক অম্ল কলাইয়ের ডাল খাইতে আর তেমন ভয় হয় না; এক কথায়, অসুখে নিজের দেহ যেন নিজের নহে, এইরূপ হইয়া গিয়াছিল, এখন সে ভাবটা গিয়াছে, বহুদিন রোগভোগের পর নানাবিধ ঔষধ সেবনে গায়ের বদরক্ত সব খোস পাচড়া-চুলকনার আকারে বহির্গত হইতেছে। আজ ফাগুনে হাওয়ায় নবজীবন লাভ করিয়া মাঠে-ঘাটে তাই কৃষক

রাখাল মহানন্দে মেঠোসুরে গ্রাম্য কবিতায় গান ধরিয়াছেঃ—

চুলকনার জ্বালাতে মোলাম সজনি।
সর্ব্বশরীর জড় সড় করে,—চুলকে পড়ে রসানি॥
মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবার গায়ে চুলকনা,
কাপড় চোপড় নোংরা হ'ল, কাচ্‌তে চায়না ধোপানি॥
শত শত চুলকনা হোক, খোস পাঁচড়ায় কাতর নই,
কিন্তু পীলে-লিবর-ম্যালেরিয়ার কম্প মোরা খুব জানি॥

যাহারা নিতান্ত বেরসিক ও কৃতঘ্ন তাহারাই ফাগুনের গুণ মানে না। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, চুলকনার দ্বারা ফাগুনে হাওয়া রোগীর দেহে সঞ্চিত সমস্ত ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়। বুদ্ধিমান লোকেরা নিম, বেগুন খাইয়াও উত্তমরূপে খাঁটি সর্ষপতৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক নদীতে বা ভাল পুকুরে স্নান করিয়া খোস-চুলকনার হাত এড়াইতেছে। ফল কথা, ভগবানের নিকট পল্লীবাসীর করুণ ক্রন্দন পঁহুছিয়াছে, তাহাদের প্রাণের আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে; ঈশ্বর কৃপায় পাকা ডাঁসা অনেক রোগী আবার আধবছর অর্থাৎ আগামী শ্রাবণের শেষতক Extension বা পরমায়ু বৃদ্ধি পাইল।

সমালোচনা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী এল, এ, এম, এস, এচ্ এম্ বি]

—:o:—

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা। ডাঃ শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত মূল্য ৵১০ পয়সা মাত্র। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পঞ্জিকা বলিলে আমরা যেমন গুপ্তপ্রেস বা বঙ্গবাসী পঞ্জিকা মনে করি, এই পঞ্জিকা সে ধরণের নহে, ইহা গৃহস্বাস্থ্যরূপ ধর্ম্ম পঞ্জিকা। ইহার উদ্দেশ্য বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নশীল করা, এক কথায় বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা।

ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সংযোজিত হইয়াছে। "হর-পার্ব্বতী সংবাদ" বলিলে আমরা কেবল গ্রহ নক্ষত্র ও বর্ষফলই বুঝি, ইহার সে ধরণের হর পার্ব্বতী সংবাদ নহে। ইহাতে 'দেশের দুরবস্থার কথা,' 'দুরবস্থার কারণ', 'বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হীনতার কারণ' তাহার প্রতিকারের উপায়', 'গৃহীর কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য, 'রোগচর্য্যার রীতি', 'চিকিৎসকের কর্ত্তব্য,' 'চিকিৎসার পদ্ধতি' প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্-

লিত পত্তে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, শত শত ভারত গানে যাহা হইবার নহে "এই পুস্তকের 'হর পার্ব্বতী সংবাদের" এক একটী ছড়ায় তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার হইবে। বাঙ্গালী যদি এই ছড়াগুলি মুখস্থ করিয়া ইহাতে লিখিত উপদেশ পালন করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পুত্র কন্যাগণ অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, বাঙ্গালী আবার তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে। ইহাতে যে সমস্ত মুষ্টিযোগ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পুত্র কন্যাদের চিকিৎসা আপনারাই করিতে পারিবেন। বাস্তবিক বলিতে কি, এই পঞ্জিকা খানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে দিন পঞ্জিকা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও সুন্দর হইয়াছে। কার্ত্তিক বাবু স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। কার্ত্তিক বাবুর জয় হো'ক, তিনি বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলুন, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

পথ্যাপথ্য বিচার।

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ-সাহিত্যভূষণ।)

—:•:—

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্ত ভেষজানাং শতৈরপি॥

অর্থাৎ ঔষধ ব্যতীত কেবল একমাত্র পথ্যের দ্বারাই ব্যাধি প্রশমিত হইতে পারে, কিন্তু কুপথ্যাচারীর শত শত ঔষধ সেবনেও আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমানে কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, হাকিমী প্রভৃতি নানা মতের চিকিৎসার প্রচলন হইয়া যেমন অনেক সময়ে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটিয়া রোগী অশেষবিধ কষ্ট পাইয়া অকালে প্রাণ হারায়, সেইরূপ যে চিকিৎসকের নিকট পথ্যাপথ্যের বিচার নাই, তাহার হাতেও রোগীর কষ্টের সীমা থাকে না। আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থে যে সব পথ্যের নির্দ্দেশ আছে, বর্ত্তমানে প্রচলিত পথ্যের সহিত তাহার সর্ব্বত্র মিল নাই, বাস্তবিক দেশ, কাল পাত্রভেদে উভয়ের মধ্যেই এরূপ অসামঞ্জস্য হওয়াই স্বাভাবিক। মূলগ্রন্থে সাগু, এরারুট ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায় না অথচ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে, কিন্তু যে চিকিৎসক কোথায়, কোনটি কি ভাবে চালাইতে হইবে তাহা জানেন না, পথ্যের দোষে তাঁহার হাতে রোগীর ভোগ কাল যে বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ত্রিকাল দর্শী মুনিঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশ পথ্যের ব্যবহার এখন নাই, যে গুলি ব্যবহার হইতে পারে তাহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত ডাক্তার বাবুরা ঘৃণাবোধে ব্যবহার করিতে চাহেন না। অনেকে পথ্যের প্রস্তুত প্রণা-

লীতে গৃহস্থও বিরক্ত হইতে পারেন উনিশ গুণ জলের মধ্যে এক বাটি চাউল দিয়া তাহাকে মৃদু সন্তাপে জ্বালাইতে জ্বালাইতে অন্নমণ্ডে পরিবর্ত্তিত করা কিছু সময় সাপেক্ষ।

অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা পথ্যের উপর যে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, তাহার প্রমাণ বহুস্থলেই পাওয়া যায়, আমি নিজে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করি, জনৈক অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের গৃহ চিকিৎসক রূপে তাঁহার পৌত্রের টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা কালে আমার অসাক্ষাতে নানাবিধ ফল ফুলুরির ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। অতিরিক্ত পরিমাণে ফল ফুলুরী না দিলে (কারণ অন্যকোন পথ্যের উপর রোগীর রুচি নাই) রোগী হার্টফেল করিয়া মারা যাইতে পারে, এইরূপই তাঁহার মত। ন্যাসপাতি ফলের গুণাগুণ বিশেষ জানি না, কিন্তু আমার ধারণা, যেখানে ন্যাসপাতি চলে পথ্যরূপে সে স্থানে বিলাতি আমড়াও চালানো যায়, জানি না আমার এ ধারণার কিছুমাত্রও সত্যতা আছে কিনা। এক দিন তাহাদের এক M. B. আত্মীয় আসিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের জল পান করিতে দাও, রোগীর ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। ডাক্তার বাবু (গৃহস্থ) আমার মত চাহিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম তিনি বলিলেন, কবিরাজের ন্যায় তোমরাও রোগীদের পথ্য দিতে বড় ভয় পাও। ডাবের জলে পেটটা ঠাণ্ডা থাকিবে, ভয়ের কি কারণ আছে? আমি বলিলাম শারীরিক ধর্ম্ম সকল একরূপ নহে মহাশয়! আপনি একসঙ্গে পাঁচটা ডাবের জল খাইয়া সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য একটু ডাবের জল পানে আমার তৎক্ষণাৎই সর্দ্দি লাগিয়া বসে, ইহার পর তিনি আর কোন কথা বলেন নাই।

আর একটী রোগীর কথা মনে আছে, দুবৎসরের ছেলে, আমরক্ত এবং জ্বর, কিন্তু আমাশয়ের দরুণ জ্বর নহে, দু'টী ভিন্নভাবে একই রোগীকে আশ্রয় করে। জ্বর ম্যালেরিয়া ঘটিত, শীত করিয়া আসিত, কয়েক ঘণ্টা ভোগের পর ঘামদিয়া হয়ত একেবারেই ছাড়িয়া যাইত, নতুবা খুব অল্পই থাকিত। চিড়ার জল উদর পীড়ার পক্ষে উত্তম পথ্য উহা পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা করে। Soothing to the Stomach রোগীকে যেদিন চিড়ার পথ্য দেওয়া হইত সেদিন রস বেশ কমিয়া যাইত, কিন্তু জ্বর বাড়িত, অন্যপক্ষে হর্লিকস্ মিল্ক পথ্য দিলে জ্বর সমভাবে থাকিয়া দাস্ত খুব বাড়িয়া যাইত, এক্ষেত্রে ৫।৬ দিনের জন্য তাহার উপযুক্ত পথ্যই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে বেলশুঁট্‌সহ চিড়াসিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ প্রয়োগে রোগী ক্রমে ভাল হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মাভাবই ধ্বংসের হেতু।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামসমূহের অবনতির কতকগুলি স্থূল কারণের কথা আমরা বহুবারই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামে বিস্তর বাটীই ক্রমে জনশূন্য হইয়া আসিতেছে, বহু বংশই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; যাহারা জীবিত আছে, তাহারা প্রায়ই অনেকে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। কেন এরূপ হইতেছে, তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম কয়জন দেশহিতৈষী আন্তরিক ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন? কিন্তু এই বিষয়টাই ইঁহাদের সর্ব্বাদৌ বিশেষরূপেই আলোচ্য। আমাদের মনে হয়, পল্লীগ্রামে—কেবল পল্লীগ্রামেই কেন, সহরেও যে ইদানী এত অধিক রোগের প্রাবল্য হইতেছে,—ধর্ম্মাভাবই ইহার মুখ্য হেতু। পল্লীগ্রামের এবং সহরের সর্ব্বত্রই সাধারণতঃ ধর্ম্মাভাব শোচনীয় রূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার ফল,—অসংযম, অনাচার এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বা অংশিকরূপে অবসাদ। তাহার ফল—নানাপ্রকার আধি-ব্যাধির অতি প্রাবল্য। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটা ভালরূপে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য; কেবল হিন্দু কেন, অপর সকল জাতীয় ব্যক্তিরই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরণ বহু প্রকারেই আরামপ্রদ, স্বাস্থ্যজনক এবং ধর্ম্মাচার-পরিব্যঞ্জক। ইদানী ইহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। যাহাদের নিত্য মজুরী বা প্রাতঃকালীন ব্যবসায় কর্ম্মাদি বাধ্যতামূলক,—তাহাদের পক্ষে প্রাতরুত্থান অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত প্রায় সকলেই দিবা আটটা, নয়টা বা কোন কোন স্থলে বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত আয়ুহানিকর। এত অধিক বেলায় শয্যা হইতে উঠিয়া অনেকেরই ধর্ম্মকৃত্য ও প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া উঠে না; অনেকে বাসি মুখেই চা-বিস্কুট ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এটা প্রায়ই সহরবাসীর পক্ষে প্রয়োজ্য হইলেও, পল্লীবাসিগণের ভিতরও ইদানী এই অভ্যাস প্রবলরূপে দেখা দিতেছে। পল্লীগ্রামবাসী বহু ব্রাহ্মণেরই ত্রিসন্ধ্যা করা'ত দূরের কথা, দিনান্তে একবার গায়ত্রী পাঠও বোধ হয় হইয়া উঠে না। ব্রাহ্মণের যখন এতদূর অধঃপতন, তখন তদ্দৃষ্টান্তে অপরাপর শ্রেণীর ধর্ম্মকৃত্য কতদূর পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাতঃকালের ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে, তেমনি দিবাদণ্ডের বা রাত্রি দণ্ডের অপরাপর কৃত্যও ক্রমেই কিরূপ অনাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। দিবা রাত্রির ভিতর অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ত একরূপ বর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কেবল পারলৌকিক হিসাবে নহে,—ইহলৌকিক হিসাবেও—স্বাস্থ্যরক্ষাদি সম্বন্ধেও যে অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আহার-বিহারাদি সম্বন্ধেও সংযমের কোন লক্ষণই প্রায় আর দেখা যায় না। কোন্ তিথিতে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ প্রশস্ত বা নিষিদ্ধ, তাহা আর মানিয়া চলা ত হয়ই না, পরন্ত এরূপ নিয়ম কুসংস্কারমূলক বলিয়া অনেকের

ধারণা হইতেছে। আহার-ঘটিত এইরূপ এবং নানারূপ অনাচারেও যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ গুরুতররূপ হইয়া আসিতেছে, ইহা কি আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে? নিষিদ্ধ দ্রব্যের আহার যেরূপ বাড়িয়াছে, রোগ-প্রবণতা তেমনই বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে জীবনীশক্তি এবং ব্যাধি বর্জ্জনের দৈহিক শক্তিও তেমনি হ্রাস পাইতেছে। এ সম্বন্ধে পল্লীবাসিগণ অপেক্ষা সহরবাসিগণের অত্যাচার যে অধিকতর, তাহা নিত্যই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সহরের অধিকাংশ "ইটিং হাউস" বা ভোজখানা যে বহু বিষ-দূষিত খাদ্যদ্রব্যের আগার, তাহা অনেকেই দেখিতেছে এবং জানিতেছে; তথাপি এমনই প্রলোভন যে, তাহাতেও অনেকের পক্ষে সাবধান হইয়া চলা দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। সেই চা-কেক-বিস্কুট—সেই কোর্ম্মা-কাবাব-কোপ্তা—সেই চপ চকোলেট-কফি—এই সব যেন না হইলে আর চলিতেছে না! সাধারণতঃ এই সকল দ্রব্য কতটা পরিমাণে দেহের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক, তাহা ভাবিবার অবসর অনেকেরই আদৌ হয় না; কোনরূপে ইহা গো-গ্রাসে গিলিতে পারিলে ইহইল! ধারণা—তাহা হইলে ভোজনকারীর শরীরের অবস্থা ক্রমেই উত্তম হইতে উত্তমতর হইতে থাকিবে। অধিকাংশ ময়রার খাবারই নানারূপ দূষিত পদার্থে প্রস্তুত। অথচ, ইহাও অনেকেরই নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে-কালের ব্যবস্থা মুড়ি-গুড় বা মুড়ি-নারিকেল-নাড়ু ইদানী অনেকেরই পক্ষে আর কালোচিত বাবু-ভোজ্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এই সব নানারূপ অমেধ্য এবং দূষিত সামগ্রী ব্যবহারে ধর্ম্মহানি—সুতরাং জীবনীশক্তির অপচয় যে নিত্যই যথেষ্টরূপ হইতেছে, তাহা কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে? তথাপি অনেকেরই চৈতন্যোদয় হইতেছে না; ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নহে কি?

ধর্ম্মাভাবের আর এক শোচনীয় লক্ষণ—নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সামগ্রীতেই ভেজালের অতি বৃদ্ধি। অর্থের অত্যধিক লোলুপতায় বহু অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ীই প্রায় সকল দ্রব্যেই ভেজাল মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘৃত দুগ্ধ, চাউল, ময়দা, তৈল—কত নাম করিব?—অধিকাংশ দ্রব্যই আর বিশুদ্ধ প্রকারের পাইবার উপায় নাই। ময়দায় সূক্ষ্ম শ্বেত প্রস্তরের চূর্ণ মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে;—ঘৃতে নানাপ্রকারের অস্পৃশ্য চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হইতেছে;—এই সকল বিষম দূষিত সামগ্রীর ব্যবহারে দেশ যে এখনও একবারেই জনশূন্য হয় নাই, ইহাই বিচিত্র বলিতে হইবে। একে ত সকল দ্রব্যই অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, তাহার উপর অধিকাংশ দ্রব্যই ভেজালে পরিপূর্ণ;—ইহাতে যে মানবদেহ বিবিধ ব্যাধির আধার হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অনেককে বাধ্য হইয়া এই ভেজাল দ্রব্যই ব্যবহার করিতে হইতেছে,—ফলে ইহারা নানারূপ ব্যাধির কবলগত হইয়াও চির জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। এই ভেজালের অতি প্রাবল্যও ধর্ম্মাভাবেরই পরিচায়ক। যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ধর্ম্ম-বুদ্ধি আছে, তাহার পক্ষে এরূপ কার্য্য করা কোনক্রমে সম্ভবপর হইতে পারে? দেশের দিকে না চাহিয়া চক্ষু বুজিয়া অনেকেই ভেজালের কারবার চালাইতেছে;—ভাবি-

েছে না,—ইহাতে তাহারা দেশের কি পরিমাণ অনিষ্ট করিতেছে! দেশে যে নানাবিধ রোগের এত বৃদ্ধি,—এই ভেজালও ত তাহার একটা মুখ্য কারণ। সহরের কথা ছাড়িয়া দিই,—কেবল পল্লীগ্রামের কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও পল্লীগ্রামসমূহের রোগের প্রাবল্য দেখিয়াও দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯২২ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ,—এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে—

কলেরায় মরিয়াছে	৭৩,৯,৪৩ জন।
বসন্তে ,,	৭,৮,৩৫ জন।
কালাজ্বরে ,,	৯,২৬ জন।
ম্যালেরিয়ায় ,,	১৩৭,৩,২৩ জন।
সর্ব্ববিধজ্বরে ,,	১০,৪৬,৬,৬১ জন।
আমাশয়ে ,,	১৩,৭,৪৮ জন।
ইনফ্লুয়েঞ্জায়	২,৮,০,৯ জন।
নিউমোনিয়ায়	৫,৭,৬১ জন।
যক্ষায় ,,	১,৩,৯৪ জন।

সমগ্র পল্লীগ্রামসমূহে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৯১২ সালে ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন;—বৎসর বৎসর যদি এইরূপই ভাবেই ইহাদের উপর রোগের আক্রমণ হইতে থাকে, তাহা হইলে পল্লীগ্রাম সমূহের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন যে অচিরেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা দূরদর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অথচ পল্লীবাসিগণ অনেকেই যে এ বিষয়ে একবারে বিবেচনাশূন্য, তাহাও ভালরূপই বুঝা যাইতেছে। বিবেচনা-শক্তি বিন্দুমাত্র থাকিলেও কি কেহ স্ব স্ব দেহ এবং জীবন রক্ষার সময়োচিত ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই যে নিশ্চেষ্টতা নৈরাশ্য বা অবসাদ—ইহাও ধর্ম্মাভাবের হেতুভূত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। আধুনিক কুশিক্ষা এবং কু-আদর্শের ফলে দেশে নিত্য এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। আধুনিক বিকৃত শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে আর পূর্ব্ববৎ দেবার্চ্চনাদি দেখিতে পাইবেনা;—কুল দেবতা এখন অনেক স্থলেই দায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ স্বয়ং অনেক স্থলেই গায়ত্রীবর্জ্জিত—সন্ধ্যা বর্জ্জিত, ধর্ম্মবুদ্ধি মাত্রই বর্জ্জিত। প্রাতে উঠিয়াই চা-বিস্কুট প্রভৃতি আহারে অভ্যস্ত; আর অপরদিকে কুল-দেবতার পূজার ভার একজন প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তির উপরই বেতন-ব্যবস্থায় সমর্পিত—এরূপ স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই গৃহদেবতা প্রায়ই যথাবিধি নৈবিদ্যে বর্জ্জিত হইয়াই নাম মাত্র অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি দেবতার সেবায় সংন্যস্ত থাকিলেও—অনেক স্থলেই বিগ্রহের যথোচিত সেবা প্রায়ই ঘটে না, এজমালির সংসারে বিগ্রহও ভাগে পড়িয়া নানারূপ দুর্ভোগের অধীন হয়েন; ইহাতেই গৃহস্থের কল্যাণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেবাইত,—সম্পত্তির এবং শিশ্নের সেবা করিতেই বিব্রত,—কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় অতিমাত্র মসগুল; ফলে পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ অনাদরে অপূজিত, বা স্বর্গবিশে জাহ্নবীজীবনে নিক্ষিপ্ত;—মন্দির বিভগ্ন,—বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষে সংবেষ্টিত,—এরূপ শোচনীয় দৃশ্য বঙ্গে আজকাল বিরল নহে। ইহার উপর যজ্ঞহোমাদির বা অতিথি সেবাদির কথা আর না তুলিলেও চলে। অধিকাংশ বাটীতেই

অতিথি ভিক্ষুক প্রায়ই অর্দ্ধচন্দ্রেই আপ্যায়িত হইয়া থাকে। এই সব ধর্ম্মাচারের অভাবে বহু গৃহস্থের গৃহ—বহুসংখ্যক গ্রামই আজ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই সব ধর্ম্মাচারের অভাব ইদানী সরল প্রকৃতির অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে; অধিকাংশ লোকেই ক্রূর, কপট এবং ঘোরতর স্বার্থপরহইয়া উঠিতেছে। দেবদ্বিজে ভক্তি খুবই কমিয়া আসিতেছে। গো সেবা আর পূর্ব্ববৎ নাই বলিলেই চলে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা গলগ্রহ হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে সর্ব্ববিধ অশান্তি এবং অকল্যাণের আধিক্য হইবে তাহা কি আর বিচিত্র কথা?

ধর্ম্মাভাবের আর এক লক্ষণ, অধিকাংশ হিন্দুর গৃহেই দশ সংস্কারের ভিতর অধিকাংশ সংস্কারেরই রূপান্তরে গ্রহণ বা একেবারেই পরিবর্জ্জন। রূপান্তরে বলিলাম এই জন্ত যে, প্রায়ই দেখা যায়, নামকরণ অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কার দ্বিজ পুত্রের উপনয়ন সংস্কার কালেই অতি সংক্ষেপে নামতঃ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে হিন্দুর পক্ষে দশ সংস্কার অবশ্য অনুষ্ঠেয়, ইহাতে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ সাধিত হইতে পারে না। ফলে হিন্দুর দেহে এবং মনে ধর্ম্ম-প্রভাবের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; তামসিক এবং রাজসিক গুণের প্রাবল্য এবং সাত্বিক গুণের অপচয় বা বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে; ইহারই ফল,—ব্যাধির প্রাবল্য, অপমৃত্যু, অকালমৃত্যু, মানসিক অশান্তি, সুখময় সংসারে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্য। যদি বাঁচিতে এবং বাঁচাইতে চাও, যদি আবার সত্যই সুখের সংসার পাতিতে এবং পাতাইতে চাও, তবে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মসেবাই তাহার একমাত্র উপায়—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

বঙ্গবাসী।

আয়ুর্ব্বেদে সভ্যতা।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী)

আধুনিক যুগে সভ্যতা বলিতে গেলে পাশ্চাত্য অথবা তদনুকরণের কার্য্যকে সভ্যতা বলা হইয়া থাকে। আমরাও পাশ্চাত্য বা তদনুকরণ ভাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সুতরাং সেই সভ্যতাই আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছে। অশনে বসনে, চাল, চলনে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বই পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের প্রতিভাকে পরাজিত করিয়াছে। অধুনা কথিত সভ্যতাই আমাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদেও তদ্রূপ সভ্যতা অনুষ্টিত হইবে না কেন?

পূর্ব্বে আমাদের দেশস্থ কবিরাজগণ যে ভাবে রোগী চিকিৎসা করিতেন, যে ভাবে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, এখন কতিপয় বৎসর মধ্যে সে ভাব প্রায় লোপ পাইয়াছে। আগে কবিরাজেরা ছাত্রদের সাহায্য লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, ছাত্রেরা বনে, জঙ্গলে গিয়া ভেষজ সংগ্রহ করিতেন। এখন কোন কোন কবিরাজ ছাত্রদের দ্বারা উদ্যান হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া আনেন, কিন্তু সকলে নয়। আগে অনেক কবিরাজের ঔষধ সকল উত্তরিয় বস্ত্রে বাঁধিয়া চলিতেন। রোগী দেখিয়া ঔষধ তাহা হইতেই দিতে পারিতেন। আবার গৃহে যে সকল ঔষধাধার ছিল, তাহা আধুনিক ধরণের ছিলনা, বটিকাদি থাকিত তৈলাদি বাঁশের চোঙ্গায়, তৈলাদি থাকিত মৃৎ পাত্রে। ঐ সকল রক্ষিত হইত বেতের ঝাইল বা পেটরায়। এখনকার মত শিশি, বোতল বা আলমারীতে ঔষধাদি থাকিত না। তখন কার কবিরাজের চেহারাও বসন ভূষণ ছিল প্রধান পণ্ডিতের ন্যায়, এখন কিন্তু কবিরাজেরা বাবু-সাজ ধরিয়াছেন। ডাক্তারদের অনুকরণে রোগীর বুকে কবিরাজেরা সিঙ্গা-সানাই লাগাইয়া থাকেন। জ্বর মাপের কাটি বগলে লাগাইয়া সভ্যতা ফলাইয়া থাকেন। আর রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা পত্র দিয়া থাকেন। রোগীর লোক ঔষধালয়ে গিয়া ঔষধ আনিয়া থাকে। কবিরাজী ফরাসে টেবিল, চেয়ার, আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

এই সকল ব্যবস্থা তো সভ্যযুগে হইয়াছে, কিন্তু আগেকার চিকিৎসক অপেক্ষা কবিরাজের কি এখন ভাল চিকিৎসক হইয়াছেন? পাশ্চাত্য সভ্যতা ধরিয়া কি তাঁহারা আগের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন? সিঙ্গা, সানাই বা মাপকাটি দিয়া তাঁহারা কি বুঝেন? তবে চটকধারীভাব দেখাইবার জন্য যে তাঁহারা এরূপ আচার অবলম্বন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ডাক্তারী পড়িয়া কবিরাজী ব্যবসা করেন, তাঁহারা যে এসকল বিষয়ে অভ্যস্থ হইয়াছেন সেবিষয়ে আশ্চর্য্য করিবার কিছুই নাই। যাহ হউক এ সকল হইলেও কবিরাজেরা ডাক্তারদের মত কোট, প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে এখনও অভ্যস্থ হন নাই। অনেকেই নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচার গুলিও প্রধান পণ্ডিতদিগের আচার নিহিত হিন্দুভাবে বিশুদ্ধ। যিনি ডাক্তারী পাস করিয়া কিছুদিন কোট, প্যাণ্ট পরিয়া ব্যবসায় করিয়াছেন, তিনি যদি কবিরাজী পড়িয়া সে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তবে তাঁহাকে কবিরাজী বিহিত আচার সভ্যতা মানিয়াই চলিতে হইবে, বহুরূপীর ন্যায় সাজ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইলে হংস-মধ্যে বক সাজিলে চলিবেনা। তথাপি তাঁহার সভ্যতা নিহিত রূপটা থাকিয়াই যাইবে। এলোপ্যাথিদের ন্যায় হোমিওপ্যাথেরাও হ্যাট্ কোট পড়েন, কটি সানাই লাগান, রোগী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা দিয়া বাহিরে আসেন। রোগীর অবস্থা বলিতে গেলে তাঁহার চটেন, তাহারা মনে করেন, ভিজিট নিতেই আসিয়াছেন আবার অতিরিক্ত উৎপাত কেন? কবিরাজেরা এই সভ্যতার জোয়ারের মধ্যে পড়িয়াও রোগী দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রোগীর অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবিরাজেরা এ প্রকার করেন না। এ প্রকার অস্বাভাবিক আধুনিক সভ্যতা যাহাতে কবিরাজদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য যেমন কবিরাজেরা সতর্ক হইবেন, আমাদেরও তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কবিরাজেরা আগে নাড়ী দেখিয়া বক্ষ স্পন্দন ও নাড়ীর গতি বুঝিয়া জরের তাপ বুঝিতে পারিতেন এবং অন্যান্য উপসর্গও ধরিয়া লইতে পারিতেন। এখন এই সভ্যতার গুণে সহজ উপায় থাকিতে তাঁহারাও আর বুঝিয়া দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদের সে অঙ্গটুকু বাদ দিয়াছেন। আগেকার দিনে কবিরাজেরা নাড়ী দেখিয়া রোগ ও রোগীর অবস্থা বলিয়া যাইতেন, এখনও সেইরূপ করা উচিত নহে কি? তবে এখন তেমন লোক আর জন্মায় না বলিলে চলে। এমন করিয়াও আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন স্মৃতির কার্য্যকালটুকু এখনও লোপ হয় নাই। যাহা হউক পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা যদি কবিরাজগণ ফিরাইতে না না রাখিতে পারেন তবে কবিরাজী ধ্বংস হইয়া যাইবে। কবিরাজী চিকিৎসা যে আমাদের দেশের জল বায়ুর একান্ত উপযোগী আর ইহার উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রদ তাহা বহুকালের পরীক্ষায় বুঝা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই আধুনিক সভ্যতার বর্দ্ধমান অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার উঠিয়া গিয়াছে, কবিরাজেরা তা করেন না, অস্ত্রও রাখেন না। যাঁহারা ডাক্তারী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া কবিরাজ হইয়াছেন, তাহারাও গঙ্গায় অস্ত্র ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া কবিরাজী করিতে গিয়াছেন। উঁহারা যদি আমাদের প্রাচীন শল্য চিকিৎসার সঙ্গে মিশাইয়া আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ের মধ্যে আনিতে পারেন, তবে আমাদের আর্য্য চিকিৎসার উন্নতি হইবে নিশ্চিত কথা। বাজে কাজে উঁহারা পাশ্চাত্য বিহিত আচার অনুকরণ করেন, কিন্তু যেটুকু অনুকরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে, তা তাঁরা করেন কই?
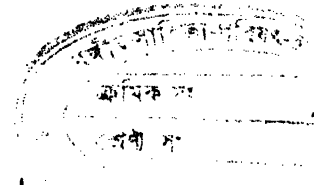
কদলীর উপকারিতা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

—— •:•:• ——

৩১। সয়া কলা। ইহাও একপ্রকার বীচা কলা। ফলের রস নানারূপ চক্ষু রোগে উপকারী।

৩২। সিঁদুরে কলা। দেখিতে ঘোর লাল বর্ণ, মধ্যমাকৃতি, ফল বড়, খাইতে ভাল, ইহাকে চীনা কলাও বলে।

৩৩। বেসিনে কলা। এই কলা বেসিন দেশে জন্মে, স্বাদ অপেক্ষা ইহার

গন্ধ অতি মনোহর; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা হয়।

৩৪। রসথলী। মান্দ্রাজে জন্মে, বড়ই সুরসাল, দেখিতে প্রায় চাঁপাকলার ন্যায়।

৩৫। যবদ্বীপে কলা। যবদ্বীপে এক প্রকার আশ্চর্য্য কলা জন্মে, একগাছে, একটী মাত্র ফল হয়, অর্থাৎ সমগ্র মোচাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটী ফলে পরিণত হয়। বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না, কাণ্ডের ভিতরেই পুষ্প ও পক হইতে থাকে; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় যে, একটী কলায় ৪ জনের পূর্ণ আহার হয়। তথায় আর এক প্রকার কলাগাছ আছে, তাহার পাতার উণ্টা দিকে আঘাত করিলে মোমের মত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

৩৬। ফিলিপাইনে কলা। ফিলিপাইন দ্বীপে তদপেক্ষাও ১টী বড় কলা এক গাছে উৎপন্ন হয়, ইহা এত ভারি যে, ঠিক্ ৪ জনের বোঝা।

৩৭। রেঙুনে কলা ইহা পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সু-স্বাদু। তত্রত্য বড় লোকেরা ইহা অত্যন্ত ভালবাসেন।

৩৮। ওরস্কো। আমেরিকায় "ফ্লোরিডা" দেশে ওরস্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে পাকিলে ইহার সদ্‌গন্ধ এতই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় যে, শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষীরাও তদ্দ্বারা উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

৩৯। কাষ্ঠ কদলী। বাঙ্গালায় বুনো-কলা, ও মহারাষ্ট্র দেশে কাষ্ঠকলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা ও অশ্মকদলী। ইহা অতিশয় মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, বিস্ফোটক ও অস্থিরোগে উপকারক।

৪০। সুবর্ণকদলী। চাঁপাকলা নামক প্রসিদ্ধ কদলী বিশেষের নাম সুবর্ণ কদলী। উৎকলে ইহাকে পাটোয়া এবং কোঙ্কন দেশে সোণে কেলা কহে। ইহা মধুরস, শীতল, অম্লবর্দ্ধক গুরুপাক, শুক্রজনক, কফকারক এবং দাহ ও তৃষ্ণার নিবারণ কারক।

কদলী পুষ্প (মোচা)

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তবরংগুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥
তৃষ্ণা প্লীহ জরংহস্তি দীপনং বস্তিশোধনম্।
বহুমূত্রাপহং হৃদ্যং শুক্রকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥
কফকৃৎ মূত্রদোষঘ্নং রক্তকৃচ্ছ্রাতিনাশনম্॥
সোম রোগং নিহন্ত্যাশু তৃপ্তিদং মুনর্ভিমতম্॥

কদলী পুষ্প বা মোচার গুণ।

মুনিগণ বলিয়াছেন, কদলী পুষ্প স্নিগ্ধ, মধুরকষায়, বাতপিত্ত নাশক, শীতল, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় রোগ নাশক, তৃষ্ণা, জ্বর, বহুমূত্র, মূত্রদোষ, রক্তকৃচ্ছ্র, সোমরোগ বিনাশক, তৃপ্তিদায়ক, কিঞ্চিৎকফবর্দ্ধক, হৃদ্য, শুক্র ও বল বৃদ্ধিকারী, দীপন এবং বস্তিশোধনকারী গুণ বিশিষ্ট।

মোচা ফল বা কদলীর উপকারিতা।

কদলী মধুরং বৃষ্যং কষায় নীতিশীতলং।
রক্তপিত্তহরং হৃদ্যং রোচনং ক্ষয়নাশনং॥
পাকেশ্লেষ্মকরং স্নিগ্ধং যকৃৎ প্লীহবিনাশকং॥
সারকং পুষ্টিদং শীতং বিষ্টম্ভী পিত্তনাশনং॥
দাহ-ক্ষয়-ক্ষতাদীনাং নাশনং রক্তবর্দ্ধনম্।
রক্তদুষ্টি পিপাসাঞ্চ নাতিপাকে সমীরজিৎ॥
নেত্রদোষং সুহৃদ্যঞ্চ ক্রমিঘ্নংমধুরং গুরু॥
বৃংহণং তৃপ্তিদংপাকে সুস্বাদু মাংসবর্দ্ধনম্।
বাতঘ্নং রতিদং মিষ্টং সুপক্কে স্থৌল্যকারকম॥
বস্তিদোষং নিহন্ত্যাশু পুষ্টিস্তুষ্টি প্রদায়কম্।
মূত্রদোষং ক্ষতক্ষীণং বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ॥

মোচা ফল বা কদলীর গুণ।

কদলী ফল মধুর, বৃষ্য, কষায় রস, নাতি শীতল, রক্তপিত্তহারী, হৃদ্য, রুচিকারক, ক্ষয় বিনাশক, স্নিগ্ধ, যকৃৎ প্লীহানাশক, এবং পাকে শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী, সারক, পুষ্টিদায়ক, বিষ্টম্ভী, শীতল গুণ বিশিষ্ট এবং পিত্তনাশক। দাহ, ক্ষয়, ক্ষতাদিসহ রক্তদুষ্টি, পিপাসা ও বাত নাশক নেত্রদোষ, ক্রমিদোষ নাশক. মধুর ও গুরু। ইহা নাতিপাকে অর্থাৎ পরিপুষ্টাবস্থায় অত্যন্ত বায়ুনাশক, কৃমিহারক, হৃদ্য এবং তৃপ্তিদায়ক। ইহার সুপক্কাবস্থায় সুস্বাদু, মাংসবৃদ্ধিকারী, বৃংহণ ও বাজীকরণ বিশিষ্ট, স্থূলতা বৃদ্ধি পক্ষে, রতিক্ষীণতায় এবং মনস্তুষ্টি ও পুষ্টিবৃদ্ধি পক্ষে পাকাকলা শ্রেষ্ঠ। বহুমূত্র, মূত্রদোষ, বস্তিদোষ, ক্ষীণ-ক্ষত আশু নিবৃত্তি করিয়া থাকে। আময়িক প্রয়োগে কাচাকলা পরিপুষ্টাবস্থায় চূর্ণ করিয়া শিশুগণকে গরম জল সহ ভক্ষণ করাইলে বিনা দুগ্ধে কান্তিপুষ্টিসহ জীবন ধারণ করিতে পারে। কাচাকলা খোলাশুদ্ধ পোরের ভাতে সিদ্ধ করিয়া খোলা ফেলাইয়া দিয়া বিনা তৈল সহ লবণ যোগে পিষ্ট করিয়া ভক্ষণ করাইলে দুর্জ্জয় যকৃ', প্লীহা, আমদোষ, এবং শিশুগণের উদরাময় অনায় শান্তি হয়, এ অবস্থায় ইহা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেহ রোগের মধ্যাবস্থায় অপুষ্ট কাচাকলার ব্যঞ্জন মেহ দোষ ও জ্বালানিবারক হইয়া থাকে। কাচাকলা খোলাশুদ্ধ শুষ্ক করিয়া দুগ্ধ বা গরম জল সহ ভক্ষণ করা ব্যবস্থা। যে সকল শিশু সর্ব্বদা রুগ্ন, এবং সর্ব্বদা অজীর্ণ দোষে পাতলা বা ছিবড়ে দাস্ত জন্য জীর্ণশীর্ণ, তাহাদের এই কলা চূর্ণ অতীব ফলদায়ক। (ক্রমশঃ)

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(শ্রীইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়)

—·—·:*:·—·—

আমাদের দেশে আমিষ খাদ্যের মধ্যে দুইপ্রকার ভেদ আছেঃ যথা—মাংস ও মৎস্য। মৎস্যের ব্যবহার মাংসের অপেক্ষা অধিক, শরীর পোষণার্থ মাংসের প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বিলাতের ও আমেরিকার বড় বড়

ডাক্তারগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। মত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মিশ্র খাদ্যই মানব জীবন ধারণের বিশেষ উপযোগী। "মিশ্রখাদ্য" বলিতে আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই বুঝায়। দুই শ্রেণীর খাদ্য মিশ্রিতভাবে ব্যবহৃত হইলেই মানব শরীরের পূরণ হইতে পারে। জান্তব খাদ্যে নাইট্রোজেনের অংশ বেশী, এবং নিরামিষ খাদ্যে তাহার অনেক অভাব, বিশেষতঃ অঙ্গারক পদার্থ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। মনুষ্য-শরীরে উভয়বিধ উপাদানের প্রয়োজন। আমাদের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে মাংস ভোজন সম্যক উপকারী নহে। প্রতি নিয়ত মাংস ভক্ষণ করিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা, উদাহরণ স্থলে ইউরোপের কথা বলা চলে। যেমন সেখানে সকল সময় শীত বর্ত্তমান, সেইরূপ সেখানকার লোকেরাও সেই পরিমাণে গরম খাদ্য খাইয়া থাকে। গরম খাদ্যের মধ্যে মাংসই প্রধান। শীতকাল আমাদের দেশে মাংস ভোজনের প্রশস্ত সময়। কিন্তু মাংস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। স্থূল ও সুস্থ শরীরী প্রাণীর পরিবর্ত্তে রুগ্ন পশুর মাংস ভক্ষণে নানাবিধ রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর আমরা মাংসাদি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মশলাদি সংযোগে যেরূপ গুরুপাক করিয়া খাই, তাহা সবল ও নীরোগ শরীরে পক্ষেও গুরুপাক। দুর্ব্বল শরীরের জন্য সহজ পাচ্য মাংসই প্রশস্ত।

মৎস্যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনের ভাগ কম; কিন্তু ফস্‌ফরাস অর্থাৎ প্রস্ফুরক নমাক যে পদার্থ আছে, তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জন্যই মৎস্যাহারী বঙ্গবাসীগণ হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। যাঁহারা অতিশয় মস্তিষ্ক চালনা করেন বা চিন্তা করেন, অথবা মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত, মৎস্য তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মৎস্য জাতি দুই ভাগে বিভক্ত, যাহাদের মাংস সাদা, সেই জাতীয় মৎস্য সুপাচ্য ও পুষ্টিকর। বাটা, পুঁটী, মৌরলা প্রভৃতি মৎস্য এই শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়, সেই সকল মৎস্য অধিকতর পুষ্টিকর। ইহা আস্বাদে ভাল কিন্তু পাকে গুরু, রোহিত, কাৎলা, প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। কই; মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি মৎস্যে বসার ভাগ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ইহারা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গলদা চিংড়ী, ভেট্‌কি ও ইলিস মৎস্য দুষ্পাচ্য এবং অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময়, ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। সুতরাং এই সকল মাছ বেশী খাওয়া উচিত নহে। পচা মৎস্য বা শুষ্ক মৎস্য কোন ক্রমেই ভাল নহে। মৎস্যাহারের সুখে বঞ্চিত হওয়াও ভাল, তথাচ পচা ও শুষ্ক মৎস্য খাইয়া শরীরকে পীড়ার আবাসস্থান করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নয়। মাছ, মাংস আহার করিলে শরীর বলিষ্ঠ হয় ও চক্ষের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। এসম্বন্ধে একটী শাস্ত্রীয় শ্লোক আছে যথা—

কফঃ পিত্তঃ করো মৎস্য
স্নিগ্ধ কর এব চ।

অর্থাৎ মৎস্য কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি করে, কিন্তু স্নিগ্ধ মস্তিষ্কের পক্ষে গুণ বিশিষ্ট।

ধরিতে গেলে, বাঙ্গালীর পক্ষে মৎস্য খাওয়া উপকারী। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা দেশে আমাদের জন্ম। সুতরাং কাল ও জলবায়ু বিশেষে আমাদের পক্ষে মাংস খাওয়াও শারীরিক তত অপকারী নহে। আমিষ ভোজীর সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ দেখা যায় না।

আমাদের দেশে হংস ডিম্বের অত্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। ডিম্ব অতি পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু গুরু পাক। ডিম্বে সালফর ফস্ফরাস অধিক পরিমাণে থাকে, তজ্জন্য উহা সহজে জীর্ণ হয় না। লবণ সংযোগে কাঁচা ডিম্ব খাইলে তাহা শরীরের বেশ পুষ্টি সাধন করে। সুতরাং ইহা শরীরের পক্ষে তত অপকারী নহে।

যাহারা মাছ মাংস না খাইয়া কেবল উদ্ভিজ্জ বা দুগ্ধ ঘৃতাদির দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে নিরামিষ ভোজী বলে। আমাদের দেশে যাহারা নিরামিষাশী, তাহাদের শরীরের অবস্থা বেশ ভাল। আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যগণ ও উচ্চ শ্রেণীর বিধবারা মাছ মাংস ভক্ষণ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের শরীরের অবস্থা তো সচরাচর বেশ ভাল বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। কারণ প্রত্যেক মৎস্যে রোগের বীজাণু আছে। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সেরূপ কোন ভয় নাই। নিরামিষাশী লোকেরা সেজন্য খুব কম সময়ই রোগাক্রান্ত হয়। উদাহরণ স্থলে হিন্দুস্থানের নাম করা চলে। তাহারা মাছ মাংস আদৌ খায় না। কিন্তু তাহারা মাছ মাংস না খাইয়া যেরূপ স্বাস্থ্যবান ও বলশালী হয়, আমাদের দেশে কয়টা মানুষ সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? মাছ মাংস না খাইলে সাত্ত্বিকভাবে হৃদয়কে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং ক্রমে ক্রমে ভগবানের পদে মতি গতি যায়। মৎস্য খাইলে রজোগুণ বৃদ্ধি করে। তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শরীরের রক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধর্ম্মেরদিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে উহা পরিত্যাগ না করিয়া থাকা যায় না। অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, করা বা মনোমধ্যে তদ্বিষয়ে আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বোতভাবে অন্যায়। যেমন হস্তির পদ চিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ এই অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদয় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংস ভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংস ভক্ষণ দ্বারা হিংসা জনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে মাংস ভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হইয়া থাকে, ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত। যাহার মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংস পরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া

নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য মাত্রেরই আত্ম প্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। মাংসভোজন পরিত্যাগধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ। অতএব অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধ ব্যতীত তৃণ কাষ্ঠ বা কাণ্ডের খণ্ড হইতে মাংস লাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংস ভোজন নিতান্ত দুষণীয় হইয়াছে। যদি ইহলোকে মাংসভোজী কেহ না হয়, তবে পশু হত্যা এক কালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংস ভোজীর নিমিত্তই জীব হত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা হত্যারূপ পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে তাহাদিগের আয়ুক্ষয় হয়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপতিত প্রাণীগণের মাংস ভোজন করে তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে ও যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিয়া রসনাকে তৃপ্ত ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব মাংস ভোজন ও আমিষ পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজী হওয়াই মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

কাশ্মীরের সাহায্য। ভূস্বর্গ কাশ্মীর ষ্টেট হইতে একটি ছাত্রকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা স্কলার সিপ দিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল দেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গ যদি এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কতক্ষণ ?

বাটী নির্ম্মাণ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতা করপোরেসন যে একবিঘা এগারকাঠা জমী দান করিয়াছেন, তাহার উপর শীঘ্র বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এজন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বেহারে আয়ুর্ব্বেদ।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বেহার গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সেখানে এজন্য আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা হইতেছে। কটকেও এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেহার গবর্ণমেণ্ট দুইহাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

চিকিৎসকের প্রয়োজন।—মেদিনীপুর মুগাবেড়িয়া হইতে সেখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মুগবেড়িয়া দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের জন্য একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন। আহার ও বাসস্থান বাদে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে প্রার্থীগণ জমীদার মহাশয়ের নিকট এজন্য পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—সম্প্রতি কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশন "মহাবোধি সোসাইটী ভবনে" হইয়া গিয়াছে। এই সভার কবিরাজ শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "অভ্র" শীর্ষক একটী হৃদয় গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভায় বহু শিক্ষিত কবিরাজ, ডাক্তার ও আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথি।—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যশোহর আয়ুর্ব্বেদীয় ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে পরিমাণ রোগীসংখ্যা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কালে আয়ুর্ব্বেদেরই জয় হইবার সম্ভাবনা। নিম্নে দুই প্রকার চিকিৎসালয়ের চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে—

এলোপ্যাথিক

সন	রোগীর সংখ্যা
১৯২০	২০৩৪২
১৯২১	১৮৮৬৩
১৯২২	১৭৮১৭

কবিরাজী

সন	রোগীরসংখ্যা
১৯২০ আগষ্ট হইতে সেপ্টেম্বর	৮৭৬
১৯২১	১১৯২৫
১৯২২	১২০৯৮

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েরও রোগী সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও এই চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

জমীদার দিগের নিকট নিবেদন।—দেশের জমিদারবর্গ সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কামনায় মনোযোগী হউন ইহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষভাবে নিবেদন জানাইতেছি। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির যুগে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের জন্যই সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা, সকল চিকিৎসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি দেশের যেরূপ অনাস্থা আসিয়া পড়িল, সেইরূপ দেশবাসী ইহার ফলে অল্পায়ু ও হীন স্বাস্থ্য হইতে আরম্ভ করিল। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উগ্র বীর্য্য বিদেশীয় চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে সম্যক প্রকারে উপযোগী, সে বিষয়ের অনেক যুক্তি প্রমাণ আমরা বরাবরই দিয়া আসিয়াছি। আমাদের সেই সকল যুক্তির কথা যদি দেশের লোকে মানিয়া চলেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি হইয়া ঋষি প্রচারিত আর্য্য চিকিৎসার গৌরব পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে, সেইরূপ দেশবাসীও পুনরায় স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া জগতের কার্য্য করিবার শক্তি লাভে সমর্থ হইবেন। এই দেশবাসীর প্রাণে এই মন্ত্রের অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবার জন্য দেশের জমীদার বর্গকে অগ্রণী হইতে হইবে। আগে জমিদারবর্গ যেরূপ তাঁহাদের বাটীতে একজন কবিরাজ রাখিতেন, এখনও তাঁহারা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছেন। এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে তাঁহারা উৎসাহ দিবার জন্য আপন আপন বাটীতেই পারিবারিক চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিলে ইহাদের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিবেন। আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর চিকিৎসক নির্ব্বাচন করিয়া দিতে রাজি আছি।
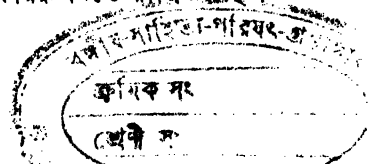
আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ } বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। { ৮ম ও ম সংখ্যা।

"অভ্র"*

[কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি]

—— •:•:• ——

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সমূহের মধ্যে অভ্র একটী বিশিষ্ট ঔষধ। অভ্রভস্ম—অনুপান ভেদে বহুব্যাধি নাশক এবং আয়ুর্ব্বেদীয় বহু উত্তমোত্তম ঔষধের বিশিষ্ট উপাদান।

পারদ ও স্বর্ণাদি ধাতু পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ কোন কোন রোগে তাঁহাদের স্বীয় প্রণালীতে ঔষধ কার্য্যোপযোগী করিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু অভ্র ঔষধার্থ ব্যবহার করা যায়, একথা তাঁহারা ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের স্থূলদৃষ্টি অভ্রের আকার ও বর্ণ নির্দ্ধারণে নিবদ্ধ। সেই জন্য তাঁহারা আকার ও বর্ণভেদে অভ্রের বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। সেই বিভিন্ন নাম সমূহ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেননা সেই সমস্ত নামের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোন সংশ্রব নাই। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্র মতে কৃষ্ণাভ্রের উপাদান পদার্থ সমূহের মধ্যে লৌহের অংশও আছে। আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের নিকট এই বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল না। বজ্রাভ্রের সত্ত্বপাতন-প্রকরণে লিখিত আছে যে, অভ্র হইতে সত্ত্বপাতন কালে যে সকল অভ্রসত্ত্ব কোষ্ঠিকাযন্ত্রের

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

অর্থাৎ হাপরের তলায় পড়িয়া থাকে, সেই গুলিকে চুম্বক প্রস্তর দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। রসতন্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অভ্র হইতে নিঃসৃত সত্ব হইতে জাত যে লৌহ তাহা চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, যে চূর্ণ পাওয়া যায়; উহা অঞ্জন সদৃশ। আমাদের রসশাস্ত্র এবম্বিধ সম্পূর্ণ যে, সেই সিদ্ধান্তগুলি পাশ্চাত্য রসায়ন পণ্ডিত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী এবং সকলেরই এই রসশাস্ত্র সম্যক অনুশীলন করা উচিত। তাহা না করিয়া কেবল কেমিষ্ট্রী পড়া উচিত বলিয়া ব্যস্ত হইলে কি হইবে? অনেক স্থানেই শুনি যে, কবিরাজ মহাশয়দিগের কেমিষ্ট্রী জানা উচিত।

অভ্রের উৎপত্তি ভেদ।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অভ্রকে উপরস বলিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্য বাগ্‌ভট ও শ্রীমৎ যশোধর প্রভৃতি মনীষিগণ অভ্রকে মহারস বলিয়াছেন। রসার্ণবতন্ত্রে আছে, একদা শ্রীশ্রীদেবী পার্ব্বতী শ্রীশ্রীমহাদেবের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বীয় বীর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্খলিত বীর্য্য—ভূমিতে পতিত হয়। শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ—ভূমিভেদে উক্ত গৌরীতেজঃ চারিবর্ণের অভ্ররূপে পরিণত হয়। পৌরাণিকগণের মতে—যে সময় দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন, জলদাগ্নি সন্নিভ বজ্র আকাশ মার্গে সঞ্চরণ কালে যে সমস্ত স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্ফুলিঙ্গ পর্ব্বতে পতিত হয়। তদবধি পর্ব্বতে অভ্র জন্মিতে লাগিল। দক্ষিণ পর্ব্বতে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক, এজন্য দক্ষিণ পর্ব্বতে জাত অভ্র অল্প সত্ববিশিষ্ট। আর উত্তর পর্ব্বত (হিমালয়ে) জাত অভ্র অধিক সত্ব ও গুণ সম্পন্ন। সুতরাং অভ্র—গগন (আকাশ) হইতে পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া গগন এবং বজ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া বজ্র নামে অভিহিত হয়। কোন কোন ঋষির মতে চারিবর্ণের অভ্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির দ্বারা বিভাগ করেন। শ্বেত—ব্রাহ্মণ, রক্ত—ক্ষত্রিয়, পীত—বৈশ্য এবং কৃষ্ণ—শূদ্র। রসশাস্ত্রবিদ মহর্ষিগণ বলেন যে, বর্ণভেদে চারি প্রকার এবং সেই চারি বর্ণের অভ্র তীব্র অগ্নি সন্তাপে পরীক্ষা করিলে (১) পিনাক (২) দর্দ্দুর (৩) নাগ এবং (৪) বজ্র এই চারি প্রকার ভেদ উপলব্ধি হয়। সুতরাং বর্ণ দেখিয়া অভ্র লইলে চলিবে না। অগ্নি পরীক্ষা বিশেষ রূপে আবশ্যক। বর্ণ ও পিনাকাদি ভেদে অভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে যে অভ্র হইতে "চিটীপিটী" শব্দ হয়, তাহাকে পিনাক কহে। কাহারও মতে অগ্নিতে প্রদান করিলে পিনাক অভ্রের স্তরগুলি শীঘ্র খুলিয়া যায়। দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে ভেক শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। কাহারও মতে দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে দিলে লাফাইয়া উঠে, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। যে অভ্র অগ্নিতে দিলে সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে বা ফুৎকারের ন্যায় শব্দ করে, তাহাকে নাগাভ্র কহে। পিনাক অভ্র সেবনে কুষ্ঠরোগ, দর্দ্দুরাভ্র সেবনে

মৃত্যু এবং নাগাভ্র সেবনে ভগন্দর রোগ জন্মায়। বজ্রাভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে পূর্ব্ব বর্ণিত অভ্রাদির মত কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা বজ্রবৎ অটল বা স্থির ভাবে থাকে। এই বজ্রাভ্র পারদ গ্রাসদানে রসায়ন কার্য্যে এবং বহুবিধ ব্যাধি নিবারণে প্রযুক্ত হয়। শ্রীমৎ গোবিন্দ ও ভগবৎ পাদাচার্য্য বলিয়াছেন, বজ্রাভ্র অগ্নিতে দ্রব্যান্তর সংযোগে আগ্নাভ হইয়া সত্ত্বনিঃসরণ করে; অপর অভ্র কাচ অথবা কিট্ট ত্যাগ করে। সুতরাং সকল প্রকার অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই শ্রেষ্ঠ। অপর অভ্রের বিষয় শাস্ত্রে এই মাত্র উল্লেখ আছে,যে, রক্ত ও পীত বর্ণের স্বর্ণ সংযোগে জারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের অভ্র রৌপ্য সহযোগে জারণার্থ প্রযুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে শ্বেত অভ্রের ভস্ম প্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা নেত্র রোগে পরম হিতকর। প্রশস্ত অভ্রের লক্ষণ স্নিগ্ধ (বেশ চক্চকে অর্থাৎ মলিন বা খসখসে নহে) দল বা স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু, যে বর্ণের অভ্র, সেই বর্ণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে, স্তরগুলি সহজে খুলিতে পারা যায় এবং অধিক ভার সম্পন্ন হয়।

অভ্র শোধন, জারণ ও মারণ বিধি।

অভ্রকে সেবনের বা ঔষধের উপযোগী করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্বিবিধ উপায়ের অন্যতর বিধানের আশ্রয় লইতে হয়।

প্রথম বিধান—অভ্রশোধন, শোধিত অভ্রকে ধান্যাভ্র বা সূক্ষ্মচূর্ণরূপে পরিণত করিয়া সেই চূর্ণ বা অভ্রকে মারণ বা ভস্মীকরণ এবং নিশ্চন্দ্র অভ্র ভস্ম হইলে উহার অমৃতীকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার করা।

দ্বিতীয় উপায় বিধান—অভ্র হইতে সত্ত্বপাতন করিয়া সেই সত্ত্বকে শোধন করা, শোধিত অভ্র—সত্ত্বকে মারণ বা ভস্ম করা। অভ্রসত্ত্ব ভস্মীকৃত হইলে উহার অমৃতীকরণ সম্পাদন পূর্ব্বক ঔষধার্থ ব্যবহার করা।

অভ্র শোধন।

অভ্রশোধন (১ম প্রকার) বজ্রাভ্র প্রবল অগ্নিতে দিয়া উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার কাথে ডুবাইবে। এইরূপে ত্রিফলার কাথে ৭ বার ডুবাইবে। গোমূত্রে ৭ বার ডুবাইবে, তৎপরে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কাঞ্জিকে ডুবাইলে অভ্র শুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় প্রকার—অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া শুষ্ক কুলের কাথে ডুবাইবে, এইরূপ ৭ বার করিয়া লইবে। সেই অভ্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, এই উপায়ে অভ্র শোধিত হইলে আর ধান্যাভ্র প্রস্তুত করিতে হয় না। এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে অভ্র শোধিত হয়।

ধান্যাভ্র—শোধিত অভ্রের চূর্ণের চতুর্থাংশ শালিধান্যের সহিত বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া তিনদিন কাঞ্জিকে ভিজাইয়া রাখিবে, তিনদিন পরে যে সকল সূক্ষ্ম অভ্রকণা বস্ত্র হইতে নির্গত হইবে, তাহাকে ধান্যাভ্র কহে। কাহারও কাহারও মতে উহা কম্বলে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

অভ্র মারণ। এইরূপে শুদ্ধ অভ্রকে মারণ বা ভস্ম করিতে হয়। এই মারণ বা পুট প্রদান বিধি, এক পুট, তিন পুট, দশ পুট হইতে সহস্র পুটের বিধান আছে। কিন্তু এ কথা সকল রসগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অশুদ্ধ অভ্র কখনও ব্যবহার করিবে না।

এবং সচন্দ্রিক অভ্র ভস্ম কখনও ব্যবহার করিবে না সুতরাং যতক্ষণ অভ্রভস্ম নিশ্চন্দ্র না হয়, ততক্ষণ তাহাকে পুট প্রদান করিতে হইবে।

মহামতি যশোধর বলেন,—

"যথা বিষং যথা বজ্রং শস্ত্রাগ্নি প্রাণহা যথা।
ভক্ষিতং চন্দ্রিকাযুক্তং অভ্রকং তাদৃশং গুণৈঃ॥

অর্থাৎ সচন্দ্রিক অভ্র ভস্ম সেবনে বিষাদি ভক্ষণের ন্যায় নানা প্রকার ব্যাধি জন্মায় এবং অবশেষে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আজকাল যেরূপ অকাল মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অশুদ্ধ ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবন যে তাহার অন্যতম কারণ নহে, এ কথা কে বলিতে পারে?

পুট প্রদানের সাধারণ নিয়ম এই যে, মারণীয় দ্রব্যের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথে অভ্রকে ১২ ঘণ্টা কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া 'টিকিয়া' (চন্দ্রাকৃতি পাতলা পিষ্টক) প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাত্রে ঘুঁটের জ্বালে পুট প্রদান করিতে হয়।

অভ্র ভস্ম।

* (১ম প্রকার) মারক দ্রব্য যথা, কাঁটা নটে, বৃহতী, পান, তগরপাদুকা, পুনর্ণবা, হিঞ্চা, ইন্দুরকানীপানা, ময়না ফল, আকন্দ, আদা, কট্‌কী, পলাশ বীজ ও রাখাল শসার মূল—এই সমস্ত দ্রব্যের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথে অভ্রকে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া পুট প্রদান করিবে। অধিক পুট প্রদান করিলে অধিক ফলপ্রদ হয়। কিন্তু নিশ্চন্দ্র না হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতেই হইবে।

একপুটী অভ্রভস্ম।—ধান্যাভ্র৹ একভাগ সোহাগা দুইভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া অন্ধ মূষায় নিরুদ্ধ করিয়া পুট প্রদান করিতে হয়। এই বিধানে একপুট অভ্র ভস্ম হয়।

তিনপুটী অভ্র ভস্ম—শোধিত অভ্র—এরণ্ড পত্রের রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুরাতন গুড় দ্বারা পুনরায় মর্দ্দিত করিয়া 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শরাবের নিম্নে বটপত্রের আস্তরণ করিয়া তাহার উপর অভ্র রাখিয়া পুনরায় তাহার উপর বটপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া গজপুটে পুট প্রদান করিতে হয়। এইরূপে মোট তিনপুটে অভ্র ভস্ম হয়।

দশপুটী অভ্র ভস্ম—শোধিত অভ্রকে অর্কক্ষীর দ্বারা উত্তমরূপে ১২ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিয়া 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুটে পুট প্রদান করিবে। এইরূপে অর্ক ক্ষীর দ্বারা ৭ বার পুট দিয়া বটজটা ক্বাথ দ্বারা তিনটী পুট প্রদান করিতে হয়। এইরূপে দশপুটে অভ্র ভস্ম হয়।

বিংশপুটী অভ্র—শোধিত অভ্রকে বট জটা ক্বাথ দ্বারা উত্তমরূপে ১২ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিয়া 'টীকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুটে পুট প্রদান করিবে। এই-রূপে পানের রস, বাসকের রস, হিঞ্চাশাকের রস, উচ্ছেপাতার রস, ব্রাহ্মীশাকের রস এবং বটক্ষীরের সহ মর্দ্দন করিয়া মোট ২০ পুট প্রদান করিলে অভ্র ভস্ম সিন্দূর সদৃশ হয়।

এক চত্বারিংশ পুট দ্বারা ভস্মীকৃত অভ্র। শোধিত অভ্রকে (১) মুথার ক্বাথে (২) পুনর্ণবার রসে (৩) কালকাসন্দে পাতার রসে (৪) পানের রসে (৫) আকন্দের ক্ষীরে (৬, বট

জটার ক্বাথে (৭) তালমূলীর রসে (৮) গোক্ষুরের ক্বাথে (৯) আলকুশীবীজের রসে (১০) কলার এঁটের রসে (১১) কুকশেখাড়ার রসে (১২) লোধের ক্বাথে যথাক্রমে পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া ১২টি করিয়া পুট প্রদান করিবে। পরে গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া একটি করিয়া পুট প্রদান করিবে। এইরূপে ভস্মীকৃত অভ্র সর্ব্ব ব্যাধিহর এবং ইহা সমস্ত ঔষধে প্রয়োগ করিবার উপযোগী। অধিকন্তু এই বিধানে ভস্মীকৃত অভ্রের অমৃতীকরণ করিতে হয় না।

৩০পুটী অভ্র—শোধিত অভ্রকে মুথার ক্বাথ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩০টী পুট প্রদান করিবে; পরে অভ্রের ষোড়শ অংশ সোহাগা মিশাইয়া কাঁটানটের রস দিয়া ৩০টী পুট দিবে। এইরূপে ৬০ পুট দ্বারা ভস্মীকৃত অভ্র সিন্দুর সদৃশ হয়, এবং কুষ্ঠ, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে অমৃততুল্য ফলপ্রদ হয়।

১০০ পুটী অভ্র—শোধিত ধান্যাভ্রকে কালকাসুন্দে পাতার রস দিয়া শতবার পুট প্রদান করিলে নিশ্চন্দ্র ভস্ম হয়। এই অভ্র ভস্ম সর্ব্ব রোগহর এবং সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

সহস্র পুটী অভ্র ভস্ম—বজ্রাভ্রে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া গোদুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ৭ বার করিলে অভ্র শোধিত হইবে, সেই অভ্রকে ঘৃতদ্বারা লৌহপাত্রে মৃদুতাপে ভাজিবে। তৎপরে সেই অভ্রকে পাদাংশ পরিমিত শালি ধান্যের সহ বস্ত্রে বা কম্বলে বাঁধিয়া তিনদিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেই বস্ত্রগালিত সূক্ষ্ম অভ্র চূর্ণকে রৌদ্রে শুকাইবে। সেই অভ্রকে নিম্নোক্ত মারক দ্রব্যের যথাযোগ্য রসে বা ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া পৃথক পৃথক প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত ১৬টী পুট করিবে। নিম্নলিখিত মারক দ্রব্যের সংখ্যা ৬৩, সুতরাং প্রত্যেক দ্রবের সহ ১৬ বার পুট প্রদান করিলে অষ্টোত্তর সহস্র পুট দ্বারা অভ্র ভস্ম হইবে। মারক দ্রব্য যথা—

(১) আকন্দের ক্ষীর (২) বটের ক্ষীর (৩) মনসার ক্ষীর (৪) ঘৃতকুমারী (৫) এরণ্ডপত্রের রস (৬) মুথার রস বা ক্বাথ (৭) গুলঞ্চের ক্বাথ বা রস (৮) সিদ্ধির ক্বাথ (৯) কটকীর ক্বাথ (১০) গোক্ষুরের ক্বাথ (১১) বৃহতীর ক্বাথ (১২) শালপানির ক্বাথ (১৩) চাকুলের ক্বাথ (১৪) শ্বেত সর্ষপের ক্বাথ (১৫) আপাংপত্রের রস (১৬) বটজটার ক্বাথ (১৭) ছাগরক্ত (১৮) বিল্বপত্রের রস (১৯) গণিয়ারিছালের ক্বাথ (২০) চিতামূলের ক্বাথ (২১) গ্লাবের রস বা ক্বাথ (২২) হরীতকীর ক্বাথ (২৩) পারুল ছালের ক্বাথ (২৪) গোমূত্র (২৫) আমলকীর রস (২৬) বহেড়ার ক্বাথ (২৭) পানশেওলার রস (২৮) তালিশ পত্রের ক্বাথ (২৯) তালমূলীর রস (৩০) বাসক পাতার রস (৩১) অশ্বগন্ধার ক্বাথ (৩২) বকুলগাছের পাতার রস (৩৩) ভৃঙ্গরাজের রস (৩৪) কলার এঁটের রস (৩৫) ছাতিমছালের রস (৩৬) ধুতরাপাতার রস (৩৭) লোধের ক্বাথ (৩৮) দেবদারুর ক্বাথ, (৩৯) তুলসীপাতার রস (৪০-৪১) শ্বেত ও কৃষ্ণ দুর্ব্বার রস (৪২) কালকাসুন্দের পাতার রস (৪৩) মরিচের ক্বাথ (৪৪) ডালিমের রস (৪৫) কাকমাচির রস (৪৬) শঙ্খপুষ্পীর রস (৪৭) তগর পাদুকার রস (৪৮) পানের রস

(৪৯) পুনর্ণবার রস (৫০) থুলকুড়ির রস (৫১) রাখালশশার মূলের কাথ (৫২) বামনহাটীর কাথ (৫৩) হস্তী ঘোষা পাতার রস (৫৪) কাঁচা কয়েৎ বেলের রস (৫৫) শিবালক্ষীর কাথ (৫৬) কুটবল্লীর কাথ (৫৭) পলাশবীজের কাথ (৫৮) ঘোষাপাতার রস (৫৯) ইন্দুর কানীর রস (৬০) দুরালভার কাথ (৬১) ব্রাহ্মীশাকের রস (৬২) কালজীরার কাথ (৬৩) দেবদারুর নির্য্যাস।

এই বিধানে অষ্টোত্তর সহস্র পুটীত অভ্রই অতি উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় উপায়—অতঃপর অভ্রের দ্বিতীয় উপায় লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ কিরূপে অভ্র হইতে সত্ত্ব বাহির করিয়া, সেই অভ্রকে শোধন ও মারণ পূর্ব্বক সেবন করিতে হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। সত্ত্বপাতন—(প্রথম প্রকার) সর্জ্জিকা ক্ষার, শ্বেত গুঞ্জা ও যব-ক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য অভ্রের দশমাংশ লইয়া শোধিত অভ্রচূর্ণকে মহিষীর ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মল ও মূত্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, সেই পিণ্ডগুলি কোষ্ঠিকা যন্ত্রে (হাপরে) আধ্মাত করিলে সেই পিণ্ড হইতে সত্ত্ব নির্গত হয় এবং সেই সত্ত্ব হাপরের মধ্যে পাওয়া যায়। (১)

(দ্বিতীয় প্রকার) শোধিত অভ্র চূর্ণের এক চতুর্থাংশ টঙ্কন মিশাইয়া তালমূলীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, সেই পিণ্ড-গুলিকে হাপরে দিয়া আধ্মাত করিলে অভ্র হইতে সত্ত্ব নির্গত হইবে। (২)

তৃতীয় প্রকার—ধান্যাভ্র ৩২ পল, লাক্ষা, শ্বেত গুঞ্জা, পুঁটী মাছের আঁস, মেষদুগ্ধ, মধু, সর্ষপ, সজিনার বীজ, তিলের খোল, সৈন্ধব, হরিণের শৃঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ৩২ পল, বাসক পাতা, কাটানটে,কালকাসুন্দা, হিঞ্চা, গোয়ালিয়া পাতা ও উচ্ছে পাতার রস দিয়া পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া এক পল গোধূম চূর্ণ দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইবে। তাহার পর ঐ বটকগুলি খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে কোষ্ঠিকা যন্ত্রে রাখিয়া তীব্র তাপ দিবে। এইরূপ তাপ দিতে দিতে বটক হইতে সত্ত্ব নির্গত হইবে। সেই অভ্র সত্ত্বের বর্ণ কাংস্যের মত হইবে। সত্ত্ব গ্রহণের পর যে কিট্ট ভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় গোময় দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটক প্রস্তুত করিয়া পুনরায় কোষ্ঠিকা যন্ত্রে রাখিয়া তাপ দিলেই অবশিষ্ট সত্ত্বও নির্গত হইবে। নিঃসৃত অভ্র সত্ত্ব যদি অত্যন্ত কঠিন হয়, তবে মধু, তৈল, বসা ও ঘৃত দ্বারা দশবার পুট দিলে মৃদু হয়।

সত্ত্ব পাতন (৪র্থ প্রকার) একদিন অভ্রকে কাঞ্জিক দ্বারা ভাবনা দিবে, তৎপরে কলার এঁটের রস, ওলের রস ও শুষ্ক মূলার কাথ দিয়া মর্দ্দন করিয়া সোহাগা ও পুঁটি মাছের আঁস সমান ভাগে দিয়া মহিষীর বিষ্ঠা দিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক গুলি শুকাইয়া প্রবল অগ্নিতে হাপরে আধ্মাত করিলে কাংস্যের ন্যায় অভ্র সত্ত্ব পতিত হয়। ইহার জারণ ও মারণ তাম্রের ন্যায়। এই অভ্র সত্ত্ব শীতবীর্য্য, ত্রিদোষ নাশক, রসায়নে হিত কর, বয়ঃস্থাপক। ইহার ন্যায় পুরুষত্বের তেজ বৃদ্ধিকারক ঔষধ আর নাই।

অভ্র সংশোধন বিধি—অভ্র সত্ত্বকে চূর্ণ

করিয়া পাষান খলে গব্য ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া, গব্যঘৃতে ভাজিবে। পুনরায় আমলকীর রস দিয়া ভাজিবে, তৎপরে পুনর্ণবা, বাসক এবং কাঞ্জিক দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মোট দশটী পুট, প্রদান করিবে। ইহাতে অভ্র সত্ত্ব সংশোধিত হইবে। (৩)

(শোধন অন্যপ্রকার) অভ্রসত্ত্বকে চূর্ণ করিয়া গব্যঘৃত দ্বারা অগ্নিবর্ণ করিয়া ৭ বার ভাজিবে।

সত্ত্বমারণ—শোধিত অভ্রসত্ত্বের দশমাংশ গন্ধক মিশাইয়া বটমূলের ক্কাথে ২০ পুট দিবে, পুনরায় ত্রিফলার ক্কাথ দ্বারা ২০ পুট, মুণ্ডিরীর ক্কাথ দ্বারা ২০ পুট, শুষ্ক মূলার ক্কাথ দিয়া ২০ পুট এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা ২০ পুট দিবে। এইরূপে শত পুট দ্বারা সাধিত অভ্রসত্ত্ব ভস্ম সর্ব্বরোগে হিতকর।

অভ্রভস্মের অমৃতীকরণ বিধি—৮ পল গব্যঘৃত লৌহপাত্রে দিয়া, ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ১০ পল অভ্রভস্ম দিয়া উত্তমরূপে ভাজিবে, তাহার পর তাহাতে ১৬ পল ত্রিফলার ক্কাথ দিয়া মৃদু তাপে পাক করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। অল্পসংখ্যক পুটদ্বারা ভস্মীকৃত অভ্রের অমৃতীকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্বেত অভ্রভস্ম—শ্বেত অভ্রকে গোমূত্রাদি দ্বারা শোধিত করিয়া লইবে। পরে শোধিত শ্বেত অভ্র ১২ তোলা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মনসা ক্ষীর, বট ক্ষীর, ও অর্ক ক্ষীরে ৭ বার করিয়া ডুবাইবে। তাহারপর ঐ অভ্রকে ৪০ দিন সির্কা বা শুক্তে ভিজাইবে, তৎপরে উহাকে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে।

ঐ অভ্র চূর্ণের সহিত শোধিত পারদ ॥০ তোলা এবং বাবলার ফুল ১ তোলা দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটকগুলিকে পুনরায় সির্কা দিয়া খলে ভিজাইয়া প্রত্যহ একবার করিয়া মর্দ্দন করিবে। এইরূপে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া বেশ ঘন হইলে 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুট প্রদান করিবে। এইরূপে সির্কা দিয়া ৩ পুট দিবে। পরে এই অভ্রভস্মের অমৃতীকরণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি পরিমাণ খাইলে অন্ধও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে।

অভ্রভস্মের অনুপান নিত্য সিদ্ধনাথ বলিয়াছেন —

"যোজয়েৎ অনুপানৈর্বা তৎ তৎরোগ হরং ক্ষণাৎ।"

মকরধ্বজের ন্যায় অভ্রভস্ম ও অভ্রসত্ত্ব অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক। রসশাস্ত্রে যে যে রোগে যে যে অনুপান লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দিলাম। বুদ্ধিমান চিকিৎসক অনুক্ত রোগের অনুপান শাস্ত্র ও যুক্তিমত নির্দ্দেশ করিবেন। বায়ু শান্তির নিমিত্ত—বেড়েলা মূলের রস বা ক্কাথ; পিত্ত শান্তির জন্য (১) গোদুগ্ধ ও মিছরির অথবা (২) দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর ও চিনি সহ।

কফজন্য রোগে কটছাল চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও মধু দিয়া।

অর্শরোগে—(১) শোধিত ভল্লাতকের সহিত (২) অথবা ত্রিফলা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বড়এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, চিনি ও মধু।

মন্দাগ্নিতে—সর্ব্বপ্রকার ক্ষারের সহিত।

পাণ্ডুরোগে—ত্রিফলা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও মিছরি সহ।

রক্তপিত্তে—চিনি,বড় এলাচ চূর্ণ ও মধু।

ক্ষয়রোগে—(১) স্বর্ণভস্ম সহ (২) অথবা ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, মিছরী ও মধুসহ।

বাতব্যাধিতে—অশ্বগন্ধা, শুঁঠ, কুড়,বামুন হাটী ও মধুসহ।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুনছালের চূর্ণের সহ সহস্র পুটিত অভ্র ভস্ম, অর্জ্জুনছালের ক্বাথসহ ৭।৮ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী প্রস্তুত করিয়া অর্জ্জুনের সহ সেব্য।

মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে—সর্ব্বপ্রকার ক্ষারসহ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহে—বড় এলাচ,গোক্ষুর বীজ, ভুঁই আমলা, মিছরী ও গোদুগ্ধ সহ।

প্রমেহে—(১) হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু অথবা (২) গুলঞ্চের সত্ব বা পালো ও মিছরী। (৩) শোধিত শিলাজতু, পিপুলচূর্ণ ও স্বর্ণ মাক্ষিকভস্মসহ (৪) ত্রিফলাচূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ সহ।

ব্রণরোগে—মূর্ব্বার সত্বসহ।

নেত্ররোগে—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ।

বলবৃদ্ধির জন্য—ভুমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও দুগ্ধ সহ।

ধাতুর পুষ্টি বর্দ্ধনার্থ—সিদ্ধির কাথের সহ।

বাজীকরণার্থ—(১) শিমুলমূল চূর্ণ, ভৃঙ্গরাজের মূল চূর্ণ, চিনি ও মধুসহ। অথবা (২) অশ্বগন্ধা, শতাবরী, শিমুলমূল, চিতামূল, তালমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, ভুমিকুষ্মাণ্ড ও আলকুশী বীজ ও পদ্মের কন্দ—এই সমস্ত সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমুদয়ের সমান নিশ্চন্দ্র অভ্রভস্ম মিশাইয়া চিনি ও দুগ্ধ দিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন।

রসায়নার্থ—অভ্রভস্ম শ্রেষ্ঠ (শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অনুপান)।

বিবিধ রোগে—(১) ক্ষয়, অর্শ, পাণ্ডু রোগে—ত্রিফলা, ত্রিকুট, দারুচিনি, বড়এলাচ তেজপত্র, নাগেশ্বর, চিনি ও মধুসহ।

(২) পাণ্ডু, গ্রহণী, ক্ষয়, শূল, উদ্ধজত্রু গতরোগ, উদরী, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অরুচি ও মন্দাগ্নিতে—ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ ও গব্য ঘৃতসহ।

অভ্রভস্মের গুণ—অমৃততুল্য, বায়ুনাশক, পিত্তনাশক, ক্ষয়রোগনাশক, বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে, শরীরকে জরাগ্রস্থ হইতে দেয় না। আয়ুবর্দ্ধক ও শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য অথচ কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির উদ্দীপক এবং অনুপানভেদে সর্ব্বব্যাধি নাশক।

অভ্র সেবনকালীন নিম্নলিখিত দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত—ক্ষার, অম্ল, দাল, কুল, কাঁকড়ী বা কাঁকুর, করেলা, বেগুণ, বাঁশের কোঁড় ও ব্যঞ্জনাদিতে তৈল।

অভ্রের মাত্রা—শরীরের ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া ½ রতি হইতে ১ রতি। ইহার অধিক মাত্রায় সহ্য হয় না, তবে রোগ বিশেষে সহ্য হইলে আরও কিছু বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

অভ্রদ্রুতি—অভ্র প্রসঙ্গে অভ্রদ্রুতির বিষয় না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেজন্য অভ্র-দ্রুতির বিষয় লিখিত হইল। দ্রুতি অর্থে তরলতা সম্পাদন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অভ্র বা অভ্রসত্ব তরল পদার্থরূপে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুতি সাধন কহে।

শোধিত অভ্রসত্ব ও সৌবর্চ্চল লবণ সম-

ভাগে হাড়জোড়া লতার রস দিয়া মর্দ্দন করিয়া শরাবে রাখিয়া বহুবার পুট দিলে অভ্র দ্রবীভূত হয়।

অন্য প্রকার—শোধিত অভ্রচূর্ণকে বক পত্রের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ওসের মধ্যে রাখিয়া উক্ত ওসকে একমাস গোগৃহের নিম্নে পুতিয়া রাখিলে অভ্র পারদের ন্যায় তরল হয়। অভ্রদ্রুতির আরও বহু বিধান আছে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা লিখিত হইল না। রসশাস্ত্রে অধিকতর মনঃ সংযোগ করাইবার জন্যই এই প্রবন্ধে এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইল, নচেৎ মাদৃশ অল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

মহামতি বাগভট বলিয়াছেন—

"দ্রুতয়ো নৈব নির্দ্দিষ্টাঃ
　　শাস্ত্রে দৃষ্টা হ্যপি ধ্রুবম্।
বিনা শম্ভোঃ প্রসাদেন ন
　　সিধ্যন্তি কদাচন॥"

একাগ্রচিত্তে রসশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই রসরূপী মহাদেব অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

এই সমস্ত জারণ মারণ কার্য্য অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর ভার দিয়া থাকিলে আর চলিবে না। এই রসশাস্ত্রের উপরই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা যদি আলস্যবশে বা অন্য কারণে রসশাস্ত্রের অবহেলা করিয়া যাই, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের মহিমাই হীনপ্রভ হইবে। অনেক স্থলে সচন্দ্রিক অভ্রযুক্ত ঔষধ রোগীর হস্তে প্রদত্ত হইতে দেখিয়া আমি এতদূর ব্যথিত হইয়াছি যে, এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি এজন্য কেহ আমার দোষ লইবেন না। শৃঙ্গাবাভ্র, নাগার্জ্জুনাভ্র ও মহালক্ষ্মীবিলাসাদি যে অত্যন্ত ফলপ্রদ, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধের জীবন—অভ্র। সেই অভ্রকে যথাশাস্ত্র শোধন মারণ ও অমৃতীকরণ না করিলে উক্ত ঔষধগুলি জীবনহীন হইয়া রোগে প্রযুক্ত হইয়া চিকিৎসকের সুবিমল যশকে মলিন করিবে। তাই বলিতেছিলাম সকলে রসশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। প্রথমে একটী বিধানে অভ্র ভস্ম করিয়া দেখিবেন। এতগুলি পুট দিয়া অভ্র নিশ্চন্দ্র হইল। আবার অন্য বিধানে পুট দিয়া দেখিবেন কত পুটে অভ্র নিশ্চন্দ্র হয় এবং আমাদের সাধের 'আয়ুর্ব্বেদ সভা'য় 'তদ্বিদ্য সম্ভাষা সভা'র অধিবেশনে আপনাদের অভিজ্ঞাত কথা ব্যক্ত করিয়া আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের যশ প্রচারিত হউক। ইহারই নাম আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা, ইহাতে বহু রোগীর জীবন রক্ষা হইবে। আমার লেখনী যদি কিছু অসংলগ্ন কথা লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা নিজ জ্ঞানদ্বারা সংশোধিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

বুড়ী ঠানদিদির উপদেশ।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি, এ,]

পেটটা জোড়া পীলে গো যার, ছেলে হবে কি ?
ভাতের সঙ্গে খাস্‌নে তোরা কাঁচা ভেজাল ঘি।
পানটা খেতে পার, কিন্তু জরদা খৈনি কেন ?
(দেখ) বেণো জল পুকুরে ঢুকে ক্ষতি করে না যেন।
পচা, বাসি, ভেজাল প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই ;
খাদ্য নয় সে মৃদু বিষ—উহু কি বালাই !
তোমরা যদি খাদ্যাখাদ্য না কর বিচার,
ছেলেপুলেও চোখ বুঁজে গো খাবে সে খাবার।
অনুকরণ করছে তা'রা তোমার আচরণ ;
তুমিই তাদের মাপকাঠি আদর্শ অনুক্ষণ।
(যেন) ছেলেমেয়ের সাম্‌নে না হয় হাস্য পরিহাস ;—
ঘোড়া সওয়ার মান্‌বে কেন ছাড়লে হাতের রাশ।
চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করা সব চেয়ে যে ভাল ;
এমন করে মারবে না যায় পিঠটা হয় গো কাল।
স্নেহ, যত্ন, নীতি শিক্ষায় মানুষ কর ছেলে,—
বাল্যে কুশিক্ষাটা হ'লে যায় গো সে ত জেলে।
সদা রেখো তীক্ষ্ণ নজর শিশু-স্বাস্থ্যের প্রতি,
মায়ের এটা সুকর্ত্তব্য দায়িত্ব কঠোর অতি।
তোমার ছেলের দেহ-চরিত্র বিগড়ে যদি যায়,
তোমাদেরই দোষে সেটা আলস্য হেথায়।*

* * * * *

যখন তখন যাস্‌নে তোরা হোঁৎকা বরের কাছে ;—
পশুপাখীরও পাত্রাপাত্র কালাকাল বোধ আছে।

---

* অদাতা বংশ দোষেণ, পিতৃদোষেণ মূর্খতা।
রুগ্নতা মাতৃদোষেণ, কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা॥

'ঘরে' দিতে মেয়ে কেন ব্যস্ত হয় গো 'হেনা',
এঁচড়ে পাকা কাঁটাল কভু রসাল হবে না।
বয়স যখন হবে রে তার স্বামীর ঘরে যেতে,
মনটি পড়ে থাক্‌বে সদা কখন যাবে রেতে।
তাড়াতাড়ি করিস্ কেন ব্যস্ত রে বাতুল ?
প্রকৃতির ঠিক সময় হ'লে ফুট্‌বে চাঁপা ফুল।
আপনি যাবে ধরে ধারে, হবে যখন টান,—
ধ'রে বেঁধে কচুকে তুই করিস্‌নে রে মান।

* * * * *

রান্না বাড়া দেওয়া থোওয়া—এও ত নারীর কাজ ;
হাতা বেড়ী ধ'রে রাঁধা—ইথে কিবা লাজ ?
রিপুর সহিত কর্‌তে লড়াই ডরায় যে নৃপতি,
লেপ ছাড়ে না যে বিপ্র গো শীতে কাতর অতি,
রাঁধ্‌তে হবে শুন্‌লে যে স্ত্রীর প্রাণটা উড়ে যায়,
বিফল তাদের জন্ম বৃথা জীবন গো ধরায়।
লেখাপড়ার কাজটা সেরে খায় গো যবে ভাত,
পাইনে ভেবে কেমন করে মুখে ওঠে হাত।
গর্ভ ধারণ শিশুপালন (গৃহ) কর্ম্ম সম্পাদন,
(কর্‌বে) অবসরে কুটীর শিল্পে অর্থ উপার্জ্জন।
স্বামী গো যার কুলি কেরাণী, দেমাক তার কি সাজে
দুপুর বেলা খাওয়ার পরে কেন মজলিস বাজে ?
অনেক কাজও কর্‌তে পারে ঘরে ব'সে নারী—
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা কেন যাও গো নবীন প্যারী ?
চালের দুটো কাঁকর বেছেও কর্‌বে উপকার,—
স্বামীপুত্রের স্বাস্থ্য সুখ কি কাম্য নয় তোমার ?
বাঁচ্‌লে তারা দশের দেশের হবে কত কাজ,
তোমারও গো হাতের 'নোয়া' বজায় থাক্‌বে আজ।
রান্নাবাড়া ঘরকন্না—শ্রমের কাজ না করে,
সেই নারী ত হৃদ্‌রোগে আর মূর্চ্ছা অম্লে মরে।
বিলাস ব্যসন আলস্যে ঘটে প্রসব বিভ্রাট,—
যে দিকে চাই শ্রমকুণ্ঠ রুগ্ন বিবির হাট।

কুলি মজুর শ্রমিক জায়া (প্রায়) জানে না ব্যায়াম;
জরজ্বালাটা ঘিরে আছে ভদ্রলোকের ধাম।
ডাঙ্গা কেটে ডহর করে ফেল্‌বে গায়ের জোরে,
দোয়েল ডাকার সঙ্গে উঠে শয্যা থেকে ভোরে,
গৃহস্থালির সকল কর্ম্ম কর্‌বে যে সব মেয়ে,
ধন্য হবে স্বামীর কুল গো এমন রত্ন পেয়ে!
"এমন ঘরে বিয়ে আমার হয় গো 'সরলার',
পানটি সেজে খেতেও কভু হয় না যেন তার।"
উপর থেকে মাটিতে গো নামে না সে পাখী,
(আহা) এমন সাধের দিব্য বিহগ* খাঁচায় পুরে রাখি!
এ কামনা করোনা মা, সুখ নয় সে বাঁশ,—
মাংস মেদের বোঝা বইতে কর্‌বে রে হাঁস ফাঁস।
হিষ্টিরিয়া হবে গো তার মুহুর্মুহু ফিট,
হয়রান হবে স্বামী দিতে ডাক্তারের ভিজিট!
পাঁচটা চালের ভাত খেয়ে তার বুকটা জ্বলে অতি,
এমন মেয়ে বিয়ে কভু করিস্‌নে রে 'মতি'।
একটা ছেলেও দিবেনা সে সুস্থসবল দেহ,—
সখের কাচের পুতুল নিয়ে ঘর করোনা কেহ।
কাল শক্ত সুস্থ শিষ্ট ভদ্র ঘরের ক'নে
অমরাবতী কর্‌বে সেত ফেল্‌লে তারে বনে।
শ্বশুর শ্বশ্রু দেবর স্বামী ননদ পরিজন,
সবার প্রতি সমান ভাবে কর্‌বে রে যতন।
অন্তঃপুর যে ধ'রে রাখে, 'পুরন্ধ্রী' নাম তা'র,—
সুখের বাসা গড়্‌বে—ভেঙ্গে কর্‌বে না চুরমার
বিনয়, লজ্জা, নম্রতা, শুচি, নিষ্ঠা, সদাচার।
কর্‌বে তোমার ভবের গৃহ শান্তি সুধাগার।
পাড়াপড়সীর খোঁজ খবর লবে আদর ক'রে,
পরকে আপন কর্‌বে স্নেহে—বাঁধ্‌বে প্রেমডোরে।
মুখে হাসি, হাতে কাজ, পরোপকার ব্রত,
নামে রুচি জীবে দয়া (হবে) সেবা ধর্ম্মে রত।

---

* Bird of Paradise—দিব্য বিহগ।

যে কার্য্য করিবে তাহে ঢালিবে হৃদয়,
নিয়োজিবে সর্ব্বশক্তি হইবে তন্ময়।
আন্তরিক ব্যাকুলতা বিশ্বাস আগ্রহে।
জন্মিবে ভকতিপ্রীতি ঈশ্বর অনুগ্রহে।
সর্ব্বকর্ম্ম মাঝে যেন ভুলোনা ভগবানে,
উপাসনা করবে রে তাঁর কায়মনঃ প্রাণে।
একটীবারও ডেকো তাঁরে দিনান্তে নির্জ্জনে,—
পাইবে প্রেমানন্দ কত ভজন সাধনে।

* * * *

শিশুশিক্ষা মায়ের কাছে উত্তমরূপে হবে ;
কেন শিশু পাঁচ বছরে স্কুলে যাবে সবে ?
হিসাব পত্র রেখে স্বামীর করবে সহায়তা,
আনবে দু'জন সংসারেতে সুখস্বচ্ছন্দতা।
একটু সর্দ্দি হ'লেই ছেলের ডাক্তার কেন ডাকা ?
গাছ গাছড়া টোটকা ঔষধ ভাল জেনে রাখা।
মিতব্যয়ী হবে নারী বুঝবে স্বামীর দুখ,
অল্পআয়েও দেখবে ঘরে আস্‌'ব কত সুখ।
রেখে ঢেকে বুঝে সুঝে চল্‌তে হবে সদা —
এমন ঘরে না এসে কি থাকবে রে বরদা ?
কানা কড়িটিও তুমি রাখবে সযতনে,
'যাকে রাখ সেই রাখে'—মানবে নীতি মনে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল কাজে স্বামীর সহায় সতী,
ইহকালে পরকালে মিলবে পরাগতি।
'পতি পরম গুরু' সতীর পূজ্য বরদাতা,—
কার্ত্তিক গণেশ তুল্য পুত্রের হবে তুমি মাতা।
চিকনেতেই যেন শুধু রয়না (এই) মহাবাণী ;
মনের মধ্যে অঙ্কিত যার সেই ত মহারাণী।
সৌভাগ্যেতে স্ফীত হ'য়ে ধরাখানা সরা
অতি বড় ভুল গো সে যে এমন মনে করা।
'আমার' 'আমার' নয় গো ভাল অতি মোহমায়া,
শ্রী গোবিন্দ পদে স'পো ধন দৌলত কায়া।

স্বর্ধর্ম্মেতে থাকে যেন ভক্তি অবিচলা,
একটু দুখে হবেনা গো অস্থির চঞ্চলা।
হবেই হবে ঝড় তুফান গো সংসার পারাবারে,
তাই ব'লে কি ছাড়বে রে হাল দরিয়া মাঝারে?
এই ত বুড়ীর অভিজ্ঞতা—এই আদর্শ নারী;
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ নিশ্চয় হবে তা'রি।

বিষ বিজ্ঞান।

[ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

ভারতে—বিশেষ আমাদের পরম পূজ্যা জন্মভূমি বঙ্গদেশে বিষাক্ততার জন্য বহু জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহার দুই কারণ, এক আত্মহত্যার উন্মত্ততা, অবহেলা মিশ্রিত অসতর্কতা ও অজ্ঞানতার ফলে বঙ্গের বহুমানিনী একটুকু সাংসারিক খুঁটিনাটি লইয়া করবী, আফিং, আরসেনিক (দারমুজ) কার্ব্বলিক এসিড, কেরোসিন ইত্যাদি যোগে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। আবার অল্পশিক্ষিত ডাক্তার কবিরাজের ঔষধালয়ে সহজলভ্য উগ্র ঔষধের অপব্যবহারে বহু জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমি এখন কাশীবাসী হইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া বৎসরে ৩৪টি বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি—স্থান বিশেষে এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

বিষ—বলিলে কি বুঝিতে হয়, কোনটি কোন জাতীয় বিষ তাহার ক্রিয়া, গুণ, ব্যবহার এবং অনিষ্টকারিতা কি এবং নিরাময় প্রথা কি ইহাই আলোচনা করা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'বিষ' কি ইহা বলা সহজ নহে। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থে বহু কথার উল্লেখ আছে, আয়ুর্ব্বেদ বাক্যই শ্রেষ্ঠ। "স্বাস্থ্য নষ্ট যাহাতে করে তাহারি নাম বিষ। আমরা ডাক্তারি এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ আলাচনায় বুঝিয়াছি যে, যাহাদ্বারা শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য বিনষ্ট এবং জীবনী শক্তির অপচয় ঘটায় তাহাই বিষ। ইহা তরল, কঠিন, চূর্ণ, বায়বীয়, বাষ্পাকার, এবং কর্দ্দমতুল্য ইত্যাদিরূপ নানা প্রকার হইতে পারে। যে বস্তু শরীরের ক্ষতে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, নিঃশ্বাস পথে পানাহার যোগে বা যে কোনরূপেই হউক শোণিত সহ মিশিয়া স্বাস্থ্যকে বা প্রাণকে বিধ্বস্ত করে তাহাই বিষ। আবার নিত্য ব্যবহার্য্য পানীয়ও অত্যধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলেও বিষাক্তগুণ প্রকাশ

করে। কিন্তু তাই বলিয়া আলপিন, সূচ, প্রস্তর, হীরকাদি ধাতু, লৌহখণ্ড, কাচচূর্ণ, কণ্টক ইত্যাদি বস্তু ভক্ষণ করিলে পাকাশয় মধ্যে প্রস্তুতিকরণ যান্ত্রিক উত্তেজনা জন্মাইয়া যে, সাংঘাতিক অবস্থা ঘটায় তাহাকে প্রকৃত বিষশ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

বিষকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীতে সাধারণ বিষ বিভক্ত। তরলাকারে বিষ প্রথম শ্রেণীভুক্ত--বাষ্পাকারে বিষ দ্বিতীয়। কঠিন পদার্থ তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থাৎ যাহা পাকস্থলীতে গিয়া শিরা সমূহ দ্বারা অতি শীঘ্রই শোষিত হইয়া কার্য্য করে তাহা প্রথম শ্রেণীর বিষ। যাহা বাষ্পাকারে নিঃশ্বাস পথ দিয়া শরীরস্থ হইয়া কার্য্য করে তাহা দ্বিতীয়। আর যাহা পরিপাক হইয়া কার্য্য করিতে অধিক সময় লাগে তাহা তৃতীয়। যে বস্তু ধীরে ধীরে কার্য্য করে তাহার ক্রিয়া নির্ণয় অনেক সময় বড় অসুবিধার হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে বিষ বিশেষ কোন বস্তু সহযোগে উদরস্থ হইলে ক্রিয়ার তারতম্য হয়। যেমন আর্সেনিক (শেঁকো বিষ) ভাত রুটি ইত্যাদি সহ ভক্ষিত হইলে যত সময়ে যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে গুড়, চিনি সহ কিম্বা তরলাকারে খাইলে তাহা অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। আবার শূন্য উদরে প্রবিষ্ট হইলে অতি শীঘ্রই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী এবং দুর্ব্বল, রুগ্ন ভেদে বিশেষের ক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আবার অভ্যাস জন্যও যথেষ্ট তারতম্য উপস্থিত হয়। এমন বহু লোক আছেন যে, তাঁহারা ১ ভরি আফিং খাইয়া সুস্থ শরীরে কার্য্যাদি করেন, অনভ্যস্ত ব্যক্তি সিকি ভরি আফিং কিম্বা ৩০ গ্রেণ মরফিয়া খাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শিশুগণ ১০।১২ গ্রেণ আফিং খাইয়া প্রায়শই মারা যায়। আবার আফ্রিকা, অষ্ট্রিয়া, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশ বাসীগণ—বিশেষ যুবতীগণ সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য দৈনিক ৪।৫ গ্রেণ দারমুজ বিষ খাইয়া কার্য্যক্ষম থাকিয়া যায়। আমার একটী আত্মীয় সখ করিয়া "স্বামী" হইয়াছিলেন—তিনি কান্তি পুষ্টি রক্ষার জন্য প্রতি শনিবার ৪ গ্রেণ আরসেনিক খাইতেন—একদিন অন্ধকারে ভুলক্রমে ৮ গ্রেণ দারমুজ খাইয়া বিষাক্ত হইয়া পড়েন, আমি বহু চেষ্টায় তাহাকে রক্ষা করি—বলা বাহুল্য তিনি দৈনিক অর্দ্ধ ভরি আফিং খাইতেন। বস্তুতঃ অভ্যাস জন্য বিষ বস্তু কোন কুক্রিয়া করে না।

স্থান ভেদে বিষের ক্রিয়া—শরীরের স্থান বিশেষে বিষ প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন প্রকার বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার বিষ ধর্ম্ম জন্য বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয়। যেমন অতি উৎকট সর্প বিষ শরীরের অনক্ষত স্থানে লাগিলে কোন বিষ লক্ষণ আদৌ প্রকাশ হয় না। কিন্তু রক্ত সহ বিন্দু মাত্র মিশ্রিত হইলেই প্রাণনাশক হইয়া উঠে। এ দিকে কিন্তু বায়ব্য বিষ ফুস ফুস দ্বারা বাহিত হইয়া প্রাণ নাশক হয়। অথচ শরীরে সংলগ্ন হইলে কোন বিষ লক্ষণ প্রকাশ করেন না আবার উগ্রবিষ দেহের বাহিরে লাগিলে যেমন ক্ষতাদিতে সেবনাপেক্ষা বিলম্বে কার্য্য হয়। ইহার

কারণ এই যে, ঐরূপ কার্য্যের শোষণ শক্তি অতি অল্প। জগতের সর্ব্ব দেশেই বিষ সেবন দ্বারা আত্মহত্যা কার্য্য সম্পন্ন হয়। বায়ব্য বিষ দ্বারা বঙ্গ দেশে জীবন নষ্টের সংবাদ তত পাওয়া যায় না, তবে বর্ত্তমানে গ্যাস গৃহে কয়লার খনিতে গ্যাস টানিয়া মৃত্যু আর পুরাতন কূপের দোষে কার্ব্বনিক গ্যাসে ২।১টি মৃত্যু সংবাদ আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কঠিন দ্রব্য অর্থে অঙ্গারাদি হীরক চূর্ণ, কাচ চূর্ণ—বিষ মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং উহা হত্যা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। যাহা হউক পারদ, সিসা ও আরসেনিক বাষ্পাকারে ফুসফুস দ্বারা বাহিত হইয়া সাংঘাতিক হইয়া থাকে। এমন কি বিষ শ্রেণীর কতক গুলি বস্তু উদরে প্রবিষ্ট হইয়াই শোণিত সহ মিশিবার অগ্রে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে এরূপ প্রদাহিত করে যে, তদ্দারাই রোগীর প্রাণ বিনাশ হয়। লৌহ, ধাতব, অম্ল, লবণ প্রভৃতি কোন কোন ক্ষার দ্রব্য এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

অতি প্রয়োগ—জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষিণী শক্তি আছে। ঔষধের মাত্রায় যাহা ব্যবহার হয় তাহার ক্রিয়া অবসান হইতে না হইতে আবার যদি তাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঔষধের শক্তি নিশ্চয়ই কম হইয়া পড়িবে, কিন্তু প্রবল বিষ লক্ষণ প্রকাশ হইবে। উদাহরণ স্বরূপ সুরাপায়ীগণের দৃষ্টান্তই প্রধান। ১ আউন্স সুরা দ্বারা শরীর সুস্থ এবং সবল হয়। তাহার উপর আরো—১ আউন্স প্রযোজিত হইলে উন্মত্ততা আনয়ন করে।

আইন এবং চিকিৎসা কার্য্যে—বিষ প্রয়োগ বিষয়ে রাজ শাসন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। সর্ব্বাগ্রে আইন সমস্তাই লিখিত হইল। এই বর্ত্তমান রাজশাসনে "পিনালকোর্ড" বা দণ্ডবিধি আইনের ২০৯—২০৩—৩০৬—৩০৯ প্রভৃতি দ্বারা প্রযোজিত হইয়া থাকে, যাহাতে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে অথবা প্রাণনাশ উদ্দেশে কোন পীড়া জন্মাইয়া দেওয়া হয়, কিম্বা মৃত্যুর কোনরূপ আশঙ্কা জন্মান হয়—তাহাই হত্যা অপরাধ বলিয়া গণ্য। প্রাণ নাশ জন্য যে কোন কার্য্য করা হয়—তাহা দ্বারা অনিষ্ট না হইলেও হত্যাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ স্থলে দোষীকে ১০ বর্ষ কারাবাস,—দ্বীপান্তর, অর্থ দণ্ড, প্রাণ দণ্ড ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিকৃত চিত্ত ব্যক্তিকে প্রাণ বিনাশ জন্য যে ব্যক্তি সাহায্য করে, তাহারও ঐরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। (৩০৬) আবার প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মঘাতিকে মৃত্যুর সাহায্য করিলেও ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং আত্মহত্যাকারীর চেষ্টাকারীকে বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আবার জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত ভেদে অপরাধের তারতম্য আছে। যদি কেহ পরের প্রাণ বিনষ্ট জন্য কোন কার্য্য করে—তাহা সফল হউক বা বিফল হউক, জ্ঞানকৃত বলিয়া কার্য্য কর্ত্তাকে অপরাধী হইতে হইবে। এই দোষে স্ত্রীলোকগণ স্বামী বশ করিবে বলিয়া যে বস্তু ব্যবহার বা কার্য্য করে তাহা জ্ঞান-

কৃত মধ্যে, গণ্য। বেশ্যাগণ কু অভিপ্রায়ে উপপতিকে আয়নার পারা খাইতে দিয়া থাকে তাহাও জ্ঞানকৃত অপরাধ মধ্যে গণ্য হয়।' তবে সৌভাগ্যের কথা যে, এরূপ মোকদ্দমা এই দেশে কোন দিন উপস্থিত হয় নাই। একদিন এক ওঝা ভূত ছাড়াইতে গিয়া—প্রহার দ্বারা রোগীকে সংহার করিয়া ফেলে—তাহাতে তাহার কারা দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ধুতুরা দ্বারা এ দেশে সময় সময় লোককে উন্মত্ত করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে ঠগীগণ এই কার্য্য করিত। এই সকল দোষীগণ প্রায়ই নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। আমার ভগ্নীপতি আর ভাগিনাকে দুইটি হিন্দুস্থানী পাচক পাচিকা পিষ্টক সহ ধতুরা খাইতে দিয়া পলায়ন করে। বিচারে—ইহাদের নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

এই সমস্ত স্থানে বিষ চিকিৎসককে অতি সতর্কতা সহ কার্য্য করিতে হয়। কোন্ বিষ দ্বারা বা বিষাক্ত হইল, তাহার পরিণাম, চিকিৎসা, পুলিসে সংবাদ প্রদান, নিজের সতর্কতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ বিষ চিকিৎসককে অভিজ্ঞ এবং চতুর হইতে হইবে। এই জন্য চিকিৎসকের কর্ত্তব্য বলিয়া একটা স্বতন্ত্র প্যারা নির্ম্মিত হইল।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি বিষাক্ত হইয়াছে শুনিলেই —চিকিৎসক মহাশয় তাহার আবশ্যকীয় যন্ত্র এবং বিষঘ্ন ঔষধ সহ দ্রুতগতিতে রোগীর নিকট উপস্থিত হইবেন—আহ্বান কারীকে বিষাক্ততার কারণ, কি বস্তু দ্বারা কার্য্য হইয়াছে,—রোগীর জ্ঞান আছে কি না—অন্য অবস্থা কিরূপ আর্থিক অবস্থা ভাল কি মন্দ, কতক্ষণ হইয়াছে, রোগীর বয়স কত এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে, শুশ্রূষা করিবার লোক আছে কিনা—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া লইবেন। রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, শরীরের উষ্ণতা, শীতলতা, বাক্যকথন শক্তি, জ্ঞান, অজ্ঞানতা, মুখের বর্ণ, দৃষ্টি শক্তি, মুখ হইতে ফেনা বাহির হয় কিনা, গিলিবার শক্তি কিরূপ— চক্ষুর অবস্থা, প্রলাপ এবং উন্মত্ততা খিচুনী রক্তস্রাব, পিপাসা, নিদ্রা, অস্থিরতা, (ক্রন্দন—চীৎকার ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইবেন। কোন্ সময় কতক্ষণ ইহা ঘটিয়াছে—কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা অথবা রোগীর নিকট কোন বস্তু আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইবেন। রোগীর গৃহে অযথা জনতা না হয় আলো-বাতাস আছে কিনা—ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন। আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহে আত্মীয়-গণকে নিযুক্ত করিবেন চা, বরফ, বালি জল সংগ্রহ করিতে বলিবেন।

এইস্থানে এই বিষয়টি অতি ধীরতার সহ রক্ষা করিবেন যে, সহসা রোগীর জীবন বিষয়ে নিজে বা আত্মীয়গণ নিরাশ না হন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "আমতা অমতা" করিয়া উত্তর দিবেন নিশ্চয় কোন কথা কহিবেননা,—অতি আগ্রহে ক্ষিপ্রহস্তে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। আবশ্যক হইলে অপর কোন সম ব্যবসায়ীর সহ পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

রোগী পূর্ণ সুস্থ না হইলে কখনোএকাকী থাকিতে দিবেন না. অথবা ক্রোধ বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

রোগী পরীক্ষা।—সুস্থ ব্যক্তি হঠাৎ অচেতন হইলে বিষাক্ত বলিয়া অনুমান করিতে হয়। আবার আহারের পর ঐরূপ ঘটিলে বিষের ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ হয়। রোগী দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং অন্য কোন পীড়াগ্রস্ত কিনা. কোনরূপ মাদকদ্রব্য বা বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইতে হইবে। যদি চিকিৎসক যাইয়া রোগীর মৃত্যু হইয়াছে দেখিতে জানিতে বা শুনিতে পান, তাহা হইলে কোন অবস্থায় কোন বিষ দ্বারা ঘটনা ঘটিল তাহা জানা উচিত। এতদর্থে নিম্নে কতকগুলি ভয়ঙ্কর বিষের উল্লেখ করা হইতেছে।

১। হাইড্রোমিয়ানিক বা প্রুসিকএসিড সেবনে এমন কি নিঃশ্বাস পথে গ্রহণ করিলে প্রাণনাশক হয়।

২। পটাশির সাইনাথেড—ইহাদ্বারা অতি শীঘ্রই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

৩। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, কার্ব্বনিক অকসাইড oxide অ কজ্যানিক এসিড— সেবনে অর্থাৎ যেসকল বস্তু জীবদেহে দ্রুত কার্য্য করে তাহা দ্বারা শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হয়।

৪। অহিফেন, মরফিয়া, ক্লোরোফরম, এলকোহল, ক্যাম্ফার, ক্লোরাল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা স্তৈমিত্যভাব সহ শীঘ্রই জীবন নষ্ট করে।

৫। এন্টিমণি—(রসাঞ্জন) একোনাইট (কাটবিষ, উগ্র অম্লদারমুজ (আরসেনিক), ট্যাবোকম (তামাক), এন্টীপাইরিণ, লোবে-নিয়া এন্টীকেবরীণ, ফস্ফরাস ক্যাম্ফিনা, থাই-মল, কেনাসেটিন, নাইট্রোগ্লিসেরিণ ইত্যাদি বস্তু দ্বারা মৃত্যুর প্রাগুক্ত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

৫। বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, গাঁজা, ধতুরা, সুরা, কর্পূর প্রভৃতি বস্তু প্রলা প্রবণ হয়ে সাংঘাতিক হয়।

৬। নক্সভমিকা তাহার বীর্য্য, ষ্টিকনিয়া, এন্টীমনী, দারমুজ ইত্যাদি বস্তুদ্বারা ও ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়।

৭। ফাইজাসষ্টিগ গিন, কোনায়েম, জেলসিমিন, আরসেনিক, একোনাইট, শিসা ধাতুঘটিত ঔষধে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়া মৃত্যুর লক্ষণ উপস্থিত হয়।

৮। কননিকা কুঞ্চিৎ হইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয়। যথা— অহিফেন, হাইড্রেড অবক্লোরণ, কাইজাস টিগমিন ইত্যাদি।

৯। নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা কননিকা বিস্তৃত হইয়া রোগীর জীবন নাশ হয়। যথা—এট্রোফিয়া-বেলেডোনা, ধুতুরা, হাইও ছিয়ামাস, আফিং, একোনাইট ক্লোরোফরম— এলকোহল, কোনায়ম ইত্যাদি।

১০। বেলেডোনা—ধুতুরা দ্বারা এরি-অমা অর্থাৎ চর্ম্মে গুটিকা জন্মিয়া পরে চর্ম্ম উঠিয়া যায়। হাইড্রেড অব ক্লোরাল দ্বারা গুটিকা জন্মিয়া প্রদাহিত স্থান উষ্ণ হয়। জানিয়া রাখা উচিৎ যে, বিউটিল ক্লোরাল অত্যধিক হইলে সময় সময় পীড়কা হয়। আরসিণিক দ্বারা আরক্ত জরের গুটিকা বাহির হয়।

এন্টিমণি দ্বারা পূয়যুক্ত পাণিবসন্ত গুটিকা জন্মে। পটাস ব্রোমাইড দ্বারা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা জন্মিতে পারে। মরফিয়া, অহিফেন দ্বারা ঘনবটীযুক্ত চুলকানী জন্মিতে পারে। আর এসিড পাইরোগ্যালিক এবং আর আর জেনটীই নাইট্রস (কাসটিক) এসিড্ ক্র্যাইমোকানিক দীর্ঘদিন ব্যবহারে চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া থাকে।

১১। এসিড স্যালিস্যানিক দ্বারা চক্ষের পাতা ফোলা এরিথমা তুল্য দাগ জন্মে। কোপেরা দ্বারা আমবাতের ন্যায় রক্তময় দাগ জন্মিয়া চুলকাইতে থাকে। কাবাব চিনি ও উক্তগুণশালী। আইওডাইড অব পটাস দ্বারা একরূপ ঘনবটী জন্মে এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব হয়।

নিঃশ্বাসে বিষ নির্ণয়।

কর্পূর, নাইট্রেড্ অব বেলজোয়ান, আফিং হইড্রোসিয়ানিক এসিড্, হুইস্কি ব্রাণ্ডি, কার্ব্বনিকএসিড্ এমোনিয়া ক্লোরোফরম, টিংকেনাবিষ, আইওডিন, ক্রিয়োজোট, ফসফরস, টারপিন, ন্যাপথাল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর শ্বাস গ্রহণে এবং নিঃশ্বাসের গন্ধে চিকিৎসক বিষ নির্ণয় করিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বাল্য জীবনের একটী ঘটনার এই স্থানে উল্লেখ করিলাম।

আমি যখন ১৫।১৬ বর্ষের বালক, তখন একদিন কুষ্টিয়ার ঘাটে ষ্টীমারে উঠিবার জন্য আমার একটী ভাগিনেয় এবং পাবনার জেল দারোগাসহ উপস্থিত ছিলাম। দারোগা বাবু আমাকে এবং চাকরকে দ্রব্যাদি আগলাইতে রাখিয়া ভাগ্নেটিকে লইয়া টিকিট খরিদ করিতে গেলেন। এই সময় আমি জেটীর উপরিস্থ একটী শার্শি দেওয়া ঘরের নিকট গিয়া দেখি, একটী হ্যাট্ কোট ধারী বাবু একটী শিশি হাতে করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা অতীত হইল বাবু উঠিলেন না—আমি গিয়া বড় বড় করিয়া বাবু বাবু করিয়া ডাকিলাম—উত্তর নাই। এই সময় জেলার বাবু উপস্থিত হইয়া বাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, ওগো ও ডাক্তার বাবু,—বাবু তখন জ্ঞানশূন্য—অচৈতন্য—হাতের শিশি মাটিতে পড়িল—বাবু চেয়ার সহ মাটিতে পড়িয়া গেলেন—আমি শিশিটির গাত্রে সংলগ্ন লেবেল পড়িয়া দেখিলাম—"এসিড প্রুসিক ষ্ট্রং"—তখন একটা মহা চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। আর ২।৩ জন লোক উপস্থিত হইল। সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত। টেবিলের উপর দুই খানা কাগজ লিখা আছে—তাহার ১ খানিতে "হা হতভাগিনী! কুমারী তোর মনে এই ছিল—কুলে কালি দিলি—আমি চলিলাম, ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে। পুলিশ সাহেব, আমি নিজেই জীবন ত্যাগ করিলাম। অপরখানি ডাক্তারের পিতামাতার নিকট লিখিত— * * * শ্রী * * * বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপস্থিত লোকগণ স্থির করিলেন—বাবুর স্ত্রী কুচরিত্রা, এই জন্য বাবু হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ খাইতে গিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। সেইদিন হইতে এসিড প্রুসিকের নাম এবং তাহার একটুকু পরিচয় পাইলাম। তাহার পর প্রাপ্ত বয়সে ডাক্তারী পড়িয়া কলেজেই উহার অন্য পরিচয় পাইয়াছি।

যাহা হউক মুনকমাইবনি নিম্নলিখিত

দ্রব দ্বারা—লালা নিঃসরণ হয় না। একোনাইট ক্যান্থারিস পারদঘটিত ঔষধ। তামাক এমনিয়া একসালজিন ইত্যাদি। আবার কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত হয়। নাইট্রিক এসিড দ্বারা শ্বেত-পীতাভ হয়। এমনিয়া ও সোডা পটাস দ্বারা এপিথেলিয়ম বিচ্ছিন্ন হয়। আবার একোনাইট ও বার-সিভ সাবলিমেট দ্বারা মুখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা অবশ হয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা বমন উপস্থিত হয়। যথা—আর্সেনিক দ্বারা রক্ত এবং পাটল বর্ণ বমন হয়। ডিজিটেলিস দ্বারা সবুজ বর্ণ বা ঘাসের বর্ণের ন্যায় বমন হয়। ফস্‌ফরসের বমিত পদার্থ অন্ধকারে জ্যোতিঃবিশিষ্ট হয়। কল সিনথ দ্বারা বমন হইয়া বমনতুল্য ভেদ উপস্থিত হয় এমনিয়ার বমনে সুতার ন্যায় পদার্থ নিঃসৃত হয়। উহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে ধূম উৎপত্তি হয়। ভিরেট্রাম ব্রাইওনিয়া ও আইডিন দ্বারা কটা বর্ণ পদার্থ বমিত হয়। তুঁতেতে নীল রং বিশিষ্ট বমি হইতে থাকে। আবার নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা ভেদ উপস্থিত হয়—দারমুজ (আরসেনিক) সরক্ত ভেদ হয়, এন্টিমণি ও করসিভ সাবলিমেট দ্বারা সবুজ রক্ত রক্ত ভেদ হয়। ক্যান্থারিস দ্বারা কর্দ্দমাকার—দুর্গন্ধ ভেদ হয়। ইন্দ্রবারুণী, জয়পাল, ব্রাইওনিয়া, আইডিন ডিজিটেলিস্ ও কনচিকম দ্বারাও ভেদ হয়। সিস্ ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর নাভি প্রদেশে চাপ দিলে বেশ আরাম অনুভব হয়। তাম্রধাতু আর কনচিকাম দ্বারা পেটজ্বালা বেদনা উপস্থিত করে। আবার শিসা আর্সেনিক দ্বারা হাতে পায়ে খাল ধরে, নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা শ্বাস গ্রহণে শরীর বিষাক্ত হয়।

যথা—ইথর ক্লোরাফরম হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এমনিয়া বেঞ্জন, কার্ব্বনিক গ্যাস, কার্ব্ব অক্সাইড কোন বা কয়লার গ্যাস ইত্যাদি।

এই দেশে মূর্খ এবং কুচরিত্রাগণ নিম্ন—লিখিত দ্রব্য দ্বারা গর্ভপাত করাইয়া থাকে, ইহাতে প্রায়ই শিশু বা গর্ভিণী হত্যা হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে গর্ভিণী না মরিলেও একেবারে অসুস্থ হইয়া যায়। এমন অবস্থা কখনো উপস্থিত হয় না যে, চিকিৎসককে গর্ভ নষ্ট করিয়া কোন কার্য্য করিতে হয়, প্রত্যুত ইহার জন্য বরং সাবধানে ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়। প্রত্যেক চিকিৎসককে বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীরোগীর চিকিৎসক করিতে গিয়া রোগিনী গর্ভিণী কিনা জানিয়া ঔষধ ব্যবহার করাইতে হইবে। নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা গর্ভপাত হইয়া থাকে—অর্গট, রেউচিণী, ইন্দ্র বারুণী সেভিনটপস, পেনিয়াল, হিকারী, পিকারী হানিবাটার, মুসব্বর আনারস, আফিং আকন্দ ইপিকা একটিয়া, রেমিমোস, পল সেটিলা, চিতার শিকড়,মেন্দিপাতা ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্য ভিন্ন ভারতীয় নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলি যেমন বিষাক্ত তেমনি সহজ প্রাপ্য। আফিং এবং করবী ফুলের বীচি যাহাতে গৃহ মধ্যে না আসিতে পারে, প্রত্যেক গৃহীর সেবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি থাকা নিতান্ত উচিত। ডাক্তারী করিতে গিয়া

প্রায়ই দেশী উদ্ভিদের আবশ্যক হয় না বটে কিন্তু আমার ন্যায় দেশপ্রিয় ও দেশভক্ত ডাক্তারগণ সময় সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এবং মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেশীয় উদ্ভিদ আর কবিরাজী মুষ্টিযোগে যে কার্য্য হয়, বিদেশী শিক্ষায় বিকৃত দেশবাসী ডাক্তারীর বড় বড় ঔষধে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার এই উক্তি আয়ুর্ব্বেদ ভক্তির অনুমূলক নহে—ইহা বহু পরীক্ষিত, বাঙ্গালায় ৩১ বর্ষ এবং কাশী প্রদেশে ১৫।১৬ বর্ষ ডাক্তারী চাকুরী, স্বাধীন ব বসা করিয়া বহু স্থানে বহু রোগীতে এই বাক্যের সা'বত্তা অনুভব করিয়াছি। যাহা হউক অতঃপর যাহা এতক্ষণ বলিয়া আসিতেছি—তাহাই বলি।

নব্য উদ্ভিদগুলি এই যথা—জয়পাল, এরণ্ড বীজ, বাগভেরেণ্ডা, চিতা, ভেলা, করবী উচ্চুড়া, আকন্দ, মনসা সিজ, হিজলি বাদাম, মাকাল, তীতলাউ, কুকুরী, বিঠা, ধুতুরা, গাঁজা, ভাং, তামাক, অমৃত (কাটুবীষ) কুঁচ বা গুঞ্জামূল, কুচলে ইত্যাদি।

বিষচিকিৎসকের আবশ্যকীয় দ্রব্য।

একটী ব্যাগে কি বাক্সে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবেন —(ক) ষ্টমাক পম্প, ষ্টমাক টিউব। এনিমা সিরিঞ্জ, ইসাকেগাল টিউব, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, রবরের গাম, ইলেকট্রিক ক্যাথিটার, বমন কারক ঔষধ বর্গ যথা জিঙ্ক সালফ্ ½ ড্রাম করিয়া ৪।৫ টি পুরিয়া, ১০ গ্রেণ হিসাবে পালভ ইপিকা ৩।৪টি পুরিয়া (খ) এপোমরফিয়া সলুসন। আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লইবে বা প্রস্তুতি দ্রব্য রাখিবে। (গ) উত্তেজক বস্তু যথা—ব্রাণ্ডি ৪।৫ আউন্স, স্যালেভলেটাইল ৪ আউন্স ½ হইতে ১ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার হইবে। স্প্রীট ক্লোরফরম (ইথর ক্লোরিক) ৪ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রা (ঘ) কাপি ৪ আং জলসহ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার হইবে। গ্রেণ ২০ কুড়িক কেফিন সোডা স্যালিসিলেট টেবলয়েড বা গুঁড়া।

নিম্নলিখিত প্রতিষেধক Antidod গুলি সংগ্রহ রাখিবে। যথা - ফেরি ডাইলাইজড্, ভিনেগার বা এসেটিক এসিড, সিরাপ ক্লোরাল ফ্রেঞ্চ অয়েল অব টারপিন, ইহা ফসফরস বিষের antidod বিশুদ্ধ ক্লোরাফরম। ব্রোমাইড অব পটাস ট্যানিক এসিড। এমিলিনাইট্রেড্ ক্লোরাফরম এবং এবং একোনাইট বিষঘ্ন। লাইকর মরফিয়া পাইলোকারাপন নাইট্রেড এট্রোফিয়া বেলেডোনা বিষজন্য আত আবশ্যক।

বিষাক্ত রোগীকে বমন করান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য—এই জন্য হাইপোডারমি পিওকি নিতান্ত দরকার কেননা যে স্থানে রোগীর গিলবার শক্তি থাকেনা, তখন ইহা দ্বারা কোন ভাবা দয়াবিধা উপস্থিত হয় না। মাত্র দুই একস্থানে সামান্য বিবমিষা থাকিয়া যায়। ইহার জন্য হয় পাঁচ ফোঁটা এপোমরফিয়া বা প্রস্তুত করণ টেবলয়েড ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ব্যতীত ফট্‌কিরি চূর্ণ, এমন কার্ব্ব ভাইনাম, এণ্টিমণি টারটার এমেটিক তুঁতে, পালভ ইপিকা, সরিষা চূর্ণ জিঙ্ক সালফ্, ক্লোরাইড অবসোডা কিম্বা পল্লি সুলভ মৎস্য ধৌত জল বমন জন্য ব্যবহার হয়। আমি প্রায় স্থানেই ইপিকা মিশ্রিত

সিডক সানক ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে সহজে বমি করাইয়াছি. পরিণামে কোন বিঘ্ন হইতে দেখি নাই।

ষ্টমাক পম্পশূন্য বিষ চিকিৎসা বড় অসুবিধার কার্য্য। কেন না পাকাশয় ধৌত করা বড় দরকার। স্থান বিশেষে আমি উপস্থিত ক্ষেত্রে রবারের নল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছি। একদিন একটি পল্লিগ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়া একটী আফিং বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা করি, ষ্টমাক পম্পের অভাবে পল্লি সুলভ কলাগাছের ভিতরের মাইজ অগ্নি-তাপে কোমল করিয়া মাখন মাখিয়া কার্য্য সারি, ইহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়। এই জন্য বলি, বিষচিকিৎসকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা চাই। যাহা হউক ষ্টমাক পম্প বিষ চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

বিষাক্ত রোগী হাতে পড়িলে ডাক্তার এবং আত্মীয় গণকে ধীরে স্থির ভাবে অথচ ক্ষিপ্র হস্তে কার্য্য করিতে হইবে, একেবারে হতাশ বা পূর্ণ উৎসাহ লইয়া ঔদাস্য করা চলিবেনা। বিষ লক্ষণাক্রান্ত রোগী উপস্থিত হইলে গৃহে একটা ব্যস্ততা এবং ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এমন কি চিকিৎসক একদ্রব্য চাহিলে অন্য দ্রব্য আনিয়া বিরক্ত জন্মায়। এক দিন একটী যুবক রংমশাল পোড়াইতে পোড়াইতে গন্ধকের ধুমে সহসা চৈতন্য হারাইয়া পড়িয়া যায়। নিকটে একটী ডাক্তার বিবাহিত হইতে ছিলেন, তিনি ঘটের উপর হইতে কন্যার হস্ত সহ আবদ্ধ হস্ত টানিয়া দ্রুতপদে বিবাহ আসর হইতে বাজী পোড়ান স্থানে উপস্থিত হইয়া রোগীর জ্ঞান জন্মান অন্য নাকের মধ্যে লবণ জল "ফু" দিবা দিবেন বলিয়া কিছু তুলসী রস এবং লবণ চাহেন। সম্প্রদাতা পুষ্পপাত্র হইতে তুলসী রস করিয়া কুশির মধ্যে করিয়া দিলেন, কিন্তু গৃহের রমণীগণ উৎসব মধ্যে একটা অশুভ আকস্মিক ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া লবণের পরিবর্ত্তে দোবরা চিনি দিয়া ফেলি-লেন—ডাক্তার তুলসী রস সহ উহা মুখে করিয়া রোগীর নাকে দিবার সময় আস্বাদে বিরক্ত হইয়া ফেলিলেন,—প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া 'হাবা মাগী গুলো" বলিয়া অভদ্র বাক্য বলায় তাঁহার নিন্দা হইল। যাহা হউক প্রাণ রক্ষার কার্য্য করিতে হইলে তাহা ধীরতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া চাই। বিষ চিকিৎসক ধীর স্থির প্রকৃতি চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ মিষ্ট ভাষী, অল্পে তুষ্ট এবং সমাজিক হইলে প্রায়ই কৃতকার্য্য হইবেন।

একদা গোঁয়ার প্রকৃতি আলস্য প্রবণ অল্প শিক্ষিত এক পল্লি ডাক্তার একটী করবী বিষাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় যাইতেছি বলিয়া অযথা বিলম্ব এবং আহ্বান কারীর সহ রুক্ষ ব্যবহারে গৃহস্থগণকে বিপদে বিরক্ত করিয়া রোগীটি বিনাশ প্রায় করিয়া তুলিয়া ছিলেন, শেষে শ্রীহরির কৃপায় একটী শিক্ষিত শান্ত পল্লি কবিরাজ বহু কষ্টে রোগীর জীবন রক্ষা করেন। যাহা হউক আমি "বিষবিজ্ঞান' প্রবন্ধ লেখক, সুতরাং আমাকে প্রত্যেক বিষবস্তুর চিকিৎসা ভালরূপ লিখিতে হইবে। সেইজন্য প্রত্যেক দ্রব্যের বিষাক্ত-তার চিকিৎসা লিখিত হইল। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয় হইলেও বাধ্য হইয়া পাঠক-গণকে বিরক্ত করিয়াছি।

রাজবৈদ্য।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ]

(১)

ম্লান মুখে আসি কহিল গৃহিণী
বৈদ্যরাজ নারায়ণে,
"তণ্ডুল বিহীন ভাণ্ডার আজি গো,
থাকিবে কি অনশনে ?

(২)

কপর্দ্দক তব নাহি উপার্জ্জন
কেবলি করিছ দান,
ধনী কি দেশের নাহি কেহ আর,
নাহি কি কাহারো প্রাণ।

(৩)

আতুরের সেবা ভিষক্-সকাশে,
জানিগো মহত কাজ।
কিন্তু অবশেষে ভিখারী সাজিতে
পাপে নাকি মনে লাজ ?

(৪)

ঋষির আদেশ শুনিয়াছি প্রিয়!
তোমারি ত মুখে কত,
রোগীর নিকট করিবে গ্রহণ
অর্থ, প্রয়োজন মত।"

(৫)

"গৃহিণি ! এরা যে বড়ই গরীব,
যাহারা আমার পাশে,
করাল ব্যাধির ভীষণ পীড়নে,
জর্জ্জরিত হয়ে আসে।

(৬)

অন্নাভাবে শীর্ণ, অর্থাভাব গৃহে
পথ্য কভু নাহি পায়।
কিরূপে তাদের চাহিগো অর্থ
পরাণ ফাটিয়া যায়॥

(৭)

সুস্থ তাদের করিগো কেমনে
পথ্য না কিছু দিলে।
দুঃস্থের সেবা পরম ধর্ম্ম
জান নাকি মহীতলে!

(৮)

ভেবনা গৃহিণী! তণ্ডুলের তরে,
নাহি হবে অনশন।
দেশের নৃপতি, রাজবৈদ্য ; মোরে—
করেছেন নিয়োজন।

কালা জ্বর

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কালাজ্বর বলিতে যে জ্বরকে বুঝায় তাহা বিষম জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু ইহার প্রায় তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট ম্যালেরিয়া জ্বরও বিষম জ্বর। সাধারণ চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয়, কালাজ্বর হয় না। দোষ-দূষ্যের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিলে উভয়ের পার্থক্য খুব অল্পই দেখা যায়,তবে চিকিৎসায় ফল না পাওয়ার প্রতি কারণ কি ইহাই একটী সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আমাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে কালা-জ্বর যে পৃথক ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে। উভয় রোগের লক্ষণ গুলি দেখিলে এক মাত্র কালা-জ্বরে রোগীর ত্বকের বর্ণ যে বিকৃত হয় ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহা হয় না। কালা-জ্বরে ও সকল ক্ষেত্রেই সকল সময় বর্ণের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। ডাক্তারী মতে রক্তের বীজাণু পরীক্ষা দ্বারা পার্থক্য নির্দ্ধারণ অনেক সময় বিপজ্জনক বলিয়া সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে। সম্প্রতি ডাক্তার গণ রক্তের আর এক প্রকারে পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার নাম Aldihyde teste. তাঁহারা সেই মতে রক্ত পরীক্ষা করিয়া কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন। আমাদের যখন দোষ-দূষ্যের সম্বন্ধ কল্পনা দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে তখন Aldihydeteste এর দ্বারা বিশেষ লাভবান হইব ইহা মনে হয় না, সুতরাং আমাদিগকে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করিয়া চিকিৎসায় যদি সুফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উপশয়ানুপশয় দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে যে ইহা সাধারণ বিষম জ্বর হইতে একটী স্বতন্ত্র ব্যাধি। মহর্ষি চরক বলেন—

শীতোষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষাদৈর্য্যুপক্রান্তাশ্চ যে গদাঃ।
সম্যক্ সাধ্যা ন সিধ্যন্তি রক্তজাংস্তান
বিভাবয়েৎ"॥

ইহা দ্বারা বুঝা যাবতেছে যে, কালা-জ্বরে রক্তদুষ্ট থাকিবেই থাকিবে। সাধারণ বিষম জ্বর হইতে ইহার ইহাই পার্থক্য এবং এই জন্যই সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যায় না; এই শ্লোকের টীকায় চক্রপাণি বলেন,

"প্রদুষ্ট শোনিতাশ্রয়াস্ত বাতাদয়ঃ স্বাশ্রয়প্রভাবাৎ ন স্বচিকিৎসা মাত্রেন প্রশাম্যন্তি।"

সুতরাং এই রোগে একদিকে যেমন বিষম জ্বরের চিকিৎসা করিতে হইবে অন্যদিকে সেই প্রকার প্রদুষ্ট রক্তকে সাম্যাবস্থায় অনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ রক্তজ রোগ সকলের চিকিৎসা সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলেন "কুর্য্যাচ্ছোণিত রোগেষু রক্তপিত্ত হরীং ক্রিয়াম্।"

চক্রপাণি বলেন, "রক্তপিত্ত হর ক্রীয়াদয় যথা যোগ্য তয়া বোদ্ধব্যাঃ।"

এইখানে "যথাযোগ্যতয়া" এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে যেগুলি তদ্‌রোগে প্রযুক্ত হইলে একদিকে যেমন সেই সকল রোগ প্রশমন করিতে সমর্থ হয়, অপর দিকে রক্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে। এই প্রকারে ঔষধ বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কালাজ্বরের জ্বর সন্তত হইলে উহা রক্তধাত্বাশ্রয়ী। প্লীহারোগে রক্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডু ও শোথ রোগে রক্তের স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং কালাজ্বরে রক্তদুষ্টি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, এজন্য চিকিৎসাকালে রক্তের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথম যখন Typhpid Symptoms লইয়া জ্বর হয়, তখন কালাজ্বরের কোন লক্ষণই বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় সাধারণতঃ দোষের অবস্থা বিচার করিয়া চিকিৎসা করা হয়। এই সময় যদি জ্বরের বেগ দুইবার থাকে, তাহা হইলে পলতা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি, কটকী—মিলিত ২ তোলা, জল ৴॥ সের, ৴৷৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই পাচন সেবন করিতে দেওয়া ভাল। অন্য ক্ষেত্রে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে জ্বর নিবৃত্ত হইলে আর ভবিষ্যতে কালাজ্বর হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

জ্বর পুরাতন হইলে পুরাতন জ্বরের যে সকল ঔষধ, যাহা রক্ত ও পিত্তের প্রশমক—যেমন চন্দনাদি লৌহ, ভানু চূড়ামণি প্রভৃতি অবস্থোচিত অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। পুরাতন জ্বরে রোগীর রক্ত ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে, পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ প্রয়োগ করা উচিত।

পুট পাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহে—লৌহ থাকার জন্য রোগীর রক্তকণিকা বৃদ্ধি পায়। মুক্তা, শঙ্খ, শুক্তি, প্রভৃতি ক্ষার জাতীয় দ্রব্য থাকায় পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এবং রক্তের যে ক্ষার ধর্ম্ম কমিয়া যায়—তাহাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাম্র—যকৃৎ প্লীহার বিকৃতি নষ্ট করে, সুতরাং দ্রব্য গুণ বিচার করিয়া দেখিলে পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ এই রোগের পাণ্ডু, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য এবং রক্তের ক্ষার ধর্ম্মাল্পতা নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং শোথাদির আশঙ্কা থাকে না জ্বরের বেগাধিক্য থাকিলে বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব—পটোলের রস অথবা ক্ষেত পাঁপড়ার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে এক দিকে যেমন জ্বরের বেগ মৃদু করিয়া আনে, অন্যদিকে সেই প্রকার রোগীর বলাধান করিয়া রক্তের মৃদু গতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া আইসে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে ইহার সহিত অর্দ্ধ রতি মকরধ্বজ মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

প্রথম অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে, এইজন্য চিকিৎসাকালে প্লীহা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য দেখিয়া বিশেষ গোলযোগের মধ্যে পড়িতে হয়, কারণ প্লীহাধিকারের অনেক ঔষধ বিরেচন গুণবিশিষ্ট,ঔষধ দেখিয়া অনেক সময় সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারেরই সমধিক সম্ভাবনা; কারণ কালাজ্বরে অতিসার একটী প্রধান উপদ্রব, বর্ত্তমানে কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলেও উহা ভাবী অতিসারের

পূর্ব্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"অরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং নবিরেচনম্"।

এই সময় বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভাবী অতিসারকে আবাহন করা হয় মাত্র। কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য রোগীর যদি উদরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ;—

"কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্ব্বা হরেন্মলান্।"

রোগীকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, রোগী যদি অত্যন্ত ক্রূর কোষ্ঠ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধেও তাহার দাস্ত পরিষ্কার হয় না, সেই ক্ষেত্রে নিমছাল, যষ্টি-মধু, কিস্‌মিস্ ও কট্‌কী—এই চারিটী জিনিষের ক্ষীরপাক করিয়া দেওয়া উচিত এবং পথ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পেয়া ব্যবস্থেয় :—

"কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাংঅরী।
মৃদ্বীকা পিপ্পলীমূলং চব্য চিত্রক নাগরৈঃ॥"

সম্ভব হইলে নিরূহন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

প্লীহা ও যকৃতের জন্য যকৃদরি লৌহ, রোহিতক লৌহ এবং এবং বৃহৎ লোকনাথ রস প্রয়োজ্য। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ লোকনাথ রস একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহাতে অধিক পরিমাণে কড়িভস্ম থাকার জন্য প্লীহা রোগীর অনেক সময় মুখে ক্ষত বা দাঁতের গোড়া হইতে যে রক্তস্রাব হইতে পারে, তাহার আশঙ্কা থাকেনা। ঔষধের অনুপানরূপে দারুহরিদ্রা প্রয়োগ করা উচিত। দারুহরিদ্রা যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য এবং পাণ্ডুরোগ নাশক, সুতরাং দারুহরিদ্রা সহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে যকৃতের ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাণ্ডুভাব বিদূরিত হয়। দারুহরিদ্রা—চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া সেই ঘৃষ্ট দ্রব্য দুই তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রয়োগ করা উচিত। দারুহরিদ্রার অপর গুণ রক্তের বিষ দোষ নাশক, সুতরাং দারুহরিদ্রা প্রয়োগে কালা-জ্বরের যে রক্তদুষ্টি তাহাও প্রশমিত হয়।

অতিসার থাকিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক—ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ প্রয়োজ্য। রোগের অবস্থা বুঝিয়া দিবসে একবার বা দুইবার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাশয় থাকিলে মুথার রস ও মধুসহ, এবং আমের সহিত রক্ত বিদ্যমান থাকিলে কাঁটান'টের মূল চালুনি জলের সহিত বাটিয়া তাহার রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য। অতিসারের প্রাবল্য থাকিলে, অবস্থা বুঝিয়া দুই এক বটী কর্পূর-রস৺ চালুনি জলসহ দেওয়া যায়। রোগ পুরাতন এবং শোথ সংযুক্ত হইলে লৌহ—পর্প টী ছাগ দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজ্য। শোথের উপক্রম বুঝিলে নবায়স লৌহ পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োগ করা উচিত। ইহা পাণ্ডু রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃদ্‌পিণ্ডের বলকারক এবং রক্তবর্দ্ধক এই ঔষধটী সুশ্রুত বলিয়াছেন, সুতরাং প্রমেহ জন্য রক্তদুষ্টি রোগেও ইহার কার্য্যকারিতা বিদ্যমান আছে। শোথে প্রায়ই প্রস্রাবের গোলযোগ দেখা যায়। নবায়সলৌহ সেবিত হইলে পাণ্ডু, শোথ, মূত্রদোষ এবং রক্তাল্পতা নষ্ট হয়। ইহা কুলেখাড়ার রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য। শোথ দেখা গেলে পুনর্ণবার রস ও মধুসহ, কিন্তু শোথের সঙ্গে উদরাময় থাকিলে লৌহপর্পটী

দিতে হইবে। শোথ—জলোদরে পরিণত হইলে ক্রম বৃদ্ধিমাত্রায় পঞ্চামৃত পর্প টী প্রয়োজ্য।

মুখে ক্ষত দেখা দিলে খদিরাদি বটীকা মুখে রাখিয়া চুষিতে দেওয়া এবং নিমপাত, অনন্তমূল, ও খদিরের কাথে কিঞ্চিৎ ফিটকারী মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ সেই কাথের কুলী করিতে দেওয়া উচিত। ঘায়ে যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধরতি মকরধ্বজ, এক-রতি মাণিক্য রস ও অর্দ্ধবটী মহালক্ষ্মীবিলাস একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের রস ও মধু সহ সেবন করাইতে হইবে। সোহাগার খৈ ও রসমাণিক চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত গুলিয়া মুখে লাগাইতে হইবে। দাঁতের গোড়া হইতে কিংবা মুখ হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে রক্তপিত্তঘ্ন ঔষধ যথা—আমলাস্থ লৌহ রক্তপিত্তান্তক লৌহ প্রভৃতি লাক্ষা চূর্ণ ৵৹ আনা, চিনি ও ছাগদুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিতে হইবে। দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত আসিতে থাকিলে ফিটকারি চূর্ণ দাঁতের গোড়ায় চাপিয়া দিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ-সাহিত্যভূষণ]

সকল প্রকৃতির রোগীকে এই প্রকারের পথ্যের ব্যবস্থা করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। রোগীর প্রকৃতিভেদে, জাতিভেদে, দেশভেদে এবং ঋতুভেদে যে পথ্যের প্রভেদ হইয়া থাকে, —একথা সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। তরুণ জ্বরে দুগ্ধ—মাংসভুক, ইংরাজের সুপথ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্নাহারী বাঙ্গালীর শরীরে অবস্থা-বিশেষে দুগ্ধ বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মধুর দ্রব্য ও সুশীতল পানীয় পিত্ত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে পথ্য, কিন্তু কফ-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে উহাই অপথ্য। বর্ষাকালের জ্বরে যেখানে মসূরীর যুস ব্যবস্থা করা যায়, গ্রীষ্মকালে সেস্থলে উক্তপথ্যে রোগীর দাহ ও তদানুসঙ্গিক উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে, সুতরাং পথ্যাপথ্যের বিচার চিকিৎসকের বিবেচনা-শক্তির উপর নির্ভর করে।

যাহা হউক ভূমিকা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা কাজের কথা বলিব। প্রথমেই জ্বরের কথা বলা যাউক। কারণ বঙ্গদেশের ব্যাধি সমূহের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বপ্রধান, জ্বর একটী সাধারণ কথা, সর্দ্দি জ্বর, বাতজ্বর, বাতশ্লেষ্মা-ক্ষেত্রের জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষম জ্বর ইত্যাদি সমস্তই জ্বরপর্য্যায় ভুক্ত, ইহার মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু ম্যালে-রিয়া বিষ সম্ভূত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে চারি কোটী। ইহার মধ্যে আড়াই কোটীর ও উপর লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকে এবং প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কি ভীষণ অবস্থা, একবার চিন্তা করিবার বিষয়!

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং"। জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘনই একমাত্র পথ্য। অপক্ক রসযুক্ত বায়ুপিত্তকফ—সামদোষ বলিয়া, জ্বরের প্রথম অবস্থায় অপক্ক রসে দেহ পূর্ণ থাকে, অগ্নিমান্দ্যই ইহার প্রধান লক্ষণ। জিহ্বা অত্যন্ত শ্লেষ্মাবৃত হয়, মুখ দিয়া জল উঠে, গা বমি বমি করে, সমস্ত শরীর ভার বোধ হয়। মুখে বিস্বাদ এবং অরুচি হয়। তন্দ্রা ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দেহস্থ রস পরিপাক না পায় এবং এই সমস্ত উপসর্গের প্রখরতা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পথ্যাভাবে রোগীর হার্টফেলের (Heart fail) আশঙ্কা করা নিতান্ত অন্যায়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া একদিন কিম্বা দুইদিন উপবাস অথবা অত্যন্ত লঘু পথ্য দিলে জ্বরের বেগ কমিয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কৃত হয়, শরীরের জড়তাভাব দূর হয় এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষুধার উদ্রেক হইতে থাকে, এই সময়ে অল্পে অল্পে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আমেরিকাস্থ চিকাগো হেরিং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হোমিওপ্যাথিতে জ্বর চিকিৎসার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার ডাক্তার এইচ, সি, এলেন এম ডি, তাঁহার পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—

Pure water adlibitum is the best and safest died for the fever patient, until the tongue is clear the appetite—nature's call for food—returns, and the pulse and temperature nearly normal. The but results are generally obtained by hot water if it can be taken; if luckewarm, it often nanscation.

যতক্ষণ জিহ্বা পরিষ্কার না হয়, ক্ষুধা ফিরিয়া না আসে, নাড়ী এবং গাত্র তাপ প্রায় স্বাভাবিক না হয়, ততক্ষণ জ্বর রোগীর বিশুদ্ধ জলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ পথ্য। খুব গরম জল ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়, অল্প গরম জলে রোগীর গা বমি বমি করিতে পারে।

"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" হইলেও এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে, সর্ব্বস্থলে উপবাস বিধেয় নহে। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং গর্ভিণীর পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্নও বায়ু প্রধান, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাতুর, ভ্রমি (মাথাঘোরা) এবং দুঃখ ও শোকযুক্ত ব্যক্তিকে উপবাস করাইবে না। কৃমিগ্রস্ত বালকদের খালিপেটে নানারূপ উপসর্গ হইতে দেখা যায়।

রোগী যাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উপবাস এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ যে আরোগ্যের জন্যই চিকিৎসা, সেই আরোগ্যের একমাত্র আশ্রয়ই বল, বল ভিন্ন রোগীর আরোগ্য লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

সামান্য, সর্দ্দি জ্বরে চিড়া ভাজা, খৈ, সেই সঙ্গে দু এক খানি বাতাসা, মুড়ি দেওয়া যায়,

গরম মুড়ি গুঁড়া করিয়া লইলে বেশ লঘুপথ্য হয়। মুড়ির গুঁড়া অল্প জ্বরের মধ্যেও দেওয়া যাইতে পারে। কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, বেদানা, পানিফল, খেজুর প্রভৃতি এক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বরের প্রখর অবস্থায় চিড়াভাজা, পাউরুটী, খই ইত্যাদি পথ্য রূপে দেওয়া উচিত নহে, ঐরূপ স্থলে তরল পথ্যই ব্যবস্থা, অনেকে দুধ সাগু বা দুধ বার্লি দিয়া থাকেন, উহাও অত্যন্ত অন্যায়। জ্বরে পরিপাক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়, পাকস্থলীর এতদূর বৈকল্য ঘটে যে, দুগ্ধ পরিপাক করিবার ক্ষমতা তাহার মোটেই থাকে না, এমতাবস্থায় দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলে পাকস্থলীর ক্রিয়া অধিক খারাপ হইয়া উপসর্গ সমস্ত বৃদ্ধি পাইবে, জ্বর ও বাড়িয়া যাইবে।

অবস্থা ভেদে জলবার্লি, জল এরারুট, জল সাগু জ্বরের প্রথম অবস্থায় উত্তম পথ্য। এই সমস্ত পথ্য অনেকেই উত্তম রূপে পাক করিতে জানেন না, সুতরাং ইহা মোটেই সুস্বাদু হয় না। মুখের কাছে লইয়া রোগীর যতই আকার করে গৃহস্থ ততই তাহাকে বুঝাইয়া থাকে (যেমন তিক্ত কবিরাজী পাচন সেবন কালে হয়) "নাকটা টিপিয়া কোনরূপে এক ঢোক গিলিয়া ফেল, নতুবা ঔষধে গুণ করিবে কেন?" বারংবার অনুরোধে রোগীও অনিচ্ছাসত্বে এই ভাবে পথ্য গ্রহণ করিবার প্রয়াস পায়, ফলে; ইহাতে পথ্য জনিত উপকারের স্থলে অপকারই সাধিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ দেহ অপক্ক রসে পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ পথ্য না দেওয়াই উচিত। পথ্য প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইলে সে পথ্য যাহাতে সুস্বাদু হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বার্লি উত্তমরূপে সিদ্ধ করা হয় না বলিয়া উহাতে একরূপ কাঁচা গন্ধ থাকিয়া যায়, সেই গন্ধে রোগীর ন্যাকার উপস্থিত হয়। এক ছটাক বার্লি দেড় পোয়া জলে গুলিয়া তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া ক্ষীণ জ্বালে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন একপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে তখন নামাইয়া লইলেই বার্লি প্রস্তুত হইল, লবণসহ সিদ্ধ করিলে উহার কাঁচা গন্ধ থাকে না, উপরন্তু নামাইবার পূর্ব্বে একটু মিছরি দিয়া লইলে আস্বাদ আরও ভাল হয়। খাইবার সময়ে রোগীর ইচ্ছানুসারে কচি কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া খাওয়া যাইতে পারে। বার্লি গরম থাকিতে থাকিতে দুই একটী এলাইচের দানা বা একটু দারুচিনি মিশাইয়া লইলে খাইতে বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না। তবে যাহারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হয়, তাহাদের পথ্য শেষোক্ত প্রকারে সুবাসিত করিবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। বার্লি, সাগু ইত্যাদি রাঁধিয়া ৫।৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যাইতে পারে, পুনরায় খাইবার সময় অল্প গরম করিয়া লইলেই হইল। যেখানে দুধ-বার্লি ব্যবস্থা, সেখানে দুধ বা চিনি, মিছরি মিশাইয়া রাখা নিষিদ্ধ, লবণ দিয়া পাক করা সাগুবার্লিতেও দুধ মিশ্রিত করা উচিত নহে।

সাগুও ঐ ভাবে পাক করিতে হয়। কিছু সময় পর্য্যন্ত সাগু ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আজকাল খাঁটি সাগু বাজারে পাওয়া যায় না, কেশুরদানা-সাগু বলিয়া বিক্রয় করে, উহাতে সাগুর উপকারিতা কিছু মাত্র

দেখা যায় না, বরং অনেক সময় উহা পেট খারাপ করে।

ইদানীং বিলাতী নানাবিধ ফুড, বার্লি, এরারুট ইত্যাদিতে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, এজন্য কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশে প্রস্তুত পথ্য গুলি বিলাতীর সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার বিষয়।

অনেক চিকিৎসক বলেন, রবিনসনের পেটেন্ট বার্লির ন্যায় দেশী বার্লি পরিষ্কাররূপে প্রস্তুত হয় না, সেজন্য রবিনসনের বার্লি রোগীর পথ্য এবং শিশুর খাদ্য রূপে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মসূরীর যূষ শাস্ত্রসম্মত একটী উত্তম বলকারী পথ্য। আস্ত মসূরী সুসিদ্ধ করিয়া (অবস্থা বিশেষে তাহাতে খৈ দেওয়া যাইতে পারে) উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে যে কাথ বাহির হইবে, তাহা সামান্য ধ'নে বাটা, লবণ ও তেজপাতা দিয়া সম্ভরা দিয়া লইলে উত্তম পথ্য প্রস্তুত হইল। মসূরী সিদ্ধকালে উহার ফেনা উঠাইয়া ফেলিতে হয়, পুরাকালে এই পথ্য বহু পরিমাণেই ব্যবহৃত হইত, এখনও বৃদ্ধগণ ইহাকে 'আহার ঔষধ, দুইই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অপক্ক রসকে পরিপাক করিতে মসূরের অদ্ভুত ক্ষমতা, আয়ুর্ব্বেদে মসূরের যূষ ধারক এবং জ্বরাতিসারে বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, মসূর সিদ্ধ জল এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মসূরের যূষ আমরা অতিসারে ব্যবহার করি কই?

শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির জ্বরে বিশেষতঃ বর্ষাকালীন জ্বরে, যেস্থান দেহ, অপক্ক রসে পূর্ণ, মুখ বিস্বাদ যুক্ত, শরীরে ভার বোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আবশ্য কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গগ্লানি প্রভৃতি যাহার উপসর্গ, সেস্থলে মসূরের যূষ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিতে এবং গ্রীষ্মকালীন জ্বরে মসূরের যূষ দাহ এবং তদানুষঙ্গিক উপসর্গ বৃদ্ধি করিতে পারে, যে স্থলে মসূরের যূষ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তথায় উহার বদলে কাঁচা মুগের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মুগের যূষ পেটের পীড়ায় নিষিদ্ধ।

শ্লৈষ্মিক জ্বরে আর একটী সুপথ্য। টাট্‌কা (কাঠখোলায় ভাজা অর্থাৎ বিনা বালি সংযোগে যাহা ভাজা হয়) খৈ গরম জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে ভিজিয়া গেলে চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়, জলে সিদ্ধ করিয়াও মণ্ড প্রস্তুত করা যায়। খৈ মণ্ড রেচক, সুতরাং উদরাময়ে দেওয়া উচিত নহে, অবস্থানুসারে দুগ্ধ, চিনি, মিছরী বা লবণ ও লেবু সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

তরুণ জ্বরে প্রথম দুই চারি দিনের পর হইতে যখন জ্বরবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে, রোগীর কোষ্ট সাফ হয়, জিহ্বা পরিষ্কার হয় এবং রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন হইতে দুগ্ধ, (তপ্ত বার্লি ইত্যাদির সহিত) প্রয়োগ করা উচিত। দীর্ঘকালস্থায়ী রেমিটেন্ট ও টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরে রোগীর বল রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অহিফেনসেবী এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের নিতান্ত আবশ্যক না হইলে দুগ্ধ বন্ধ করিওনা। শিশুদের দুগ্ধ সহ্য না হইলে চুণের জল অথবা সোডামিশ্রিত করিয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

রেমিটেণ্ট এবং টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় বিদ্যমান না থাকিলে উত্তম সাগু এবং বার্লির সহিত যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। পথ্য নিয়মমত ৩।৪ ঘণ্টা অথবা অবস্থা বিশেষে ১।২ ঘণ্টা অন্তর অল্প পরিমাণে দিতে হয়। পথ্য পরিপাকের জন্য রোগীকে উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। সর্ব্বদা এক প্রকারের পথ্যে রোগীর অরুচি জন্মিতে পারে, সুতরাং সুপক্ক ডালিম, বেদানা, অথবা আঙ্গুররস মধ্যে মধ্যে রোগীকে দেওয়া উচিত। ফল স্বভাবতই রেচক, সুতরাং উদরাময় বর্ত্তমানে ফল ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ডালিম, বেদানা রেচক নহে, বরং উহা ধারক, ইহা সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যেখানে উদরাময় বর্ত্তমান, সেস্থলে এরারুট উত্তম পথ্য। বাজারের এরারুটে নানাবিধ কৃত্রিমতা দোষ থাকে আশঙ্কা করিয়া আমরা প্লাস্‌মন এরারুট ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের দেশে শটি হইতে পালো প্রস্তুত হয়। উদরাময়ে ইহাও সুপথ্য। কৃমিগ্রস্থ শিশুদের পক্ষে পালো বিশেষ উপকারী। কিন্তু প্রস্তুতকারীগণ পালো প্রস্তুত সময়ে উহার বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন বলিয়া মনে হয় না, তাহার ফলে অনেক ধূলিকণা উহার মধ্যে থাকিয়া যায়। রোগীর পক্ষে ঐরূপ পালো বিশেষ অপকারী। তবে অনেকে ইহা নির্দ্দোষরূপে ঘরে প্রস্তুত করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। উদরাময়ে পূর্ব্বে যবের মণ্ড ব্যবহৃত হইত। ইহা উদর ভঙ্গ রোগীর উত্তম পথ্য। যব হইতে বার্লি প্রস্তুত হয়। বার্লি ইত্যাদির চলন হওয়াতে যবের কথা অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

উদরাময়ে গাভীদুগ্ধ অপকারী। যেখানে দুগ্ধ দেওয়া যায় না, অথচ রোগীর বল রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, সেস্থলে অনেকে হর্‌লিক্‌স মিল্‌ক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা বিলাতে প্রস্তুত জমাট দুগ্ধ মাত্র। কেহ কেহ ইহার বিশেষ উপকারিতা স্বীকার করেন না। যাহাহউক অন্য কোন পথ্যের ব্যবস্থা যেখানে হয় না, সেস্থলে ইহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন কোন রোগীর ইহা রীতিমত পরিপাক হয় না, সে ক্ষেত্রে পালো, যবের মণ্ড ইত্যাদি দেশী পথ্যের শরণ লইলে ভাল হয়। অনেকে স্যানাটোজেনকে অধিকতর উপকারী বলিয়া স্বীকার করেন।

ছানার জল ধারক। সুতরাং উহাতে পুষ্টিকারিতাশক্তি না থাকিলেও উদর ভঙ্গে (বিশেষতঃ যেস্থলে পেটফাঁপা বর্ত্তমান) ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্য পথ্যের মাঝে মাঝে ইহা প্রয়োগ করা উচিত। অত্যুষ্ণ দুগ্ধ একটী কাচের বা পাথরের পাত্রে রাখিয়া তাহাতে সামান্য কাগজী বা পাতি লেবুর রস মিশাইলে ছানা কাটিয়া যাইবে, ঐ জল ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে, ছানার জল পরিষ্কার কাঁচবর্ণের হইবে। দুধের অংশ থাকিলে উহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে রোগীর অপকার সাধনই করিবে। লেবুর রস প্রয়োজনাধিক হইলে ছানার জল টক্ হইয়া যায়, উহা রোগীর পক্ষে অপকারী। লেবুর রসে প্রস্তুত ছানার জল পরিপাকের সহায়তা

করিয়া রোগীর উপকার সাধন করে। কেহ কেহ ফিটকিরি দিয়া ছানার জল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ফিট্‌কিরি অত্যন্ত ধারক, সুতরাং উহা হঠাৎ রোগীর দাস্ত বন্ধ করিয়া দিতে পারে, লেবু পাওয়া না গেলে উহার পরিবর্ত্তে Citric asid সাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য।

(কবিরাজ শ্রী নীলকান্ত রায় কবিরত্ন)

—:o:—

চক্র। যাঁহারা বহুদিন পূর্ব্বে নাড়ী ধরিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধাদির ন্যূনাতিরিক্ত, অনুলোম বিলোম দ্বারা রোগ, মৃত্যু ও আরোগ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন, অভিসম্পাত-অভিচারাদি ও যে মৃত্যুর কারণ ইহা যাঁহাদের মস্তিষ্ক-নির্গত তাঁহাদের সঙ্গে কি অন্য কাহারও তুলনা হয়?

সুরেন। হানিমানের সঙ্গে কি হয় না। তিনি যে চিকিৎসার একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

চক্রপাণি। না।

সুরেন। কেন?

চক্র। জান ত সৃষ্টিটি কি? হানিমান একজন বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি দেখিলেন লোকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, দেবতাকে মান্য করে, ভূত পিশাচকে ভয় করে, অথচ ইহা-দের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু এ বিশ্বাসের একটা ফল যে লাভ না হয় এ বলা যায় না। 'বিশ্বাস থাকিলে তাহার ফল আছে' এই প্রমাণ সাহায্যে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, চিকিৎসায় বিশ্বাস দ্বারা অবশ্যই চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাইবে, বস্তুতও চিকিৎসার কোন বিশেষ ফল নাই; নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে কেবল মাত্র স্পীরিটেরই ক্রিয়া দেখা যায়।

সুরেন অবাক হইয়া চক্রপাণির মুখের দিক কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, পরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, আপনার এ কেমন বিশ্বাস, যাঁহার গবেষণায়, যাঁহার অলৌকিকতায়, যাঁহার কৃতকার্য্যে আজ জগৎ স্তম্ভিত, আপনি তাঁহাকে একেবারে অস্বীকার করিতেছেন, বিশ্ববাসীকে ভ্রান্ত মূঢ় বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, একি ঠিক? বিশ্ববাসী সবাই কি ভ্রান্ত? না সবাই কি জড়? না এক জন ভ্রান্ত, একজন মুগ্ধ?

চক্রপাণি। সবাই বলি কেন? যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা কি উহাতে মুগ্ধ না উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান?

সুরেন। কেন বিশ্বাস করিবেন না? যদি আয়ুর্ব্বেদ, অ্যালোপ্যাথিকাদি বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে উহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না কেন? ইহা কি চিকিৎসা নয়? ইহাতে কি রোগ নাশের কোন উপায় নির্ণয় করা হয় নাই?

চক্রপাণি। হাঁ ইহাতে রোগ নাশের ঔষধ নির্ণয় করা হইয়াছেন, কিন্তু তাহা পয়ামর্শের বিরুদ্ধ।

সুরেন। কি রকম?

চক্রপাণি। প্রথমতঃ দেখ ঔষধ এত সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম অংশে বিভাজিত যে, তাহার ক্রিয়া শরীরের উপর প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

সুরেন। কেন?

চক্র। ঐ দ্রব্যের বিশেষ কোন স্বাদ থাকেনা বলিয়া উহা ক্রিয়াশূন্য, কেবল মাত্র স্পিরিটের আস্বাদই প্রত্যক্ষ হয় সুতরাং ঐ স্পিরিটের গুণ মাত্র ফলিয়া থাকে।

সুরেন। আস্বাদ সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না, কারণ বালকগণকে অনেক সময় কুইনাইনাদি তিক্তদ্রব্যও মিষ্টাদি দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া ঔষধ সেবন করান হয়, কিন্তু তাহাতে ঐ সব দ্রব্যের ক্রিয়ার গুণের কোন লাঘব দেখা যায় না। অতএব স্পীরিটের আস্বাদ বাহুল্য মাত্র। স্পীরিটের ক্রিয়া হইবে ইহার মানে কি?

চক্র। বেশ প্রমাণ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সেই মিষ্ট আবরণ উদঘাটন করিলে তিক্ত আস্বাদটী পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই উহার এক রসের জন্য ঐ এক ক্রিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মাদার টিংচার বা স্থূল বস্তুতে সে আস্বাদ আছে, তাহার সূক্ষ্মাংশ ঐ স্পিরিটে নিশ্চয় নিহিত আছে, যাহার স্থূলাংশে ক্রিয়া হইবে, তাহার কি সূক্ষ্মাংশে ক্রিয়া হইবে না? স্বীকার করি সূক্ষ্মাংশে তাহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইবে, কিন্তু সে ক্রিয়া যে ফলবতী হইবে ইহা স্বীকার করিনা।

সুরেন। কিছু মাত্রও নয়?

চক্র। না। কেন তা শুন। জল অগ্নি নির্ব্বাণ করে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে বিন্দুমাত্র জল কি প্রবেশ করিতে পারে? পারিলেও কি নির্ব্বাণ করিতে পারে? পড়িবা মাত্র সে উড়িয়া যায়, বা শুষিয়া যায়। কেন ক্রিয়া করিতে পারেনা? ওরূপ অগ্নিকুণ্ডে অমনি ভাবে শত শত মোন জল সিঞ্চন করিলেও কোন ফল ফলে না, কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, ব্যাধি প্রধান্যানুযায়ী ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট না হইলে সে ঔষধ অবশ্য নিষ্ফল হইবে। এ প্রমাণ হোমিওপ্যাথেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, রোগ পুরাতন হইলে ঔষধের মাত্রা কম হইবে, যথা নূতন রোগে অল্প ডাইলুসন ব্যবহার করিবে। অনেক স্থলে ব্যাধির পুরাতনাবস্থায় দোষের মাত্রা যে বাড়িয়া যায় ইহা কি মিথ্যা? অগ্নিমান্দ্য, যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস ইত্যাদি বহুবিধ রোগ পুরাতন হইলে তাহার শক্তি প্রবল হইয়া থাকে।

সুরেন। নিশ্চয়। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ডাইলুসন বেশী হইলে তাহার শক্তি বেশী হইবে। আয়ুর্ব্বেদও তাহা স্বীকার করিতেছেন, যথা।— মূলধাতু অপেক্ষা ভস্মের গুণ অধিক, শত পুটিত অপেক্ষা

সহস্র পুটিতে ক্রিয়া বেশী। অর্থাৎ মূলবস্তু অপেক্ষা বিভাজিত বস্তুর গুণ বেশী।

চক্র। সেটা কেন তাহা জান? শরীরে মিলাইবার জন্য, পরিমাণ কমাইবার জন্য নয়। শত পুটিত লৌহের মাত্রা একরতি হইলে যে সহস্র পুটিতে মাত্রা তদপেক্ষা কম হইবে, তাহা নয়, ব্যাধির শক্তি যেরূপ, ঔষধের মাত্রা তদ্রূপ হইলে তবে ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে। আয়ুর্বেদ যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম, বস্ত্র হইতে অর্থাৎ বস্ত্র ছাঁকিলে যে লৌহচূর্ণ সকল স্থলে হংসের ন্যায় হাল্কা ভাবে ভাসিয়া বেড়াইবে তাহাই মৃত। এইরূপ লৌহই ঔষধের যোগ্য। শত পুটিত বা সহস্র পুটিত তাহা বিচার করিবার দরকার হয় না। বঙ্গ সম্বন্ধেও ঐরূপ বলিয়াছেন,"যাবৎ অঞ্জনের মত বর্ণ ও স্বাদ ও হাল্কা না হইবে তাবৎ মর্দ্দন করিবে"। তাম্র সম্বন্ধেও "যাবৎ উহার ভ্রান্তি দোষ না যায় তাবৎ উহাকে পুট দিবে"। অভ্র সম্বন্ধে নিশ্চন্দ্র মারিতাভ্রে রস, বীর্য্য, তনু, দৃঢ় হয়, জরা বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু নাশ হয়। স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি মুক্তাদির এরূপ প্রমাণ নাই বলিয়া উহাদিগকে নিরূপিত পুটে পাক করিতে হইবে। অনেকে ধাতুর শত পুট, সহস্র পুট দেখিয়া ডাইল্যাসনের সঙ্গে তুলনা করেন, কিন্তু এ তুলনা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া সুরেন চিন্তা করিতে লাগিল। চক্রপাণি বলিলেন, আর একটী কথারও কোনও যুক্তি পাই না।

সুরেন চিন্তাত্যাগ করিয়া বলিল,—কি?

চক্রপাণি। সুস্থাবস্থায় যাহার কোন ক্রিয়া দেখা যায়না, তাহার অসুস্থাবস্থায় যে ক্রিয়া হইবে এ কিরূপ যুক্তি?

সুরেন। সেকথা পরে হইবে আগে মাত্রার বিষয় ঠিক হউক। আয়ুর্বেদ ঔষধের মাত্রা একরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

চক্র। কই?

সুরেন। মৃত্যুঞ্জয় রসের মাত্রা মুগের মত, লক্ষ্মীবিলাসের মাত্রা দু'রতি, মকরধ্বজের মাত্রা এক রতি ইত্যাদি। রোগের ন্যূনাধিক্য বশতঃ এসব ঔষধের মাত্রার কি হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চক্র। কেন হইবেনা? আয়ুর্বেদত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চিকিৎসক ইচ্ছামত নিরূপিত মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। মাত্রা কেন জান? কোন শক্তিকে বাধা দিতে হইলে তদপেক্ষা বেশী শক্তি প্রয়োগ না করিলে উহাকে কখনই বাধা দেওয়া যায় না, তাত জানই। আবার কেহ কেহ শাস্ত্রের নিরূপিত মাত্রা বার বার দিয়া ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তবে শাস্ত্রে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন, তা তো জানই, এমাত্রায় শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা কোনরূপ ক্ষতিকর নয়।

সুরেন। আর একটী কি বলিতেছিলেন?

চক্র। হাঁ, প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়াহীন, পরোক্ষে যে সে অত বড় ক্রিয়াবান হইবে এ ধারণা মনে যেন স্থান পাইতে চায় না।

সুরেন। আয়ুর্ব্বেদের সব ঔষধ কি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ?

চক্র। তা বই কি? জয়পাল সেবন করিলে দাস্ত হয়, কস্তুরী সেবনে গরম হয়,

হিমসাগরে ঠাণ্ডা হয়, যবক্ষারে প্রস্রাব বেশী হয়, তাম্র বমনকর, লৌহজ্বর নাশক, রক্তরোধক ইত্যাদি, এ সকলের ফলতো হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্র। ও গুলিত দ্রব্য, যৌগিক ঔষধ তো'নয়।

চক্র। দ্রব্যগুলির ক্রিয়া যেরূপ, যৌগিক ঔষধের ক্রিয়া সেইমতইত হইবে বিশেষতঃ উহার একটা প্রভাব বেশী থাকিবে। যেমন কস্তুরী ঘটিত ঔষধে গরম বোধ হয়, জয়পাল ঘটিত ঔষধে দাস্ত বেশী হয়, ইহার কোনটা না ফলিয়া থাকে? এছাড়া একটা অতিরিক্ত প্রভাব হইয়া থাকে, যথা—লৌহ ও তাম্র একটী ঔষধে আছে, উহার প্রভাব হইতেছে বাতশ্লৈষ্মিক অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ, জ্বর নাশক। লৌহের স্নিগ্ধতার সঙ্গে তাম্রের উগ্রতা মিশ্রিত হইয়া ঐ একটী নূতন গুণের শক্তি উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যেকের গুণ চাপিয়া রাখিয়া একটি নূতন গুণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লৌহের স্নিগ্ধতায় কফ যেটুকু বৃদ্ধি পাইবে, তাম্রের উগ্রতায় তাহা নষ্ট হইল। লৌহ ও তাম্র উভয়ের মিশ্রিত গুণে পুনরায় উগ্রতা দোষ আর জন্মিতে পারিবে না; বিশেষতঃ জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, কফ, হৃচ্ছূল, আমদোষ প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইবে। হোমিওপ্যাথ এই সংমিলন বা রসায়ন স্বীকার করেন নাই।

সুরেন্দ্র। সব ঔষধের ক্রিয়া কি প্রত্যক্ষ বোধ হয়?

চক্র। সুস্থাবস্থায় প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ শরীরের একটা পরিবর্ত্তন অবস্থা আসিয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথিকের এরূপ কোন ক্রিয়া দেখাইবার নাই বলিয়া যেখানে আরোগ্যাবস্থা দেখা যায়, সেখানে স্বাভাবিক, আর অনারোগ্য অবস্থা দেখিলে ঔষধের নিষ্ক্রিয়তাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য মতে রোগ আরোগ্য না হইলে তাহা কেবল চিকিৎসকেরই অজ্ঞতা বুঝিতে হইবে। ইহার কি উত্তর? সুরেন্দ্র তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।

(২)

এ সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য সুরেন তাহার অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে দুদিন ধরিয়া অনেক তর্ক ও পরামর্শ করিল। শুনিয়া অনেকেই অবাক হইয়া গেল। কেহ বলিল, ও কথার আর মীমাংসা কি? হানিমান যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনই ভুল হইতে পারেনা। কেহ বলিল উহার কি ভুল কখনও সম্ভব হয়? জার্ম্মানবাসীগণ এখন তাঁর পিত্তলের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতেছেন। কেহ বলিল, জার্ম্মাণ-আমেরিকানগণ যখন তাঁহার মতের পরিপোষক, তখন কি উহাতে ভুল আছে?

পরদিন সুবিধামত সুরেন চক্রপাণিকে পূর্ব্বোক্ত মিমাংসা জ্ঞাপন করিল, চক্রপাণি বলিলেন,—ঔষধে ছাড়াও যে রোগ আরোগ্য হয় তাহা স্বীকার কর?

সুরেন আশ্চর্য্য ভাবে বলিল, কিরকম?

চক্রপাণি বলিলেন, পেট ফাঁপিয়া কাহার কাহার কোনদিন অজীর্ণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় কেহ মিশ্রী বা চিনির সরবৎ, কেহ লেবুর রস, কেহ ঘোল, কেহ বা কোন ঔষধ সেবন করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হয়, আর কেহবা কিছু না খাইয়া শুধু

দিবানিদ্রা দ্বারা, কেহবা প্রাতঃভ্রমণ দ্বারা, স্নানদ্বারা, আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। রোগারোগ্য অতএব যে শুধু ঔষধ দ্বারা হয় এরূপ নহে। পথ্য দ্বারাও হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথগণ এইজন্য ঐ তৃতীয় উপর নির্ভর বেশী করিয়া থাকেন ইহাই তো আমার মনে হয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত ও তৈলাদি পাকের প্রকৃত বিধি।

(কবিরাজ শ্রীদ্বারকা নাথ সেন কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ)

কলিকাতায় ব্যবসায় করিতে আসিয়া দেখিতেছি; কবিরাজী তৈলের বর্ণ ও গন্ধ মনোমুগ্ধকর নহে, উপরন্তু সাধারণ তৈলাদি অপেক্ষাও দুর্গন্ধযুক্ত, সেই কারণে বড়লোকেরা উপহাস করিয়া বলেন যে, "অগ্রাস্ত ঔষধ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা করুন, নিতান্ত ফল না হয় আপনাদের এসেন্স ব্যবহার করিব"।

"দুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈল মরুণং সদগন্ধ মাকুর্ব্বতে" ইহা দ্বারা তৈলের মূর্চ্ছা ক্রিয়ায় কোন ফল নাই, না তৈলে যে মূর্চ্ছা পাক-সম্যকরূপে হইয়াছে তাহারই লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? মূর্চ্ছা ক্রিয়ার ফল হইতেছে তৈলের শোধন। যেমন স্বর্ণাদিতে তাহাদের স্বাভাবিক দোষ দূরীকরণার্থে তৈল-তক্রাদির দ্বারা উহার সংশোধন ক্রিয়া করিতে হয়, সেই-রূপ সমস্ত তৈলাদি পাকের পূর্ব্বেই উহার স্বভাবতঃ দোষ নষ্ট করিবার জন্য মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা উহার সংশোধন আবশ্যক। নতুবা সংশোধনাদি না করিয়া স্বর্ণাদির মারণ ক্রিয়া করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিলে সুফল না হইয়া কুফলই উৎপাদন করে, এ অবস্থায় প্রাচীন বৈদ্যদিগকে স্তাবক না বলিলে কি ভাল হইত না? সংগ্রহে আগে অথ বাতাদ্যহ তৈলানাং বিশেষ মূর্চ্ছা বিধিঃ" অবধি তৎ তৎ রোগে ফল বিশেষের জন্য মূর্চ্ছাপাক ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

প্রাচীন বৈদ্যেরা শোধন না করিয়া প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিতেন না। চক্রদত্তে সেই মুখশুদ্ধি বচশুদ্ধির নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইত না। যাহারা প্রাচীন কুলীন বৈদ্য—কুলপরম্পরাক্রমে যাঁহারা চিকিৎসা বৃত্তি করিয়াই আসিতেছেন, তাঁহাদের বাটীতে প্রাচীন পরিভাষা ও সার সংগ্রহাদি গ্রন্থ আছে, ঐ সকল গ্রন্থে তৈলের মূর্চ্ছাপাক বিধির শেষে এই ফলোক্তি আছে।

"সর্ব্বেষাং তৈলপাকানাং শোধিনাং পরি-কীর্ত্তিতং"

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তৈলের শোধনই মূর্চ্ছাক্রিয়ার ফল।

প্রবন্ধ লেখক কটুতেলে বা ঘৃতে মূর্চ্ছা পাকের ফলে আম দোষ নষ্ট হয়, এই স্পষ্ট উক্তি দেখিয়াও উহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিতে বসিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের পত্রই প্রমাণ বলিয়া ঐ উক্তির উপর সন্দেহ করিয়াছেন, পত্র প্রমাণ করিয়া প্রবন্ধ লেখকই প্রাচীন পরিভাষাকারের উপর সন্দেহ করুন, কিন্তু আর কোন ব্যক্তি প্রাচীন পরিভাষা—যাহার উপর আস্থা করিয়া এযাবৎকাল সমস্ত চিকিৎসক চলিয়া আসিতেছেন, সেই প্রাচীন বৈদ্য অপেক্ষা পূজ্যপাদ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কথা শিরোধার্য্য করিবেন না। আর কথায় কথায় বিধানের কথা আমরা জিজ্ঞাসা করি,তৈল-তক্র-গোমূত্র-কুলখের কাথে স্বর্ণাদি একবার গরম করিয়া ভিজাইলে তাহাতে কি ভাবে দোষ সংশোধন হয়, কিরূপে দোষটী চলিয়া যায়, ইহা কি নিজে কখনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখিয়াছেন? শুনিয়াছি আজ কালকার কোনও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মকরধ্বজে স্বর্ণ না দিলেও সমান ফল হয়, যেহেতু স্বর্ণের কোন অংশ মকরধ্বজে মিশে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় সেই মতের পরিপোষক, না আজকালের বিজ্ঞান দ্বারা স্বর্ণাদি মিশ্রণ করিয়া মকরধ্বজ করিলে তাহার যে কোন সূক্ষ্মাংশ উহাতে মিশ্রিত হয় বা তাহাতে কি বিশেষ ফল হয়, ইহা পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা স্বীকার করেন? আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা সকল দ্রব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারি না বলিয়া কি প্রাচীনগণও পারিতেন না আমরা বলিব। আমরা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া সুশ্রুতের প্রত্যক্ষ লক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ। নৌষধীর্হেতুভির্ধীমান পরীক্ষেত কদাচন-সহস্রেণাপি হেতূনাং নাম্বষ্ঠাদি বিরেচয়েৎ তস্মাৎ তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে নতু হেতুষু॥

এই বাক্যই শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

তা'রপর গন্ধপাকের আলোচনা করা যাউক। গন্ধ পাকের দ্বারাও তৈলে মনোহর গন্ধ হয় না তাহা যাঁহারা কবিরাজী তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। সম্প্রতি গন্ধপাকের মূলে কোন শাস্ত্র আছে কি না এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাচীন বৈদ্য মহাশয় "গন্ধ দ্রব্য মিদং প্রদেয় মখিলং শ্রীবিষ্ণু তৈলাদিষু' বলিয়া তাঁহাদের কল্পিত বাতব্যাধি অধিকারের সমস্ত তৈলেই গন্ধ দ্রব্য দ্বারা পাক করিতে বলিয়াছেন, বৈদ্য সম্প্রদায়ও যে সকল তৈল বায়ু নাশের জন্য ব্যবহার করেন, সেই সকল তৈলেই গন্ধ পাক দিয়া থাকেন। আজকাল যে সকল তৈল চিকিৎসক সমাজে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায়ই গন্ধ পাক ব্যবস্থাপক বৈদ্যদের দ্বারাই প্রচারিত। শ্রীবিষ্ণু তৈল "বিষ্ণুনা পরকীর্ত্তিতং" মহানারায়ণ তৈল, "নারায়ণেন বিহিতং" শ্রীগোপাল তৈল "অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং,' হউক, উহা চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। সম্প্রদায় ক্রমে ঐ সকল তৈল পাক বিধি স্মরণ রাখিয়া পরে গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন মানিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণু তৈলাদির ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া যদি ইহাই মানিয়া লই, যে শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি তৈল বহু প্রাচীন, উহা চরকাদিতে না থাকিলেও আর্য্যগ্রন্থ হইতেই প্রাচীন

বৈদ্যেরা সংগ্রহ করিয়া ছিলেন ইহা না স্বীকার করিবার কারণ কি? গন্ধপাকে অজ্ঞাত ফলের সঙ্গে গন্ধ বৃদ্ধি হউক তাহাতে ক্ষতি কি? গন্ধ বৃদ্ধিরও একটা ফল আছে। যে সকল ঔষধে রোগীর অরুচি জন্মে, সে সকল ঔষধে ভাল না হইয়া রোগ বৃদ্ধিই হয়। সেই জন্ম লোকের প্রকৃতি অনুসারে নানারূপ ঔষধ কল্পনা। গন্ধপাক দিয়া যদি দুর্গন্ধ নষ্ট হয় বা কিঞ্চিৎ সদ্‌গন্ধ হয় তাহা হইলে সে ঔষধ রোগীর উদ্বেজক হইবে না। উদ্বেজক না হইলে ফলও ভাল হইবে ইহাই কল্পনা করা উচিত। গন্ধ পাকের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, তাহা দেখিয়াই নীরব হইব। চরকে বলাতৈল বাতব্যাধি চিকিৎসিতাধ্যায়ে। যথা:—

বলা শতং গুডূচ্যাশ্চ পাদং রাস্নাষ্টভাগিকং
জলাঢক শতে পক্ত্বা দশ ভাগ স্থিতে রসে,
দধি মস্তিষু নির্য্যাস শুক্ত তৈলাঢ়কং সমৈঃ।
পচেৎ সাজপয়োহর্দ্ধাংশৈঃ কল্কেরেভিঃ
পলোন্মিতৈঃ।
শঠী সরল দার্ব্বেলাং মঞ্জিষ্ঠা গুরু চন্দনৈঃ
পদ্মকাতিবিষা মুস্ত সুর্প্যপর্ণি হরেণুভিঃ
যষ্ট্যাহ্ব সুরস ব্যাঘ্র নখর্ষভক জীবকৈঃ
পলাশ স্বরস কস্তূরী নলিকা জাতি কোষকৈঃ
স্পৃক্কা কুঙ্কুম শৈলেয় জাতি কটুকলাম্বুভিঃ
ত্বক্‌ কুন্দুরু কর্পূর তুরুস্ক শ্রীনিবাসকৈঃ
লবঙ্গ নখ কক্কোল কুষ্ঠ মাংসী প্রিয়ঙ্গুভিঃ
স্থৌনেয় তগর ধ্যাম বচা মদনক প্লবৈঃ
সনাগকেশরৈঃ সিদ্ধে ক্ষিপেচ্চাত্রাবতারিতে
পত্র কল্কং ততঃ পূতং বিধিনা তৎ প্রয়োজেত্

এই তৈলে সুগন্ধকর কল্কাদি দ্রব্যের দ্বারা পাকের পরও পুনঃ গন্ধ দ্রব্য (পত্র কল্ক) দ্বারা পাক করিবার বিধান আছে, ইহা দেখিয়াও গন্ধপাককে একেবারে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। চক্রদত্তে "মহারাজ প্রসারিণী-তৈলের' পাক বিধান কালে কেবল গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা পাক নয়, তাহার বিশেষ শোধন করিয়া তদ্দ্বারা পাকের বিধান আছে। কেবল "মহারাজ প্রসারিণী'তে নয় ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা অপরাপর তৈলও প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চক্রদত্তে যে সকল ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল, এলাদি তৈল, অষ্টাদশ শতী প্রসারিণী তৈল আছে তাহার মোটামুটি দ্রব্য সকল লেখা থাকিলেও উহার পাক বিধি লেখা নাই। উহা বৃদ্ধ বৈদ্য পরম্পরায় শিক্ষা করিতে হয়। চক্রদত্তের টীকাকারও সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, চিকিৎসক সমাজও তাই করেন। কেবল পুস্তক খুলিয়া দেখিলে চিকিৎসা কার্য্য চলে না, ইহাতে নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হইলে দীর্ঘকাল সুচিকিৎসকের নিকট থাকিয়া ঔষধ পাক, রোগের ব্যবস্থাদি হাতে কলমে শিখিতে হয়। এইজন্য দৃষ্টকর্ম্মা হওয়াই একটী বৈদ্যের প্রধান গুণ। শাস্ত্রের সংক্ষেপ ভাবে উক্তি অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহারই বিস্তারোক্তি করিয়াছেন মাত্র। এই বিশ্বাসে আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক অজ্ঞ বৈদ্যেরা সেই বৃদ্ধ বৈদ্যদিগকে বড়লোকের "মে'সাহেব" না বলিয়া নিঃস্বার্থভাবে আর্ত্তের আশ্রয়দাতা, প্রাণরক্ষক, জগতের উপকারী বলিয়া শিষ্যের মত তাঁহাদের বাক্য অসন্দিগ্ধচিত্তে মাথায় ধারণ করে। এই ভাব যতদিন থাকিবে, যতদিন আমরা তাঁহাদের উপর নিজেদের বিদ্যা প্রকাশে কৃতিত্ব দেখাইতে না পারি,

ততদিন আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিয়া সকল চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। আর যেদিন হইতে বৃদ্ধদিগের মতে অনাস্থা প্রকাশ করিতে শিখিব, সেইদিন হইতেই আয়ুর্ব্বেদকে ও দুরারোগ্য রোগে ধরিয়া তাহার জীবন ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইব।*

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী
এন, এ, এম, এস ; এচ, এম, বি]

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে, বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব,—ভারতের গৌরব—জগতের গৌরব-সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ১১ই তারিখের রবিবার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পুরুষ সার আশুতোষ পাটনা সহরে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সারা ভারতে সার আশুতোষ কেবল মাত্র একজনই জন্মিয়াছিলেন। সার আশুতোষের তুলনা কাহারো সহিত হয় না। তাঁহার তুলনা করিতে হইলে বলিতে হইবে "তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

সার আশুতোষের অতুলনীয় কীর্ত্তি সমূহ আজ কয়েকদিন ধরিয়া প্রত্যেক সাময়িক পত্রেই বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিষয় বেশী কিছু বলিবার আমার নাই।

সকলেই জানেন তিনি একজন খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন—প্রকৃত বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার চালচলন সাজ সজ্জা সকল তাতেই একজন প্রকৃত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইত। সকলেই জানেন সার আশুতোষের মত বিদ্বান ভারতে আর একজনও নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

---

* এই প্রবন্ধ লেখক ঘৃত ও তৈলাদির পাক বিধি সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন আমরা এই মতেরই পরিপোষক। ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখনই ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পরও যে আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অন্তের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠান তাহা আমরা পত্রস্থ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই—তাহার কারণ তাহা না করিলে সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হয় না। ফল কথা আমাদের প্রতি কটাক্ষ করার জন্যই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটী অযৌক্তিক জানিয়াও আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহা হউক বর্ত্তমান যুক্তি মূলক প্রবন্ধটী পড়িয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রম দূর হইলে আমরা সুখী হইব। আং সং

সত্যই বলিয়াছেন "তিনি উৎকৃষ্ট বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট বিচারপতি বলিলে তাঁহাকে খাট করা হয়, তিনি শিক্ষার অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, কিন্তু শুধু শিক্ষার নেতা বলিলে যাহা বুঝায় তিনি তাহা হইতে অনেক বড় ছিলেন, তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু সেদিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল দিকটা দেখা হইল না। তিনি ছিলেন একটা জাতকে গড়িয়া তুলিবার বিশ্বকর্ম্মা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সার আশুতোষের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ছিল, সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকেও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বাঙ্গালী বলিয়া এবং সেই বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা বলিয়া সার আশুতোষ গৌরব অনুভব করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, সে আজ বেশীদিনের কথা নহে, বোধ হয় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় মহাশয় "কার্ব্বঙ্কল" রোগে আক্রান্ত হন। আমি একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, তাঁহার আদেশে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে 'নায়ক' পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেছি, এমন সময় সার আশুতোষ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সকলেই উঠিয়া গেলেন। আমাকেও যাইবার জন্য দু'চারজন ইঙ্গিত করিলেন, আমাকে কিন্তু একটা লোভ পাইয়া বসিল। মন কেবলই বলিতে লাগিল, এতবড় একজন লোক এলেন, তাঁর পায়ের ধূলাটা নিয়ে যাবিনে? তাই আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না। সেইখানেই রহিয়া গেলাম, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম—তিনিও আমাকে বসিতে বলিলেন। আমার হাতে কাগজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কি কাগজ?" আমি বলিলাম 'নায়ক'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন 'আমার সম্বন্ধে বুঝি খুব গাল দিয়েছে'। তিনি বলিলেন "হাঁ প্রথমেই আপনার [illegible]" বাস্তবিক সেইদিন প্রথমেই 'সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও তাহাতে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় লেখা বাহির হইয়াছিল। আশুবাবু এই কথা শুনিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'উহার গাল শুনিতে আমার বেশ লাগে'। সেই সময় নায়ক সম্পাদন করিতেন—স্বনামধন্য স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আমার জীবনের এই ঘটনা আজও যেন সম্মুখে দেখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে।

আশুবাবুর নিন্দা সুখ্যাতির বাহিরে ছিলেন। তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, এমন কি তাহার উপকার করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। আগামী বারে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, "গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩১। | ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

স্বপ্ন বিবৃতিঃ।

(কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ)

স্বপ্ন শব্দের প্রথম অর্থ নিদ্রা, অমর সিংহ বলেন "স্যান্নিদ্রা শয়নং স্বাপঃ স্বপ্নঃ সংবেশ ইত্যপি।" গ্রন্থাদিতেও "মৃদং দিবা স্বপ্নমতীব তীক্ষ্ম্", "মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ", প্রভৃতি বহু স্থলে নিদ্রা অর্থেই স্বপ্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার দ্বিতীয় অর্থ নিদ্রাবস্থায় অনুভূত বিষয়াদি,

"ইত্যেতে দারুণাঃ স্বপ্ন রোগী বৈর্যাতি পঞ্চতাম্"

"স্বপ্নান্ পশ্যন্ত্যোনেকধা" "স্বপ্নঃ সোহস্ময়লো-ভবেৎ"

ইত্যাদি চরক বচনে স্বপ্নকে সুপ্ত ব্যক্তির অনুভূত বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলেও আমার অদ্যকার বক্তব্য দ্বিতীয়ার্থ-বোধক স্বপ্নকে লইয়াই, কিন্তু উহা পূর্ব্বোল্লিখিত নিদ্রাব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া নিদ্রা সম্বন্ধেও আমাকে কিছু বলিতে হইবে। অতএব নিদ্রা কি? স্বপ্ন কি? স্বপ্নের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্পর্কের উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি বিষয় কয়টিকে লইয়াই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমাকে আজ আলোচনা করিতে হইবে। নিদ্রা তমোগুণ বহুল বলিয়াই সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ক্লান্ত মন যখন কর্ণ চক্ষুঃ প্রভৃতি শ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় হইতে সরাইয়া আনে এবং

(আয়ুর্ব্বেদ সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

দিকে, তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয় মানব তখনই নিদ্রাগ্রস্ত হয় অথবা ঐ অবস্থাই মানবের নিদ্রিত অবস্থা। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

যদাতু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ
হৃদয়ং চেতনাস্থান মুক্তং সুশ্রুত! দেহিনাম্
তমোঽভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রাবিশতি
দেহিনাম্।

ঐ সময় পরিচালক রজোগুণ ও প্রকাশক সত্ত্বগুণ মনকে পরিত্যাগ করে বলিয়াই মন অধিক তমোগুণের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, মহর্ষি পতঞ্জলি ঠিক এই কথাই তাঁহার "অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা" সূত্রে স্পষ্ট বলিতেছেন, এই স্থলে অভাব প্রত্যয় শব্দের অর্থ তমঃ অর্থাৎ রজঃসত্ত্বের অভাব, এই তমোকে অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয় করিয়াই নিদ্রার উৎপত্তি, অভাব প্রত্যয়ং তমঃ বলিয়াই ঐ স্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে "মেঢ্র মনঃ সংযোগো নিদ্রা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, মেঢ্র শব্দে উপস্থ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়, নিদ্রাবস্থায় মনের আত্যন্তিকী তামসিকতা প্রকাশ করিবার জন্যই এখানে মেঢ্র শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, বাস্তবিক তমোগুণের দ্বারা মনের একান্ত অভিভূতি ভিন্ন এরূপ নিয়গতি কখনই সম্ভবপর নহে, সুতরাং "তমোঽভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রাবিশতি দেহিনাং" "তমঃ কফভ্যাং নিদ্রা", প্রভৃতি নিদ্রার আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্ত অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত অবিরোধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এখন দ্বিতীয়ার্থ প্রতিপাদক স্বপ্ন অর্থাৎ যাহাকে লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা তৎসম্বন্ধে বলিতেছি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটী ছাড়া দেহাবচ্ছিন্ন জীবের চতুর্থ কোন অবস্থা দর্শনকার স্বীকার করেন না, সুতরাং ইহাকে পূর্ব্বোক্ত নিদ্রার অন্তর্ভুক্ত করা ব্যতীত উপায় নাই, এখানে স্বপ্ন শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত নিদ্রা এবং সুষুপ্তি শব্দে স্থূলতঃ তাহার আতিশয্যকে বুঝায়। নিদ্রা এবং সুষুপ্তির সাধারণ ভেদ এই যে নিদ্রাবস্থায় মনের ক্রিয়া থাকায় সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" প্রভৃতি প্রকাশ করিতে গিয়া অনুভূত সুখের অবস্থা ও প্রকার বর্ণনা করিতে পারে কিন্তু সুষুপ্তির পর "কোনই দুঃখ ছিল না যেন পরমানন্দে ছিলাম" বলিতে পারে মাত্র, পরন্তু পূর্ব্বানুভূত আনন্দের প্রকার ব্যক্ত করিতে পারে না, তথায় আনন্দ যেন পুঞ্জীভূত, কারণ এই যে, সুষুপ্তির আনন্দ প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়; এইজন্যই উহাকে ঋষিগণ অবাঙ্-মনসগোচর ব্রহ্মানুভূতি অথবা নির্ব্বাণের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত স্বপ্ন কি তাহাই দেখিতে হইবে।

চক্ষুকর্ণাদি ও হস্তপদাদি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় মানবের মনই তাহাতে প্রধান। মন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই পরিচালক অন্তর ইন্দ্রিয় বলিয়া অন্তঃকরণ বাচ্য। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, এই মন আবার সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল। মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্, জাগ্রৎ অবস্থার সম্পূর্ণ তিরোধান ব্যতীত তাহার ক্রিয়ার কখনো বিরাম নাই। "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"। নিদ্রা গাঢ় না হইলে,

জাগ্রতের সম্পূর্ণ বিরতি না ঘটিলে,তমোগুণের দ্বারা মন সম্পূর্ণ অভিভূত না হইলে, রজের সামান্য সম্পর্কও থাকিলে মনের ক্রিয়াশীলতা থাকিবেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বাহিক ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রান্ত অবস্থায় ক্রিয়াশীল মনের যে অবস্থা অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত—অনেকটা শান্ত অথচ অল্প ক্রিয়াশীল মনের যে কম্পন তাহাই স্বপ্নরূপে ভাসমান হয়, সেখানে বাহিরের সম্বন্ধ যত কম সেখানে সত্যের স্ফুরণ ক্রমে তত বেশী, স্বপ্নের সফলাফলত্ব, সত্যাসত্যত্ব এই মানসিক অবস্থা বিশেষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন দিবাভাগে মনের যে সকল আবেগ কার্য্যরূপে পরিণত হইতে পারে না এমন আহত সংকল্পগুলি রাত্রে স্বপ্ন রূপে ভাসমান হইয়া থাকে, এই যুক্তি বিচারসহ নহে, কারণ তাহা হইলে অননুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের স্বপ্ন দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না, পক্ষান্তরে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত প্রভৃতি মনের কার্য্যরূপে পরিণত বিষয়গুলিরও পুনরায় স্বপ্নে উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অর্থই স্বপ্নের ঠিক, অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা না হইলে ক্রিয়াশীল মনের যে অবস্থাবিশেষ তাহাই স্বপ্ন ইহা বলা যাইতে পারে, মহামতি চরক ইন্দ্রিয় স্থানে স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

নাতি প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলাং স্তথা।
ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্ পশ্যত্যনেকধা॥
ইঃ ৫ম অঃ।

ঠিক পূর্ব্বের সেই কথা, গাঢ় নিদ্রা না হইলে মানব ইন্দ্রিয় সমূহের অধিনায়ক মনের দ্বারা সফল অফল বিবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনেও “জাগ্রৎ বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ” অর্থাৎ সুপ্তাবস্থায়—মনের যে জাগ্রত অবস্থায় যত বাসনার সমূহের সম্বন্ধ তাহাই স্বপ্ন এই রূপ উল্লেখ থাকায় স্বপ্ন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে, চরকের মতে স্বপ্ন দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক, এবং দোষজাত ভেদে সাত প্রকার; তন্মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় কোন বস্তু বিশেষরূপে দর্শন করিয়া তৎপরে নিদ্রা গেলে যদি সেই বস্তুরই স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলে সেই স্বপ্নকে দৃষ্ট স্বপ্ন কহে, এইরূপ কোন শব্দ বিশেষভাবে শ্রবণ গোচর করিয়া সুপ্তাবস্থাতেও সেই শব্দ অনুভব করিলে তাহাকে শ্রুত স্বপ্ন কহে, কোন বিষয় অপর কোন ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভব করিয়া নিদ্রাকালেও ঠিক সেইরূপ অনুভূত হইলে তাহাকে অনুভূত স্বপ্ন কহে, কোন শ্রুত কিম্বা অনুভূত বস্তু জাগ্রত অবস্থায় একান্ত প্রার্থিত হইলে স্বপ্নেও যদি তাহাই প্রার্থিত হইয়া থাকে তাহাকে প্রার্থিত স্বপ্ন বলে, অনেক সময়ে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিগোচর হইয়া দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত হয় নাই এমন বস্তুও যদৃচ্ছাক্রমে মনে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কল্পিত পদার্থ নিদ্রাকালে অনুভূত হইলে তাহাকে কল্পিত স্বপ্ন বলা যায়, নিদ্রাবস্থায় যাহা যাহা দেখা যায় উত্তরকালেও যদি তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে তবে সেই স্বপ্নকে ভাবিত স্বপ্ন বলে, আর বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া তদ্দ্বারা দোষানুরূপ যে সকল স্বপ্ন দৃষ্ট হয় সেগুলিকে দোষজ স্বপ্ন কহে।

মহামতি বাগ্ভট্টও স্বপ্ন সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন বলিয়া সেকথার আর পুনরুক্তি করিলাম না। উভয়েরই মতে কতকগুলি স্বপ্ন সফল এবং কতকগুলি স্বপ্ন অফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ভাবিক স্বপ্নকে লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে তাঁহার মতে স্বপ্ন এবং হস্ত কপালাদির রেখা প্রভৃতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্য ভাবিজন্মের শুভাশুভ ফলপ্রতিপাদক। যেমন স্বপ্নে রক্তবর্ণবস্ত্রাবৃতা কামিনী দর্শনে অর্থপ্রাপ্তি, হস্তস্থিত উর্দ্ধরেখা যশোবিত্তাদায়িনী ইত্যাদি, সুতরাং তাঁহার মতে এবং জন্মান্তরবিশ্বাসীর পক্ষে স্বপ্ন অমূলক নহে।

সম্প্রতি এই স্বপ্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্পর্ক কি তাহার আলোচনা করাই আমার প্রবন্ধোক্ত শেষ বিষয়। আয়ুর্ব্বেদে স্বপ্নের রোগকর্ত্তৃত্ব এবং রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া অনেকেই ঐগুলি ঋষিদের কল্পিত উক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা আগম অর্থাৎ আপ্তবাক্যে বিশ্বাসপরায়ণ, প্রত্যক্ষাদির মত ঋষিবাক্যকেও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছি, সুতরাং উহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে কিনা আমাদিগকে মানব বুদ্ধি হিসাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। রোগের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঋষি বলিতেছেন—

"রোগস্তু দোষ বৈষম্যং দোষ সাম্যমরোগিতা" অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের সমতা সম্পাদনই আরোগ্য। এই বৈষম্য আবার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি বহুভেদে বিবিধ এবং অনিষ্টসংযোগ প্রিয়বিয়োগাদি বহু কারণজাত বলিয়া বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। সাধারণতঃ বায়ু পিত্ত কফ রোগকারী হইবার পূর্ব্বে ছয়টী অবস্থায় অবস্থান্তরিত হয়, তাহারা এই :—সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদ। একটী কথা এস্থলে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি, আমি সাধারণ সভার সমক্ষে বিস্তৃত আয়ুর্ব্বেদের বিমল-বিপুল-বুদ্ধিকে ও আকুলকারী বিষয় সকল অল্প সময়ে অতি সংক্ষেপে অতি সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিতেছি। এমত অবস্থায় বঙ্গানুবাদের শব্দগুলি বিচার করিয়া নিরর্থকত্বাদি দোষ প্রমাণ করিতে গেলে আমার ত্রুটী অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং বক্তব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

বায়ু পিত্ত কফের পূর্ব্বোক্ত সঞ্চয়াদি ৬টী অবস্থা ঋতুবিপর্য্যয়, আহারবিহারবিপর্য্যয়াদি প্রকোপক কারণবশতঃই পর পর সংঘটিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই উষ্ণ শীতল পানে আহারাদির প্রার্থনা, গাত্র ভার, গাত্র দাহ, গাত্র কণ্ডুয়নাদি পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সমূহ মানবদেহে প্রকাশ করিয়া থাকে, ক্রম প্রকাশমান ঐ সকল লক্ষণগুলিই রোগের সামান্য পূর্ব্বরূপ, সম্প্রাপ্তি ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ রূপ প্রভৃতি নামে রোগের অবস্থা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ছয়টীর মধ্যে ব্যক্তি এবং ভেদ অবস্থাদ্বয় রোগরূপে প্রকাশীভূত অবস্থাও তৎপূর্ব্বগুলি সম্প্রাপ্তি পূর্ব্বরূপাদির প্রকাশক। দৃষ্টান্তস্বরূপ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বরূপ লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ভাবি ব্যাধিপ্রকাশক চিহ্ন,এই রোগের

পূর্ব্বরূপে উল্লিখিত শ্বাস, গাত্রমর্দ্দন,কফসংস্রব, তালুর শুষ্কতা, বমি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বৈষম্য গত বায়ু পিত্ত কফেরই আত্মলক্ষণ, যক্ষ্মা ত্রিদোষ জনিত ব্যাধি বলিয়া তিনটী দোষেরই প্রকোপক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, বায়ু পিত্ত কফের প্রত্যেকেরই প্রকৃত অর্থাৎ সুস্থ এবং বিকৃত অর্থাৎ রোগকারী অবস্থার পৃথক পৃথক স্বরূপ আছে, বাহুল্য ভয়ে আলোচনা করিলাম না। সংক্ষেপে পরে বলিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে রোগের পূর্ব্বরূপ রূপাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকুপিত দোষের প্রকোপ প্রসরাদি অবস্থাবিশেষেরই প্রকাশ মাত্র সুতরাং যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপে প্রকাশিত শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতির সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গতই।

এখন দেখা যা'ক ঐ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্ব রূপে প্রকাশিত অপর কতকগুলি লক্ষণ যুক্তিমূলক কি না। ঋষি বলিতেছেন যাহার যক্ষ্মারোগ হইবে সে ব্যক্তি স্বপ্নে কাক, শুক, সজারু, ময়ুর, শকুনি, বানর প্রভৃতি কর্ত্তৃক বাহিত হইবে অথবা সেগুলি এবং শুষ্ক নদী ও ঝড়, বাতাস, দাবাগ্নিপীড়িত বৃক্ষ সকল দর্শন করিবে, আশ্চর্য্য কথা বটে। ঋষিরই কথা দোষ বৈষম্যে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকুপিত দোষেরই অবস্থা ভেদে আত্মপ্রকাশক ঈষৎ ব্যক্ত লক্ষণসমূহ পূর্ব্বরূপ ভাবে ভাবিব্যাধি প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই ঋষিরই এই আবার কি অদ্ভূত কথা। দেখা যা'ক ঋষির উক্তিতে ইহার কোন মীমাংসা মিলে কি না। ঋষি বলিতেছেন, পশু,পক্ষী প্রভৃতি জীববিশেষে কতকগুলি ধর্ম্ম উৎকট অর্থাৎ প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে। আপনারাও সকলেই জানেন ময়ুরই ষড়জ অর্থাৎ উদারা মুদারা তারার ১ম ধ্বনি করিতে বিশেষ পটু, "ষড়জং ময়ুরা বদন্তি", "ষড়জ-সংবাদিনী কেকা" প্রভৃতি প্রয়োগও পাওয়া যায়; তেমনি কোকিল পঞ্চম ধ্বনিতে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক এরূপ জীব বিশেষে, বিশেষ ধর্ম্মের প্রাবল্য স্বতঃ সিদ্ধ।

ঋষি বলিতেছেন, মানবের জন্মকালীন শুক্র শোণিতের সম্পর্ক সময়ে এবং তৎপরে মাতার আহার বিহার প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে বাত পিত্ত কফের মধ্যে যে দোষের প্রবলতা ঘটে, সেই দোষেরই লক্ষণ সমূহ মানব প্রকৃতিতে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি পুরুষের সংসার।

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ)

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা, পুমাংস-মভ্যেতি ভবান্তরেপি।" সতী স্ত্রী যেমন জন্মজন্মান্তরে সেই একই পুরুষেরই অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবের নিশ্চলা প্রকৃতিও জন্মজন্মান্তরে সেই একই পুরুষেরই অনুগমন করিয়া থাকে। গৃহিণী ব্যতিরেকে যেমন

গৃহপতির গৃহস্থলী পাতান হয় না, তেমনি প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের সংসার করা চলে না। প্রকৃতির জন্যই পুরুষের সংসারে আসা। পুরুষ—প্রকৃতির আকর্ষণে ভোগ-বাসনার তৃপ্তির জন্য সংসার পাতাইয়া বসে, এবং ভোগ বাসনার নিবৃত্তি হইলে সংসার লীলার অবসান করিয়া থাকে। কোন্ অনাদি কাল হইতে প্রকৃতি পুরুষের এই সংসার-লীলা চলিয়া আসিতেছে, তাহা সেই প্রকৃতি পুরুষই জানে। শাস্ত্র বলেন,—"উভাবপ্যনাদি উভাবপ্যনস্তৌ উভাপ্যালিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌচ সর্ব্বগতাবিতি"

যাহা ত্যাগ করিলে সে বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন দগ্ধ করা আগুনের ধর্ম্ম। সেই দগ্ধ করার শক্তিটুকু নষ্ট হইয়া গেলে আগুনের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, আগুন ভস্মে পরিণত হয়। এরূপ প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের প্রাণ। প্রাণ চলিয়া গেলে সবই চলিয়া যায়। মানুষের এত যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য, এ সমস্তই প্রাণের সহিত বাস করে,—প্রাণ চলিয়া গেলে সবই চলিয়া যায়। ধর্ম্মে ও প্রাণে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যাহার প্রাণ আছে, তাহার ধর্ম্মও আছে এবং যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার প্রাণও আছে। দেহে যত দিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহধর্ম্মও রক্ষিত হয় এবং যখনই দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, তখনই দেহধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। ধর্ম্মব্যতিরেকে কোন বস্তুই কখনই অবস্থান করিতে পারে না। এজন্য সকল পদার্থই সর্ব্বদা স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে। এই স্বধর্ম্ম রক্ষা করার প্রবৃত্তির নাম প্রকৃতি। সকলের ধর্ম্ম এক নয়, কাজেই তাহাদের রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিও এক রকমের নয়। সুতরাং সকলের প্রকৃতিও এক রকমের নহে। জলের ধর্ম্ম শৈত্য এবং আগুনের ধর্ম্ম ঔষ্ণ্য,—কাজেই এই ধর্ম্ম দ্বয়ের পার্থক্যবশতঃ উহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম-রক্ষা করার প্রবৃত্তিও পৃথক্। সেজন্য উভয়ের প্রকৃতিও পৃথক্।

জগতের পদার্থ সকলের যেমন সংখ্যা করা যায় না,—তদ্রূপ প্রকৃতিও সংখ্যা করা যায় না। যত পদার্থ তত প্রকৃতি। চেতন একটি পদার্থ এবং অচেতন একটি পদার্থ। উভয়ের ধর্ম্মের পার্থক্য আছে;—সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মরক্ষা করার প্রবৃত্তি অনুসারে প্রকৃতিরও পার্থক্য আছে। যদিও চেতন পদার্থ মাত্রেরই এক চৈতন্যধর্ম্ম এবং অচেতন পদার্থ মাত্রেই এক জড়-ধর্ম্ম—তথাপি উক্ত চেতন বা অচেতন পদার্থনিচয়ের আকৃতি গত বহু পার্থক্য আছে। তদ্রূপ উহাদের প্রকৃতিগতও বহু পার্থক্য আছে। চেতন বলিয়া সকল চেতনেরই একরূপ প্রকৃতি হয় না। মানুষ চেতন পদার্থ, গরুও চেতন পদার্থ, উভয়ের একই চৈতন্য ধর্ম্ম। কিন্তু সেই একই চৈতন্য যখন গো মনুষ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন উহাদের প্রকৃতিও পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। সে জন্য মানুষ যাহাতে তৃপ্তি

(আয়ুর্ব্বেদ সভার গত বৈশাখের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।)

লাভ করে, গরু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করে না। এইরূপ প্রত্যেক চেতন পদার্থমাত্রেই ভিন্ন। মানুষের দেহ রক্তমাংসময় জড়পদার্থ, গরুর দেহও রক্তমাংসময় জড়পদার্থ, উভয়েই জড়পদার্থ, উভয়েতেই এক জড়ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, ত প উভয়ের দেহ ভিন্ন বলিয়া উভয়ের দৈহিক প্রকৃতি ও দেহধর্ম্ম ভিন্ন। কাজেই উভয়ের প্রবৃত্তিও ভিন্ন। সে জন্য গো দেহের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য গরুকে ঘাস খাওয়াইতে হয়। মানুষকে তাহা খাওয়াইতে হয় না। মানুষ দ্বিপদ জীব এবং গরু চতুষ্পদ পশু, অতএব উভয়ের একই রক্তমাংসময় জড় দেহ হইলেও উহাদের দৈহিক প্রবৃত্তি ভিন্ন,—একথা বলিতে পারা যায় না। গরু ও বাঘ উভয়েই চতুষ্পদ চেতন পদার্থ এবং উভয়েরই রক্ত মাংসময় জড় দেহ,—তথাপি উভয়ের প্রকৃতি এক নহে, সম্পূর্ণ বিপরীত। গরু যাহা খাইয়া দেহ রক্ষা করে, বাঘ তাহা খায় না; অধিকন্তু বাঘ গরুকেই খাইয়া দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব চেতন পদার্থ মাত্রেরই এক প্রকৃতি নয় এবং জড় পদার্থ মাত্রেরই এক প্রকৃতি নয়।

জড় ও চেতনের যত আকৃতি আছে প্রকৃতিও তত প্রকারের আছে। অধিকন্তু আকৃতি ব্যতিরেকেও প্রকৃতির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একই মানুষের—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র-ভেদে—প্রকৃতি ভিন্ন। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি শূদ্রের মত নহে এবং শূদ্রের প্রকৃতি ব্রাহ্মণের মত নহে। শুধু তাহাই নহে—একই ব্যক্তির বাল্যে যেরূপ প্রকৃতি থাকে যৌবনে তাহার পরিবর্ত্তন হয় এবং যৌবনের প্রকৃতি বার্দ্ধক্যে থাকে না। দেশ কাল পাত্র কার্য্যাকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা একই প্রকৃতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি অনুসারে প্রবৃত্তিও পৃথক। প্রবৃত্তির অপর নাম রুচি। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" যত লোক তত রুচি, কাজেই সেই সকল রুচির পরিতৃপ্তির উপাদানও পৃথক্। সাধু অসাধুর এক রকম রুচি নহে। নর বানরের এক রকম রুচি নহে। সেজন্য উহাদের জীবনযাত্রার পথও এক রকম নহে। তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বানরাদির জীবদেহে পরীক্ষিত ঔষধ সকল নরদেহে তুল্য কার্য্যকরী বলিয়া কেন যে স্থির সিদ্ধান্ত করেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে যে সকল মানুষের বানরের মত প্রকৃতি অথবা যেখানে নর বানরের প্রকৃতির সামঞ্জস্য আছে তথায় তাদৃশ ঔষধ পথ্য সকল ফলপ্রদ হইতে পারে একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি।

পুরুষ চেতন। প্রকৃতি জড়। তথাপি অবিচ্ছিন্নভাবে চেতন-পুরুষের সঙ্গে বাস-করার জন্য জড়-প্রকৃতিও পুরুষের চৈতন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চেতনের প্রবৃত্তি লাভ করে। যেমন একটী লৌহ-গোলককে তীব্র অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত করিলে উহা স্বাভাবিক শৈত্য ত্যাগ করিয়া অগ্নির ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অচেতন প্রকৃতিও চেতনবৎ কার্য্য করিতে থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত হইলেও উভয়ের সদ্ভাব ও প্রীতির অন্ত নাই। দুই জনে কখনই ছাড়াছাড়ি থাকিতে পারে না,—পৃথক হইলেই মৃত্যু। প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের আনন্দ বিধান করা, একজন্য

প্রকৃতি কতরূপে যে ভাষ্য প্রকাশ করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রকৃতি পুরুষের তৃপ্তির জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ত্যাগ করে, এমন কি সে আর নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রাখিতে চায় না। এই যে প্রকৃতির পুরুষের জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ। এই যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, —ইহার বিনিময়ে পুরুষও প্রকৃতির জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে। পুরুষেরও প্রেমের অন্ত নাই সীমা নাই। পুরুষও প্রকৃতির প্রেমে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া যায়। অমন যে নিত্য সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, স্বতন্ত্র, বশী নিত্যতৃপ্ত পুরুষ,—সেও প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া এমনই হইয়া যায় যে,—সদাই নিজকে নানাবিধ আধিব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া দীন দুঃখীর ন্যায় জন্মজন্মান্তরে প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া কামাতুর মৃগের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারই নাম সংসার।

পুরুষের দুইটী ভোগায়তন আছে: একটী দেহ, অপরটী মন। যদিও ইহারা দুইটী পৃথক পদার্থ, তথাপি ইহারা প্রকৃতিপুরুষের ন্যায় অভেদে বাস করে। পরস্পরের সদ্ভাবও বড় বেশী। একজন মন ভাল থাকিলে দেহ ভাল থাকে এবং দেহ ভাল হইলে মনও ভাল হয়। কখনও যে ইহাদের কলহ হয় না, একথা বলা যায় না। তবে সাধারণতঃ একের ভালমন্দে অপরেরও ভালমন্দ প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যত পদার্থ তত প্রকৃতি। মনের যেমন সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি আছে, দেহেরও তেমনই বাতপিত্তকফময়ী প্রকৃতি আছে। মনের প্রকৃতির কর্ম্ম সদাই মনকে সন্তুষ্ট রাখা এবং দেহের প্রকৃতির কর্ম্ম সদাই দেহকে সন্তুষ্ট রাখা। সকলেরই স্বভাবে সুখ, আনন্দ ও স্থিতি এবং স্বভাবের বৈপরীত্যে দুঃখ, বিষাদ ও মৃত্যু। এজন্ত মানসী ও শারীরী প্রকৃতি সর্ব্বদা স্বভাবে থাকিয়া দেহ মনকে প্রকৃতিস্থ বা স্বস্থ রাখিতে চেষ্টা করে। জীবের দেহ অন্নময়। অন্নের অভাবে দেহ বাঁচে না। এ জন্ত দেহের কোন অভাব উপস্থিত হইলে অন্নের দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়। দেহের মধ্যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও মল আছে। এ সকলই এক অন্ন বা খাদ্য পদার্থের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। দেহের বা মনের যাহা যাহা উপাদান, দেহ-পোষক অন্নেরও সেই সেই উপাদান আছে। এ জন্ত মানুষ যে সকল পদার্থ ভোজন করে,—সেই সকল পদার্থের রসই রক্তরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীরের যাবতীয় ধাতুকে পোষণ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। এজন্ত ভুক্ত পদার্থের প্রকৃতির অনুসারে রসের প্রকৃতি হয়, রসের প্রকৃতি অনুসারে রক্তের এবং অন্যান্য ধাতু সকলের ও মনের প্রকৃতি হয়। দেহ যেমন কেবল স্থূল পদার্থ, মন সেরূপ নয়; মন সূক্ষ্ম পদার্থ। স্থূলের দ্বারা যেমন স্থূলের গ্রহণ হয় তেমনই সূক্ষ্মের দ্বারা সূক্ষ্মের উপলব্ধি হয়। এই দেহ ও মনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কতকগুলি ভৃত্য আছে। তাহারা সর্ব্বদা মনের অধীনে থাকিয়া পুরুষের অভিমত কর্ম্ম সম্পাদন করে। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—শারীর এবং মানস।

শারীর কর্ম্ম—গমন, ভোজন ইত্যাদি এবং মানস কর্ম্ম সঙ্কল্প, বিকল্প ইত্যাদি। শারীরিক

কর্ম্মের ভৃত্যগণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মানসিক কর্ম্মের ভৃত্যগণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে;—এই সকল ভৃত্যই মনের দ্বারা চালিত হয়। মনের মালিক জ্ঞান, জ্ঞানের মালিক জীবাত্মা বা পুরুষ। পুরুষের ইচ্ছা জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়, জ্ঞান তাহা মনকে আদেশ করে, মন ইন্দ্রিয়গণকে আদেশ করে, ইন্দ্রিয়গণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে। এই জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ লইয়া প্রকৃতি পুরুষের সংসার।

জীবাত্মা একজন ঘোর সংসারী পুরুষ। প্রকৃতি তাহার গৃহিণী। দেহ তাহাদের গৃহ। এই গৃহের যেখানে যেটার আবশ্যক এবং এই গৃহ মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের যখন যাহা আবশ্যক,—সে সমস্তই অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ সদাই ব্যস্ত। ইহা ছাড়া তাহাদের ধর্ম্মই যেন নাই। এজন্য দেহে যখনই যে পদার্থের দরকার হয়, প্রকৃতি তখনই সেই জিনিস চাহিয়া লয়। দেহে জল, আগুন, হাওয়া আছে। এ জন্য জলের দরকার হইলে পিপাসা আসিয়া জল চায়, শরীরের উত্তাপ কমিয়া গেলে গরম ঔষধ পথ্য চায় এবং হাওয়ার আবশ্যক হইলে উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া নিশ্বাস লইয়া বাঁচে। মনের মধ্যে প্রকৃতির সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী তিনটী সন্ততি বাস করে এবং দেহের মধ্যেও বায়ু পিত্ত কফ নামক তিনটী বিরুদ্ধস্বভাব সন্তান বাস করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ইহারা যদি পরস্পরে সদ্ভাবে বাস করে তাহা হইলে সংসারে কতই সুখ, কতই আনন্দ। কিন্তু ইহারা মনের অধীন বাস করে বলিয়া বড়ই অসংযত। সকলেই বড় হইতে চায় এবং একজন অপরকে ধ্বংস করিতে চায়। এজন্য ইহাদিগকেও বড় দোষ দিতে পারা যায় না। কেন না, মন যখন লোভ পরবশ হইয়া মিথ্যা আহার বিহার করিতে থাকে, তখনই সেই মিথ্যা আহার বিহারের জন্য উহাদেরও প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে, এজন্য ইহারা প্রবল বা কুপিত হইয়া দেহরূপ সংসারে বড়ই বিরোধ উপস্থিত করে। সেই বিরোধ যখন মনকে আশ্রয় করে, তখন পুরুষের আধি এবং যখন দেহকে আশ্রয় করে তখন ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এবং বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ বা প্রাবল্য যাহাতে না উপস্থিত হয়, তাহার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ সর্ব্বদা চেষ্টা করে। ইহাদের পরম প্রিয় শান্ত দান্ত ও বিচারশীল সন্তান-জ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানের উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। জ্ঞানও সর্ব্বদা প্রকৃতি পুরুষের অনুকূল বিষয়ে মনকে প্রবৃত্ত ও অননুকূল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে। এইরূপে যতদিন মন জ্ঞানের অধীনে থাকে এবং মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গণ থাকে, ততদিন আর দেহ আধিব্যাধির মুখ দেখিতে পায় না, দেহ মন তখন পরম আনন্দ-নিকেতন। বাহ্য জগতে যেমন ঝড় বৃষ্টি বা অগ্নির প্রাবল্য অথবা প্রকোপ উপস্থিত হইলে নানাবিধ উপপ্লবের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ বা মনে বাতাদি দোষত্রয়ের অথবা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকোপ বা প্রাবল্য উপস্থিত হইলে দৈহিক বা মানসিক প্রকৃতিরও বিকৃতি উপস্থিত হয়। সন্তানের সুখ দুঃখেই জননীর সুখ দুঃখ। এজন্য বাতাদি সন্তান-

গণের যখনই কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তখনই প্রকৃতি উহা জানিতে পারে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য পুরুষকে নিবেদন করে। পুরুষও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের জন্য জ্ঞানকে আদেশ করে। জ্ঞানও আবার মনকে তাহার প্রতীকারে নিযুক্ত করে, মনও ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রিয়গণ বড়ই কার্য্যতৎপর, বিশেষতঃ মন যখন তাহাদের সহায় হয়। কাজেই মনের আদেশে ইন্দ্রিয়গণ তখনই তৎকর্ম্ম সাধন করিয়া পুরুষের জ্ঞান মন ও দেহের সকল কার্য্যের সমাধান করিয়া নিজেরাও ধন্য হয়। এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের পরস্পর সদ্ভাব ও নিয়মানুবর্ত্তিতা,—ইহাই পুরুষের স্বাস্থ্য,—প্রকৃতি ইহাতেই সন্তুষ্ট। পুরুষের মনের মত এমন সর্ব্ব-কর্ম্ম-সাধনক্ষম ভৃত্য আর কেহ নাই। কিন্তু সকল গুণের গুণী হইলেও উহার স্বভাব বড় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল। মন সদাই বিপথে চলিয়া একটা না একটা অনিষ্ট ডাকিয়া আনিতে চায়। এজন্য পুরুষ মনকে একলা ছাড়িয়া দিতে পারে না,—জ্ঞানকে তাহার রক্ষক ও চালক নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। জ্ঞান সর্ব্বদাই মনকে লইয়া ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানের কর্ম্মক্ষেত্র এই দেহও সংসার। জ্ঞান এই পুরুষের আদেশে এই দেহ ও সংসার হইতে অভিমত ভোগ্য বস্তু সকলের রসাস্বাদ ও নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করে। মনও জ্ঞানের অধীন থাকিয়া কি করিয়া দেহ সুস্থ থাকিবে এবং কি করিয়া দেহ নীরোগ, বলবান ও সৌন্দর্য্যময় হইবে এবং কি করিয়া সংসারের সর্ব্ব প্রকার বিষয়রসপান করিয়া পুরুষের সংসারাসক্তির পরিতৃপ্তি করিবে,—এই চিন্তা লইয়া সদা ব্যস্ত থাকে।

যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মবশে মোহগ্রস্ত না হয়, ততদিনই এই জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রকৃতিকে লইয়া পুরুষের সংসার। আর যখনই পুরুষ—ফলোন্মুখ-প্রাক্তন-কর্ম্মবশে মোহগ্রস্ত হয়, তখনই তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে, অজ্ঞান আসিয়া জ্ঞানকে আশ্রয় করে। তখন সত্য-মিথ্যা, হিতাহিত মেধ্যামেধ্য, পথ্যাপথ্য ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মন আর জ্ঞানের শাসন মানে না। একেত মনের বহির্মুখ-বৃত্তিতা বড়ই প্রবল, তাহাতে আবার জ্ঞানের শাসন নাই, কাজেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া মন একেবারে বিষয় সুখে মজিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিছুতেই আর ঘরে ফিরিতে চাহে না ;—কাজেই প্রকৃতি পুরুষের আর দুঃখের অন্ত থাকে না। বুদ্ধির অপর নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাপরাধই সকল অনিষ্টের মূল। সংসারে যত প্রকার আধি ব্যাধি আছে, সে সকলেরই মূল একমাত্র প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধেই মানুষের সত্য মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়—, মানুষ সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করে। ইহাই জীবের বিনাশ কাল,—এজন্য লোকে বলে "বিনাশ-কালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ।"

জগতে ভালমন্দ, সত্য মিথ্যা, হিত অহিত, পথ্য অপথ্য, শত্রু মিত্র, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ বলিয়া প্রকৃত দ্বৈত বস্তু কিছুই নাই। যে বস্তু ভাল তাহাই মন্দ, যাহা সত্য তাহাই

মিথ্যা, যাহা হিত তাহাই অহিত, যে শত্রু সেই মিত্র, এবং যাহা সুখ তাহাই দুঃখ। দেশ কাল পাত্র ও প্রয়োজন অপ্রয়োজনাদির অবস্থা ভেদেই এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ হইয়া থাকে। যে অর্থের জন্য মানুষ সারাটা জীবন খাটিয়া মরে, যাহার বিদ্যমানতাই তাহার সকল সুখের নিদান,—সেই অর্থই বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে যত অনিষ্টের, যত দুঃখের মূল হইয়া থাকে। যে স্ত্রীকে দেখিলেই যুবকের আনন্দ, সেই স্ত্রীই যখন অক্ষম স্বামীর সমক্ষে দুষ্টের কবলিত হয়, তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। যে ভোজ্য বস্তু সকল দেখিয়াই ক্ষুধার্তের আনন্দ, সেই সেই ভোজ্য বস্তুর দর্শনই আবার সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির পরিতৃপ্তির পর বিবমিষার কারণ হইয়া থাকে। শিশিরে যে শীত-বাধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ কত না শাল দোশালা গায়ে দেয়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সেই শীতের জন্য আবার সেই মানুষই লালায়িত হইয়া কত না অর্থ ব্যয় করিয়া দার্জ্জিলিং সিমলা ঘুরিয়া বেড়ায়। চিকিৎসক যে শৈত্যক্রিয়াকেই পিত্তশান্তির পরমৌষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—সেই শৈত্যক্রিয়াকেই আবার শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির প্রাণহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা একজনের পক্ষে বিষ, তাহাই অপরের পক্ষে অমৃত অথবা একই মানুষের পক্ষে একদিন যাহা ত্যাজ্য ছিল,আর একদিন তাহাই সেই মানুষের পক্ষে পরম গ্রাহ্য। যখন যাহা দ্বারা জীবের অভিমত সিদ্ধি ঘটে, তখনই তাহা তাহার পক্ষে গ্রাহ্য; তদিতর পদার্থ অগ্রাহ্য। বাস্তব পক্ষে কোন বস্তুই একান্ত হিতকর অথবা একান্ত অহিতকর নহে। যাহা দ্বারা প্রকৃতির দুঃখ উৎপন্ন হয়, পুরুষের আনন্দময়-স্বরূপতার হানি ঘটে, তাহাই ত্যাজ্য, তাহাই অপ্রিয় ও তাহাই অসাধ্য। একই পদার্থে হিতাহিতত্ব সাধ্যাসাধ্যত্ব অবস্থান করে। পুরুষের প্রজ্ঞাই তাহার বিচার করিয়া দ্রব্যান্তর সংযোগে অথবা সংস্কার দ্বারা কিংবা মাত্রা বা কালাদি দ্বারা প্রকৃতির অনুকূল করিয়া দেয়। একই তাম্রে বমনকারকতা ও বমননিবৃত্তির শক্তি আছে। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষই তাহা প্রকৃতির প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেখা যায়, জগতে যাবতীয় পদার্থই যুগপৎ সুখদুঃখময় এবং আধি-ব্যাধির উৎপাদক ও প্রশমক। কেবল গ্রহণ কর্ত্তার প্রকৃতির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার অনুরোধে পদার্থ সকলের গুণ দোষের বিচার হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে প্রজ্ঞার দ্বারা এই বিচারকার্য্য অহোরহঃ করিতেছে এবং যখনই নিজের বিচার বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ আপ্ত জনের আদেশ গ্রহণ করিতেছে। প্রজ্ঞাই প্রকৃত মানুষের পরম হিতৈষিণী। ইহার কোন অপরাধ হইলে প্রকৃতির সংসারে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ভোগী পুরুষ যেমন সস্ত্রীক রথারোহণ করিয়া সংসারে অভিমত প্রদেশে বিচরণ করে, তদ্রূপ প্রকৃতি এবং পুরুষও এই দেহ রথে আরোহণ করিয়া ভোগ-কামনার নিবৃত্তির জন্য অভিমত প্রদেশে রথচালনা করে ও অনভিমত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এই দেহ রথের ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা

ইহারই সারথি এবং মন ঐ ইন্দ্রিয়গণের মুখ সংযুক্ত রশ্মি বা লাগাম। সংসারী পুরুষের ভোগ-তৃপ্তির জন্যই সংসারে আসা। এজন্য সংসারী জীব কেবল ভোগের ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়। জগতে ভোগের বস্তু তো আর অভাব নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় একান্ত সুখময় বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই,—যাহা আজ সুখ দেয়, তাহাই আবার কালে বড় দুঃখের মূল। এজন্য প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-সাধক মনকে সদাই প্রজ্ঞার দিকে নজর রাখিয়া জ্ঞানের আদেশে চলিতে হয়। জগতে সাধু অসাধুর একইরূপ, আর মনের নাই বিচার-শক্তি। এজন্য মনকে সর্ব্বদা জ্ঞানের নিকট বিধিনিষেধের আদেশ লইয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ মাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে। সকলেই সকল বিষয় জানে না। কাজেই বুদ্ধিমান পুরুষকে কল্যাণের জন্য পদে পদে জ্ঞানীর নিকট শরণ লইতে হয়, রুগ্নকে চিকিৎসকের শরণ লইতে হয়। তাঁহারা বিধিনিষেধের দ্বারা চলিবার উপদেশ দেন। তাহা যাহারা মানিয়া চলে, তাহাদেরই সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়। এবং যাহারা না মানিয়া স্বৈরাচারী হয় তাহাদের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বিধিনিষেধেই সংযম আসে, সংযমেই জীবন অসংযমেই মৃত্যু।

প্রকৃতি পুরুষের সংসারে যত অনিষ্টের মূল উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত অসংযত পুত্র যেমন সর্ব্বদা মাতা পিতার ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ অসংযত বিধি নিষেধরূপ শাসনের বহির্ভূত মনই একমাত্র দেহে সকল আধি ব্যাধিকে ডাকিয়া আনে। এই অশান্ত মনের জন্য প্রকৃতি পুরুষ ও জ্ঞান সদাই সন্ত্রস্ত। ভয়, মন কখন কি করিয়া বসে। মনের দৃষ্টি সর্ব্বদা বাহিরের দিকে। তাহাতে যে তাঁহার মরণ হয়, সে তাহা বুঝে না। আপাত সুখ হইলেই সে সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে যাহা হইবে হউক, তাহাতে তাহার কোন ভাবনা নাই। কেন না, সে ভোগ তো আর সে ভুগিবে না, ভুগিবে কর্ত্তা গিন্নী, প্রকৃতি ও পুরুষ। মনের বিধিনিষেধ জ্ঞান নাই—কাজেই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, আপনাপর কোন বিচারই নাই। এজন্য প্রকৃতিকে সর্ব্বদা জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া মনের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মন যখন বাহ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিষময় ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতি তখন চক্ষুতে আসিয়া সংশয় উৎপাদন করে। বলে, ইহার রূপ আমার অভিমত নহে, ইহাকে ত্যাগ কর। মন যদি তাহা না শুনিয়া মুখের কাছে লইয়া আসে, প্রকৃতি ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তাহাতেও যদি মন নিবৃত্ত না হইয়া মুখে পুরিয়া ফেলে, তখন রসনাত্মিকা প্রকৃতি বড়ই বিরক্ত হয়, বিবমিষা আসিয়া কণ্ঠরোধ করে এবং যদি কোন প্রকারে উহা উদরস্থ হয় তো বমি করিয়া তাহা দেহ হইতে দূর করিয়া দেয়। যদি প্রকৃতি বমন বিরেচন দ্বারা উক্ত বিষময় পদার্থকে দেহ হইতে বিতাড়ন করিতে না পারে এবং উহা রস রূপে পরিণত হয়,—তাহা হইলে প্রকৃতি সেই বিষের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য রসের বিকার ঘটাইয়া রসবিকৃতির জন্য ব্যাধির উৎপত্তি করে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করে। চিকিৎসক তখন প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া রোগের ব্যবস্থা

করিয়া দেন। তাহাতে সেই সেই রোগের সহিত বিষের সকল বিকারের বিনাশ ঘটে। যদি রসে গিয়া বিষের প্রতীকার না হয়,—তাহা হইলে প্রকৃতি অন্যান্য ধাতু সকলের সাহায্যে তাহাকে দেহের এক স্থানে গণ্ডী দিয়া আবদ্ধ করিয়া রোগরূপে আবির্ভাব করে। তখন তাহাকে ধ্বংস করিবার সুবিধা হয়। প্রকৃতির এই ব্যবস্থার নাম রোগ। প্রকৃতি নিজেই দেহের চিকিৎসা করে, সেজন্ত সন্তঃপ্রাণহর ব্যাধি ব্যতিরেকে সকল ব্যাধিকে দেখিয়াই অভিজ্ঞ বৈদ্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করেন না। মূর্ত্তি দেখিয়াই শক্রমিত্র চেনা বড়ই কঠিন। শক্রও কখন পরম মিত্রের কাজ করে। বাত-পিত্ত-কফ যখন প্রবল অথবা প্রকুপিত হইয়া দেহকে দুঃখিত করিতে থাকে, অথচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না, তখন জ্ঞানী ব্যক্তির বড়ই চিন্তার বিষয় হয়। অজ্ঞানী তখন ভাবে, কোন রোগ তো হয় নাই, তবে আর উহার জন্ত ভাবিয়া ফল কি? কুপিত বাতাদি দোষকে প্রকৃতি যখন কোন স্থান-বিশেষ বা ভাব-বিশেষে ব্যাধিরূপে ধরিয়া আনিয়া দেয়, তখন জ্ঞানী-ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়েন। ভাবেন এইবার ইহার একটা প্রতিকার করা যাইবে, প্রকৃতি তাহারাই ব্যবস্থা করিয়াছে। অজ্ঞানী তখন বিপরীত বুঝে। সে ভাবে রোগ যখন হইয়াছে, তখন সেই রোগেই হয় তো তাহার মৃত্যু হইবে। রোগই যে আরোগ্যের মূর্ত্তি একথা নির্ব্বোধ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। প্রকৃতিই দেহকে নীরোগ করিবার জন্য রোগ রূপে সকল প্রাণিকে দুঃখ করিয়া দেয়। এ জন্য আমাতিসারে স্তম্ভন, রক্তপিত্ত অথবা রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় রক্তরোধ, জ্বরের প্রথমাবস্থায় কষায়-পান, তরুণ জ্বরে মুখ্য ভেষজ দিয়া জ্বর বন্ধ করিয়া দিলে বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতির প্রবৃত্তি মাত্রেই বাধা দিবে না। দেহকে নীরোগ রাখিবার জন্যই মল মূত্রাদির বেগ আসে, সে বেগের রোধ করিলে অশেষবিধ ব্যাধি আসিয়া শরীরকে দুঃখিত করে। গর্ভ কালে গর্ভস্থ শিশুর অভিলাষ সকল জননীর দোহদরূপে প্রকটিত হয়। দোহদের অব-মাননায় সন্তানের বিকৃতি ঘটে। এজন্ত গর্ভিণী যদি গর্ভের অপকারক কোন দ্রব্যে অভিলাষ করে, তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিয়া হিত সংযোগে প্রয়োগ করিবে, তথাপি প্রকৃতির অবমাননা করিবে না। প্রকৃতি সর্ব্বকল্যাণময়ী। জীবকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্ত তাহাকে বিকৃতির সহিত লড়াই করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতি দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগকে সামলাইতে পারে না। তখন সেই দুর্ব্বলা প্রকৃতি বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করে। যিনি প্রাণাভিসর বৈদ্য, তিনিই সেই প্রকৃতির কি যে অভাব তাহা বুঝিতে পারেন এবং রোগীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতির প্রার্থনানুকূল ঔষধ ও পথ্য দিয়া থাকেন। প্রকৃতি তাহাতে বললাভ করিয়া কৃতার্থ হয়,—রোগী আরোগ্য লাভ করে। যাহার প্রকৃতি আরোগ্যের জন্ত কামনা করে না, সেজন্ত যে কোন ঔষধ বা পথ্য দেওয়া হউক না কেন, তাহাতেই যদি সে বিরক্ত হয়, তবেই বুঝিতে হইবে প্রকৃতি আর সে

মেহে সংসার করিতে চাহিতেছে,না এবং দেখা যায় প্রকৃতি পুরুষকে লইয়া অচিরে সেই রুগ্ন ভগ্ন দেহাবাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবারই ব্যবস্থা করিতেছে। প্রকৃতি যদি আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করে, তাহা হইলে কাহারও ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে। প্রকৃতির এই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, ইহা করুণাময় জগদীশ্বরের দান। এই দান হইতে জগতের কোন পদার্থ ই বঞ্চিত নহে। সুতরাং জগতে ভগবৎকৃপায় কোন জীবেরই মৃত্যু নাই। সত্যই তাই, জ্ঞানীর চক্ষে মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিলেই পূর্ব্বাবস্থার মৃত্যু হইয়া থাকে। একই শিশু যৌবন দশায় উপনীত হইলে তাহার শিশুত্বের আকৃতি প্রকৃতি সকলেরই মৃত্যু হয়। তবে একই পুরুষে সেই শৈশব যৌবন জরার অনুভূত বিষয়ের স্মৃতিসকল অবস্থান করে বলিয়া আমরা তাহাকে মৃত্যু বলি না। যদি মরণের পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলে পৌর্ব্বদেহিক স্মৃতি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই মৃত্যুকে স্বীকার করিতাম না। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষ বা জীব অমর। কেবল মরণশীল প্রকৃতির বশে পড়িয়া তাহার যত মরণ। জগতে যত তুল্য ধর্ম্মাধর্ম্মেরই একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে তাহার বৈপরীত্য ও বড় বৈচিত্র দেখা যায়। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি জড়, দুইটাই বড় বিরুদ্ধভাব-সম্পন্ন, তথাপি এই জড়ে ও চেতনে, নিত্যে ও অনিত্যে, সত্যে ও মিথ্যায়, জলে ও আগুনে কি এক অপূর্ব্ব রমণীয় ভগবৎ—মূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ধন্য ভগবান্! ধন্য তাঁহার লীলা। ধন্য তাঁহার সৃষ্টি! তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বশক্তি-শূন্য। তাই সৃষ্টির জন্য পদে পদে প্রকৃতির পদে লুটাইতে থাকেন। প্রকৃতিকে লইয়াই তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। আর প্রকৃতিও তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে;—তাহার যুগ যুগান্তরের জন্ম জন্মান্তরের সাধ মিটাইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের দুইজনকে লইয়াই বিশ্বের সৃষ্টি। যদি জগতে কেবল পুরুষ থাকিত,—তাহা হইলে সৃষ্টি অসম্ভব হইত অথবা কেবল প্রকৃতি থাকিলেও সৃষ্টি অসম্ভব হইত। সেই মহাপুরুষের তৃপ্তি ও প্রীতির জন্যই প্রকৃতির এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য। গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, বিদ্যুৎ, পবন, জল, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, তরু, লতা, বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল, দেব,সিদ্ধ,গন্ধর্ব্ব, নর, বানর, সিংহ ব্যাঘ্র, কীট, পতঙ্গ, জীবাণু এসকলই সেই মহাপুরুষের প্রকৃতির সন্তান। ইহারা সকলেই সেই পুরুষ প্রবরের কার্য্য করিবার জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও তাহারই আদেশে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্রূপ—এই দেহ, মন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, লজ্জা, মান, অপমান, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ রোগ, শোক, যৌবন, জরা, আরোগ্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, রস, রক্ত, মাংস মজ্জা, হস্ত, পদ, সত্ব, রজঃ, তমঃ, বায়ু, পিত্ত, কফ, এসকলই একটি পুরুষের অধিকৃত সন্তান। ইহারাও পুরুষের আদেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এই সংসারে পুরুষেরই

কার্য্য সাধন করিতেছে। ইহাদের দ্বারাই পুরুষ আপনার জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতির যাবতীর কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লয়। পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত এই দেহে বাস করিতে চায়, ততদিন ইহাদেরও আর বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও বা কখন কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার সমাধান করিয়া লয়। প্রকৃতির একমাত্র চেষ্টা পুরুষের তুষ্টি ও পুষ্টির বিধান করা।

যদিও পুরুষের জন্যই প্রকৃতির যাহা কিছু চেষ্টা, পুরুষের তৃপ্তিতেই তাহার তৃপ্তি; তথাপি সে একেবারে নিজের স্বভাবকে ত্যাগ করিতে পারে না। মেয়ে মানুষের যেমন স্বভাব, প্রকৃতিরও তাহাই। সে থাকিয়া থাকিয়া পুরুষের চেয়ে বড় হইতে চায়, মা কালীর মত ন্যাংটা হইয়া স্বামীর বুকে পা দিয়া নাচিতে চায়। সেজন্য পুরুষ সর্ব্বদা প্রকৃতিকে নিজের অধীনে রাখিয়া সংসারে সকল কার্য্যই করাইয়া লয়। যে প্রকৃতি পুরুষের আদেশ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করে না, সেই প্রকৃতিই সতী। আর যে প্রকৃতি পুরুষকে অতিক্রম করিয়া স্বৈরচারিণী হয়, সে অসতী। একই পদার্থে প্রকৃতি ও কর্ম্মভেদে নাম-ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষের একই প্রকৃতি ক্রিয়ার পন্থানুসারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটী আখ্যা রূপে কল্পিত হয়। নিবৃত্তির সন্তানজ্ঞান ও তদধীন বৃত্তিসমূহ এবং প্রকৃতির সন্তান মন ও তদধীন বৃত্তিসমূহ। একই দেহে জ্ঞান ও মন বাস করে। দেহে যখন জ্ঞানের রাজত্ব থাকে, তখন পুরুষের নিত্য স্বাস্থ্য, নিত্য আনন্দ, স্বর্গরাজত্ব, দেবতার সংসার। আর দেহে যখন মনের রাজত্ব হয়, তখন পুরুষের অনিত্য সুখ অনিত্য স্বাস্থ্য ও অনিত্য আনন্দ, দেহ নরক পুরী, দানবের লীলাক্ষেত্র। দিতি ও অদিতির স্বামী কশ্যপের দৈত্য ও দেবতা নামে যেমন দুইটী সন্তান, তদ্রূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধিপতি পুরুষের মন ও জ্ঞান নামে দুইটী সন্তান। উহাদের প্রকৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ। সেজন্য দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় উহাদের বিরোধ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ এই দেহে নিবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহে বা মনে কোন প্রকার দুঃখের সংস্পর্শ ঘটে না এবং যখনই পুরুষ প্রবৃত্তির বশে মনের উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখনই তাহার নানাবিধ আধি ব্যাধি আসিয়া তাহাকে বিকল করিয়া দেয় ও মরণের পথে টানিয়া লইয়া যায়। এজন্য পুরুষকে সর্ব্বদা সাধু, গুরু ও সদ্বৈদ্যের আশ্রয় লইয়া চলিতে হয়। তাঁহারা তৎকালে পুরুষের দেহ ও মনের অবস্থা বিচার করিয়া সদ্বৃত্তি ও সদাচারের উপদেশ দানে অনুগৃহীত করেন; পুরুষও তাহাদের আদেশানুসারে বিধি-নিষেধ আনিয়া দেহকে দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করে। ইহার নাম স্বাস্থ্যরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষা, ইহারই নাম প্রকৃত দেহ ও মনের চিকিৎসা। এই চিকিৎসাতেই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। ইহা কোন দেশের কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শত্রু, মিত্র, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ বলিয়া পৃথক্ পদার্থ কিছুই নাই,

একই পদার্থ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে। পুরুষের যে প্রকৃতি তাহার সর্ব্বকল্যাণদায়িনী, সেই প্রকৃতিই আবার তাহার সর্ব্বনাশিনী হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত মনে সত্ত্বরজ ও তমের সমতা থাকে, ততদিন আর মনের কোন বিকার নাই এবং যেই সত্ত্বরজস্তমের বৈষম্য উপস্থিত হয়, অমনি মনেরও বিকার উপস্থিত হয়। তদ্রূপ এই দেহে যত দিন বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা থাকে, ততদিন আর দেহে কোন রোগ থাকে না। এই বায়ু পিত্ত কফই দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু। এই ধাতুভূত বায়ু পিত্ত কফ যখন বিকৃত হইয়া দেহকে দূষিত করে, তখন ইহারাই দোষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সুতরাং বাত পিত্ত কফ দ্বারাই দেহ রক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং বাত পিত্ত কফ দ্বারাই শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে বাত পিত্ত কফ ভুক্ত পদার্থের সাত্ম্যরস দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে,—সেই বাত পিত্ত কফই জীবের ভুক্ত পদার্থের অসাত্ম্য রস হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আহার্য্য পদার্থের রসের দ্বারাই জীবের জীবন ও মৃত্যু। কোন্ কোন্ পদার্থের রস কতটুকু মাত্রায় জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজন তাহা জীবের প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহার আহার বিহার সকলই তাহাকে মরণের হাত হইতে রক্ষা করে। এবং যাহার প্রকৃতি বা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহার আহার বিহার সকলই তাহাকে মরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এজন্য অজ্ঞানীর আধি ব্যাধি ছাড়া কিছু নাই ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

জীব-প্রকৃতি যেমন জীবন রক্ষার জন্য অভিমত ভোজ্যাদির কামনা করে, তদ্রূপ দেহ প্রকৃতিও বিকৃত এবং বিষম বাতাদি দোষ শান্তির নিমিত্ত তাৎকালিক অভিমত পদার্থ ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রকৃতি অজ্ঞ ও অন্ধ, সে জন্য সে কোন জিনিষ কতটুকু মাত্রায় তৎকালে আবশ্যক তাহা স্থির করিতে পারে না। এজন্য জ্ঞানকে প্রকৃতির সাহায্য করিতে হয়। কিন্তু সকলের সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এ জন্য ব্যক্তি তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। তিনি তাহাকে তদ্বিষয়ে জ্ঞান দিয়া সাহায্য করেন। সেই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের এত সম্মান এত সমাদর।

মূক ব্যক্তি যেমন শূলরোগাক্রান্ত হইলে কেবল ছটফট করিয়া আভ্যন্তর যন্ত্রণার প্রকাশ করিয়া থাকে, মুখে কিছু বলিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতিও কতকগুলি দৈহিক ভাবের ব্যতিক্রম ও বৈপরিত্য ঘটাইয়া নিজের অবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে, মুখে কিছু বলিতে পারে না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেই সকল অবস্থা বিশেষ ভাবেপর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতির আরোগ্য কার্য্যের সহায়তা করে।

জীবদেহে যেমন বাত-পিত্ত-কফময়ী প্রকৃতি আছে, তেমনই বহির্জগতেও বাত পিত্ত কফময়ী প্রকৃতি আছে। বহির্জগতে বাত পিত্ত কফময় মহাস্রোতঃশীলসাগরে জীবসমূহ ডুবিতেছে ভাসিতেছে ও ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। যেমন জলস্থিত মৎস্যাদি জলে বাস করে, তদ্রূপ মৎস্য যেরূপ জলশূন্য হইলে সে আর বাঁচে না, তদ্রূপ, জীবসমূহও বহির্জাগতিক বাতপিত্তকফময়ী প্রকৃতির কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে মরিয়া যায়। জীবের দৈহিক প্রকৃতি যেমন দেহকে কুশলে রাখিবার জন্য যখন যে দ্রব্যটীর আবশ্যক তখনই সেই দ্রব্যটী তাহাকে দিয়া কৃতার্থ করে, তদ্রূপ বাহ্য প্রকৃতিও জীবসমূহের কল্যাণের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি ঋতু সকলকে আনিয়া দেয় এবং ঋতু সকলও বাহ্য প্রকৃতির আক্রমণ জন্য দৈহিক বিকার প্রশমনের নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিয়া জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। এ জন্য গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রবাধা নিবৃত্তির জন্য কচি তালশাঁস ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফল, সকল শরতের প্রখর পিত্তের প্রশমনের জন্য নদীকূপ তড়াগাদির সুশীতল জলরাশি, কুমুদ কহ্লার নীলোৎপলাদি পুষ্পসমূহ, সুধাধবল চন্দ্রকিরণ এবং বসন্তে বসন্তের প্রকোপ নিবৃত্তির জন্য কচি কচি নিমপাতা, পল্তা, পটোল প্রভৃতি,—জীবের কল্যাণের নিমিত্ত বাহ্য প্রকৃতির দান। এই বাহ্য প্রকৃতির নাম জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী ও লোকমাতা এবং যাঁহার আদেশে সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কল্যাণের জন্য সংসার সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার নাম জগৎপিতা, জগদ্ধাতা, জগদীশ্বর। আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান। আমাদিগকে লইয়াই প্রকৃতি পুরুষের সংসার। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই জগন্মাতা ও জগৎপিতার চরণ-কমলে ভূয়ো ভূয়ো প্রণাম করিতেছি। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ স্বস্তি! ওঁ শ্রীহরিঃ!

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে জাগতিক সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসার মূল ভিত্তি, সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয়, অশ্বিনী কুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র যখন এই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন, তখন মর্ত্ত্যলোকে রোগ-রাক্ষস দিগের উপদ্রবে অস্থির হইয়া ভরদ্বাজ প্রমুখ ত্রিকালদর্শী ঋষিবৃন্দ এই পরম লোক হিতকর চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যভূমিতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে আমরা আরও অবগত হই,—অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট হইতে একদিকে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ ধন্বন্তরিও সেই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। সেই ধন্বন্তরিই বারাণসীধামে

দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মহর্ষী সুশ্রুত প্রভৃতি অনেকগুলি সর্ব্বত্যাগী আর্য্য ঋষিকে শিক্ষাদান করিয়া মর্ত্তাধামে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ প্রচার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষি বৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে চিকিৎসার যে সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ নহে, কারণ তাহা কায়চিকিৎসাপ্রধান, চরক তাহারই ফলে আবিষ্কৃত হইল। মহর্ষি সুশ্রুত তাঁহার অধীত চিকিৎসা-বিদ্যাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে যে সংহিতাখানি প্রণয়ন করিলেন, তাহার নাম হইল সুশ্রুত সংহিতা। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষালাভ করিতে হইলে এই সংহিতা খানিই আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য উহার শিক্ষালাভ করিলেন। চরকের শিক্ষায় যাঁহারা কৃতবিদ্য হইলেন, শস্ত্রকর্ম্মে তাঁহারা কৃতিত্ব না দেখাইলেও মহর্ষি সুশ্রুতের শিষ্য প্রশিষ্যেরা কিন্তু শস্ত্র সাধ্য কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া জগদ্বাসীকে বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া তুলিলেন। এক কথায় সে সময় ঋষিবৃন্দের চেষ্টায় শুধু মনুষ্য চিকিৎসা নহে, গবায়ুর্ব্বেদ, হস্তী আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানারূপ চিকিৎসারই চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল।

রোগ-রাক্ষসগণ প্রাণী-জগতে নানা মূর্ত্তিতে উপদ্রব আরম্ভ করিলেও জগদ্বাসী মাত্রেই দেখিল, রোগ-রাক্ষসগণ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সহিত দমিয়া যাইতেছে, জর অতিসার প্রভৃতি নানারূপ আধি ব্যাধিতে বিশ্বসংসার যতই বিপর্য্যস্ত হউক, আর্য্য ঋষির ঐকান্তিক সাধনায় তাহার মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অনেক সময় আর্য্য ঋষির উপদেশে স্বধৃতি ও সদাচার পালনে রোগ-রাক্ষসগণ অনেকের নিকট ঘেঁসিতেই পারিতেছে না। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা এই ব্যাপার সন্দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—ভারতের সর্ব্ব প্রধান গৌরব —এই চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এই সংকল্প প্রথমে মনে আসিল আরবীয়গণের, তাঁহারাই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহার পর আরবের শিষ্য হইলেন গ্রীসবাসিগণ। ক্রমে গ্রীস দেশ হইতে এই চিকিৎসা সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িল। বিশ্ব সংসারে চিকিৎসা বিদ্যার প্রচারের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমরা বুঝিলাম, ভারতবর্ষই চিকিৎসা বিদ্যা প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তনা করিয়াছে।

কালে ঋষিকুল নির্ম্মূল হইল, শাস্ত্র-তন্ত্র-পুরাণ-জ্যোতিষ-বেদ-বেদাঙ্গ—সকল বিষয়েরই প্রথম প্রচারকারী আর্য্য ঋষির দল ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইলেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের বংশধরেরা আর্য্যপ্রদেশে বাতি দিতে রহিলেন বটে, কিন্তু ফলমূলাশী আর্য্য-ঋষির পদাঙ্কানুসরণে তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত বংশধর একজনও রহিল না। ইহারই ফল হইল আর্য্যবাসীর প্রচারিত চিকিৎসা বিদ্যা অন্যদেশে সমুন্নতি লাভ করিল, আর ভারতবাসিগণ তাঁহাদেরই জিনিস অপরকে বিলাইয়া

দিয়া চিকিৎসা বিদ্যার কৃতিত্ব দেখিয়া বিদেশবাসীর যশোকীর্ত্তন সহস্র কণ্ঠে করিতে অভ্যস্ত হইল।

এক সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা যে ভারতবর্ষে যথেষ্টই হইয়াছিল, সে কথা প্রমাণ করিতে আজ আর চেষ্টা করিব না, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যে ভীষণ অবস্থা দাড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্ক হইতেছে, যে অদূর ভবিষ্যতে বুঝি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে বোটানি বা উদ্ভিদ্ বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবার রীতি আছে, কিন্তু ভারতীয় ঋষি প্রচারিত দ্রব্যবিজ্ঞান যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে আনন্দ রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। উদ্ভিদের মূল আছে, কাণ্ড আছে, পত্র আছে, ফল আছে, তাহার পুষ্প এই প্রকার, পুষ্পরেণু এই প্রকার—বোটানিতে আমরা 'এই রূপ যে সকল শিক্ষা লাভ করি, আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্য-বিজ্ঞান পড়িলে সে সকল শিক্ষা লাভ তো সহজেই হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্য বিজ্ঞান পড়িলে দ্রব্য মাত্রেরই বিশ্লেষণ-শিক্ষা আমরা যেরূপ ভাবে প্রাপ্ত হই, সেরূপ শিক্ষা আর কিছুতেই হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্য বিশ্লেষণে বলিয়াছেন,—

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেবচ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তিকর্ম্ম চ॥"

অর্থাৎ রস, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি, এই পাঁচটী পদার্থ দ্রব্যে অবস্থিতি করে, ইহারা দ্রব্যে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহার পর রসের শ্রেণীবিভাগে ছয় রস, গুণের শ্রেণীবিভাগে পাঁচ প্রকার গুণ, দুই প্রকার বীর্য্য, এবং তিন প্রকার বিপাকের কথা এত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে দ্রব্যবিজ্ঞানে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ইহা ভিন্ন দ্রব্যবিজ্ঞান প্রসঙ্গে প্রভাব বলিয়া একটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই,—

বিরুদ্ধ গুণ সংযোগে ভূয় সাল্পং হি জায়তে।
রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান
ব্যপোহতি॥

অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখন দোষের বৃদ্ধি, কখন বা দোষের হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদি দ্বারা ফল স্থির করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ বিপাক—রসকে, বীর্য্য—রস ও বিপাককে, রস—এই উভয়কে এবং প্রভাব—রস, গুণ ও বীর্য্যের গুণকে পরাভব করে। এই প্রভাব চিন্তার বিষয় নহে, চিন্তা করিলেও এই প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে না, সুতরাং ইহার মীমাংসায় এই প্রভাবকে আমরা দ্রব্যশক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

শল্য শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসা শিক্ষার অভাবে যে সময় আর্য্যচিকিৎসার অবনতি আরম্ভ হইল, দ্রব্যবিজ্ঞানের চেষ্টাও সেই সময় হইতে ভারতীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কমিয়া আসিতে লাগিল। অধুনা তো দেশের অবস্থা "এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, অধিকাংশ চিকিৎসকই অনেক তরু-গুল্ম-লতা চিনিতে পারেন না, সেই

দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাকে তাঁহারা হয় তো পুস্তকেই পড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা আর তাঁহাদের পরীক্ষা করিবারই আবশ্যক ঘটে নাই। ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষি-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় সুশ্রুতের মত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকিলেও চরকের দ্রব্যবিজ্ঞান এতই অপূর্ব্ব যে, শস্ত্রকর্ম্মে পারদর্শী না হইয়াও কেবল মাত্র দ্রব্যবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক শস্ত্র সাধ্য ব্যাপারও উহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্ব্বঙ্কলের চিকিৎসায় "ছোট গোয়ালে লতা"র পাতার কথা উল্লেখ করিতে পারি। কার্ব্বঙ্কল পাশ্চাত্য চিকিৎসায় 'অপারেসন' বা শস্ত্রসাধ্যকর্ম্ম; কিন্তু এই ছোট গোয়ালে লতার পাতা লাগাইলে কার্ব্বঙ্কল অপারেশন না করিয়াও আরোগ্য করা যাইতে পারে। সাধারণ স্ফোটক বা ফোড়া পাকাইবার জন্য এবং ফাটাইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে' 'অসংখ্য বনৌষধি রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের সময়োপযোগী প্রয়োগে শস্ত্রকর্ম্ম না করিয়াও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারা যায়। আমরা সেই সকল দ্রব্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়াছি, এ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের দুরবস্থা হইবে না তো কি!

দ্রব্যবিজ্ঞানের চর্চ্চা আমাদের দেশবাসী ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদগণ শস্ত্রসাধ্যকর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ করিয়া যেমন আর্য্যচিকিৎসার গৌরব রক্ষা করিতেছেন, সেই রূপ আর্য্যচিকিৎসার অন্যতম গৌরব দ্রব্য বিজ্ঞান হইতেও কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া সেই সকলের প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কালমেঘ, অশোক, বাসক, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা প্রভৃতির তরলসার বা Extract ইহারই ফল সম্ভূত। আর্য্য চিকিৎসার দ্রব্যবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় মকরধ্বজ এবং মৃগনাভিতে উপলব্ধি করিয়াই ঐ ঔষধ দুইটী তো তাঁহারা তাঁহাদের ফারমাকোপিয়ার মধ্যে এরূপ অন্তর্নিহিতই করিয়া লইয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য ভারতবাসীর নিজস্ব হইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহার ব্যবস্থা করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার প্রতি তাঁহাদের আস্থা উপস্থিত হইতেছে না। ফলে আর্য্যভূমির গর্ব্বগরিমা চিকিৎসা বিদ্যার অবনতি সাধনের যে ভারবাসীই প্রকৃষ্ট কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন—

"যস্য দেশস্য যো জন্তুঃ তজ্জং তস্যৌষধম্
হিতম্॥"

অর্থাৎ যে দেশের প্রাণী,—সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে উপযুক্ত। পৃথিবীর সকল দেশের লোকে এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবাসী একথা কোনো কালেই বুঝে নাই, এখনো বুঝিতেছে না। নতুবা যে কয়টি তরলসার বা Extract এর কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি, সেই কয়টি দ্রব্য ভারতভূমির পল্লী প্রান্তরে অযত্ন সম্ভূত, পল্লী প্রান্তরের কথাই বা বলি কেন, পল্লীবাসীদিগের আবাসবাটীর চারিপার্শ্বে ঐ কয়টী

দ্রব্য যেখানে সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। পল্লীবাসীর উদ্যান বাটিকায়, বেড়ার অনেক স্থলেই গুলঞ্চের অভাব নাই, নিম্ববৃক্ষ তো পল্লীভূমির সকল স্থলেই। কালমেঘ, পুনর্নবাকে দলিত করিয়া পল্লীবাসী যাতায়াত করে, এমন অবস্থায়. বিলাতি শিশির চাকচিক্য দেখিয়া, লেবেল মোড়কের আড়ম্বর দেখিয়া অধিক মূল্য দিয়া সে সকল ঔষধ আমরা ক্রয় করিয়া অর্থ নষ্ট করি কেন? ভারতের অর্থ কি এতই সুলভ? ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই. উদর জ্বালায় ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী বিপর্য্যস্ত, এ অবস্থায় ভারতবাসী পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ হইয়া অনায়াসলভ্য ঔষধ সকল অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করে কেন? বিশেষতঃ তরল সার অপেক্ষা স্বরসে যে অধিক উপকার হইয়া থাকে। স্বরস বা নির্য্যাসের ব্যবহারে সত্বঃ ফল পাওয়া যাইবে, অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিতে হইবে না, সহরবাসীর পক্ষে অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিলেও দু' এক পয়সায় উহা সংগৃহীত হইবে, তথাপি ভারতবাসী তাহা না করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিবে, ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান যুগে যতগুলি কারণে দেশবাসীর স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে, অল্পায়ুঃ,অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যতগুলি ব্যাপার ভারতবাসীর অদৃষ্টে ঘটিতেছে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে ভারতবর্ষে অস্বরূপ চিকিৎসার প্রচলন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতবর্ষের চিকিৎসা বায়ু পিত্ত কফকে অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ এই তিনটিকে দোষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দোষ কুপিত হইলে সেই সকলের প্রতিকারোপায়ের মত প্রতিকারের সময় নির্দ্দেশও আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা অর্থাৎ ঐ সকল দোষ কুপিত হইলে পাচন ও শমন ঔষধ দিয়া ঐ সকল দোষের চিকিৎসা করিতে হয়—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান এ মতের পরিপোষক নহেন, তাঁহারা চাহেন রোগ দূর করিতে, আয়ুর্ব্বেদ চাহেন মূল দোষ দূর করিতে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই জন্যই জ্বরের মধ্যাবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—আয়ুর্ব্বেদ জ্বরের মধ্যাবস্থা দেখিলেই জ্বর রোধক ঔষধ দিতে ইচ্ছুক নহেন। আয়ুর্ব্বেদ জানেন, দোষের পরিপাক করিতে পারিলেই জ্বর আপনা হইতেই ছাড়িয়া যাইবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসার সহিত আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার বিশেষত্ব এই খানেই। এই বিশেষত্বই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব। দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের এই বিশেষত্ব বুঝিবার প্রবৃত্তি এখন আর দেশের লোকের নাই। আয়ুর্ব্বেদের অবনতি এমনই করিয়াই দাঁড়াইতেছে।

আর্য্যভূমির সর্ব্বপ্রধান গৌরব আর্য্যচিকিৎসায় নাই কি? ধাত্রী বিদ্যা—যে ধাত্রী বিদ্যা লইয়া এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দেশবাসীকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিতেছেন, সেই ধাত্রী বিদ্যার প্রচলন আয়ুর্ব্বেদে এত সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে এবং সেই সকল চিকিৎসার দ্বারা এত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, যাহা দেশবাসীর বিস্ময় পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদন

করিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এখন মন্ত্র বা অন্ত কোনোরূপ প্রকরণ বিধি মানিতে চাহিনা, কিন্তু মন্ত্র প্রয়োগ, 'বত্রিশের ঘর পূরণ' এবং গর্ভিণীর শিরো দেশে দ্রব্য বিশেষের বন্ধন-ব্যবস্থায় যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত এক দিকে যেমন আসুরী ব্যবস্থা করিতে হয় না, অপর দিকে সেইরূপ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ভারতবাসী এ সকল কথা মানিবেন কি? এই সকল ব্যবস্থা না মান্ত করায় অন্ত এক দিকে যেমন অর্থ নষ্ট হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ আর্য্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী দিগকেও চিকিৎসার সকল প্রকার অনুশীলনের অবসর দেওয়ার বিঘ্নোৎপাদন করা হইতেছে। দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণ অন্ত চিন্তা ছাড়িয়া এই সকল চিন্তায় মনোযোগী হউন। স্মরণ রাখিবেন, আয়ুর্ব্বেদকে অগ্রে বাঁচাইতে পারিলে তবে দেশ রক্ষা হইবে। আগে আয়ুঃ রক্ষার ব্যবস্থা, তাহার পর অন্ত চিন্তা। আমাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে যদি আমরা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলাম, অকাল বার্দ্ধক্য এবং 'অল্পায়ুঃ'কে বরণ করিয়া লইয়া যদি মরণের জন্তই আমরা প্রস্তুত হইলাম, তবে দেশের চিন্তা আমরা করিব কি? আমরা আবার বলিতেছি, হে দেশের কর্ম্মী-পুরুষ মণ্ডলি! আগে তোমরা ভ্রান্ত পথ ছাড়িয়া তোমাদের চিকিৎসার পক্ষে সর্ব্ব প্রকার উপযোগী সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির জন্ত বদ্ধপরিকর হও, তোমাদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই একমাত্র উপযোগী কিনা, অন্ত চিকিৎসায় শরণ লইয়া তোমরা আগের অপেক্ষা অধিক সবল, সুস্থ ও আয়ু লাভ করিতে পারিতেছে কি না এবং তাহার ফলে তোমাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার হইতেছে কিনা—এ সকল কথা চিন্তা কর, শুধু চিন্তা করিয়া নহে, চিন্তা করিয়া সর্ব্বাগ্রে সকল কর্ম্মের পূর্ব্বে ইহার প্রতিবিধানে যত্নপর হও, ইহাই তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদের বনৌষধি।

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন)

ঋষি প্রচারিত আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত ভেষজের বর্ণনা আছে, তাহার প্রত্যেকটির দ্বারাই বহুবিধ রোগের যে চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। আমার তো মনে হয়, যদি সকল অধিকারের সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত নাও থাকে এবং চিকিৎসক যদি দ্রব্য বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কোনো প্রকার চিকিৎসা করাই কঠিন হয় না। আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ মাত্রেই অধিকার ক্রমে বর্ণিত হইলেও একই ঔষধে যেমন বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করা যাইতে পারে,

সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় তরু গুল্ম লতা পত্র, পুষ্প, ও ফলাদির প্রত্যেকটির ব্যবহারে নানা বিধ রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বড় বড় নামজাদা ঔষধ সেবন না করাইয়া যিনি এইরূপ এক একটী ভেষজের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া সাফল্য লাভ দেখাইতে পারেন, তাঁহারই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

আগে এইরূপ চিকিৎসারই প্রচলন ছিল। তখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে ডিস্পেন্সারির প্রচলন হয় নাই। ছাপার পুস্তকেরও তখন বড় একটা চলন ছিল না। তালপাতা বা তুলট কাগজে তখন বৈদ্যদিগের চিকিৎসার বিষয়গুলি লিখিয়া রাখা হইত। বৈদ্যগণ চিকিৎসার বিষয়গুলি পুঁথির ভিতর লিখিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না, সেই সমস্ত বিষয় তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবে নিহিত রাখিতেন যে, তাহার জন্য ঔষধ প্রস্তুত থাকুক আর না থাকুক, কোনো রোগীর চিকিৎসা করাই তাঁহাদের নিকট কিছু মাত্র আটকাইত না। ইহার প্রধান কারণ ছিল, তাঁহাদের দ্রব্যবিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান। বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য মাত্রের নিকটেই যে সে জ্ঞানের অভাব হইয়াছে, আমি এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু সে-কালের মত দ্রব্যবিজ্ঞানে সেরূপ বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা এখন সকলে করেন কি না তাহা জানি না।

দ্রব্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে শুধু পুস্তক পড়িয়া সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, দ্রব্য চিনিবার জন্য দ্রব্য সকল নিজে আহরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আগেকার বৈদ্যদিগের অনেকেই সেই ব্যবস্থা পালন করিতেন। তাহার ফলে তখনকার দিনে সকল অধিকারের সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত না রাখিলেও চিকিৎসা কার্য্যে তাঁহাদের কোনো বাধাই উপস্থিত হইত না।

বাস্তবিক দ্রব্য বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিলে সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত না রাখিয়াও সকল প্রকার রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক ভেষজই যে নানাবিধ ব্যাধিবিনাশক সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ভেষজের কথা উল্লেখ করিতেছি,—

১ম—ত্রিফলা।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার মিলিত নাম ত্রিফলা। এই তিনটি ভেষজের প্রত্যেকটি কিরূপ বহু রোগনাশক তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি—

হরীতকীর পরিচয়ে ঋষি বলিয়াছেন,—

হরিতকী পঞ্চ রসালবণা তুবরা পরম।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদু পাকা রসায়ণী।
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমিনী।
শ্বাস কাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ শোথোদর কৃমীন।
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিবন্ধ বিষম জ্বরান্
গুল্মাধ্মান তৃষাচ্ছর্দ্দি হিক্কা কণ্ডু হৃদাময়ান।
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা।
অশ্মরীং মূত্র কৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ।

অর্থাৎ হরীতকী—লবণ রস ভিন্ন পঞ্চ রস যুক্ত অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় রস যুক্ত, তন্মধ্যে কষায় রসই প্রধান, রসনেন্দ্রিয়ের অনুভব যোগ্য। ইহা রুক্ষ, উষ্ণ বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, লঘু, মেধাজনক,

মধুর বিপাক, রসায়ণ, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুস্কর মাংস বর্দ্ধক, অনুলোমক এবং শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অর্শঃ কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণী রোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত নষ্ট করে।

আয়ুর্ব্বেদের মূলসংহিতা—চরক এবং সুশ্রুত এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলির উপরোক্ত শ্লোকের বিশ্লেষণ করিয়া হরীতকীর প্রয়োগ নানা রোগে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে—

রক্তার্শে—রক্তার্শের রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে (চঃ চিঃ ৯ অঃ)। (খ)

পক্কাতিসারে—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে আম দোষ বিনষ্ট হয়,(চঃ চিঃ ৯ অঃ)।

পাণ্ডুরোগে—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক কফ পাণ্ডু রোগীকে পান করিতে দিবে (চঃ চিঃ ২০ অঃ)।

উদর রোগে—রসায়ন বিধি নিষেধ অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে। **ছর্দ্দিতে**—বমন নিবারণার্থে হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি হয়। (চিঃ ২৩ অঃ)

সুশ্রুত অর্শে—অন্তর্বলি অর্শে প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে, (চিঃ ৬ অঃ)। **গুল্মে**—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। **হিক্কায়**—গরম জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (উঃ ৫০ অঃ)। **শ্লীপদে** গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায়।

সন্নিপাত জ্বরে হরীতকী—ভাবপ্রকাশক বলেন—হরীতকী তিল তৈল ঘৃত কিংবা মধু—ইহাদের কোন একটি দ্রব্যের সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিতে দিবে, ইহা কফজ সন্নিপাতে হিতকর (জ্বর চিঃ) **পিত্তশূলে হরীতকী**—ঘৃত কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন পিত্তশূলে হিতকর, (পিত্তশূল চিঃ)। **বাত রক্তে হরীতকী**—পাঁচটি কিংবা তিনটি হরীতকী সেবন পূর্ব্বক গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (চক্রদত্ত বাতরক্ত, চিঃ)। **মদাত্যয়ে হরীতকী**— মদাত্যয় রোগী হরীতকীর ক্বাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে হারীত, চিঃ ১১ অঃ)। **রক্তপিত্তে হরীতকী**—বাসকের স্বরসে হরীতকী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া পিপুল চূর্ণ ও মধু সেবন করিলে রক্তপিত্ত জয় করা যায় (হারীত, চিঃ ১১ অঃ)। **বৃদ্ধি রোগে হরীতকী**—গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী, এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে এবং জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধি রোগের পক্ষেও হিতকর (চক্রদত্ত বৃদ্ধি চিঃ)। **চক্ষুরোগে হরীতকী**—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া

চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিবে, ইহা বিবিধ চক্ষু রোগে হিতকর (চক্রদত্ত—নেত্র রোগ চিঃ)। **আঙ্গুল হাড়ায় হরীতকী**—লৌহ-পাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক তদ্বারা চিপ্প বা আঙ্গুল হাড়া পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে (বঙ্গ সেন, ক্ষুদ্র রোগ চিঃ)

আমলকীর পরিচয়ে ঋষির উক্তি—

> হরীতকী সমধাত্রী ফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
> রক্তপিত্ত প্রমেহঘ্নং পরং বৃষং রসায়ন্।
> হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ।
> কফং রুক্ষ কষায় ত্বাৎ ফলংধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
> যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশং।
> তস্য তস্যৈব বীর্য্যেন মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।

অর্থাৎ আমলকী ও হরীতকী—উভয়ই তুল্য গুণ কারক, আমলকীর বিশেষত্ব এই যে, আমলকীর—রক্তপিত্ত ও প্রমেহ নাশক এবং অতিশয় পুষ্টিকারক ও রসায়ণ। আমলকী—অম্ল রস দ্বারা বায়ু, মধুর রস ও শীতলরস দ্বারা পিত্ত এবং কষায় রস ও রুক্ষ গুণ দ্বারা কফ নষ্ট করে, এজন্য আমলকী ত্রিদোষ নাশক।

চরক, সুশ্রুত এবং অন্যান্য চিকিৎসা গ্রন্থে আমলকীর ব্যবহার নিম্ন লিখিত রূপ পাওয়া যায়—

শ্বেতপ্রদরে—আমলকী বীজ উত্তম রূপে পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকী চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চরক, চিঃ ৩০ অঃ) **হিক্কায়**—আমলকী ও কয়েদ বেলের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চরক, চিঃ ২০ অঃ) **বিসর্পজ্বরে**—গব্য ঘৃতে মিশ্রিত আমলকীর রস পিপাসিতরে পান করিতে দিবে (চরক চিঃ ১১ অঃ)। **অর্শে**—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কোনো মৃৎ পাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। ঐ পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শ-রোগীকে ঐ ঘোল পান করিতে দিবে (সুশ্রুত চিঃ ৬ অঃ)। **বাতরক্তে**—পুরাতন ঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে (সুশ্রুত চিঃ ৫ অঃ)। **প্রমেহে**—আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (সুশ্রুত, চিঃ ১১ অঃ)। অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে প্রস্রাব জ্বালা নিবৃত্ত হয় (সুশ্রুত, চি, ৫৮ অঃ)। **কাসে**—কাসরোগী আমলকী চূর্ণ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত সহ পান করিবে (বাগ্‌ভট, চিঃ ৩ অঃ)। কাস রোগে আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ আধ-পোয়া, জল দেড়পোয়া, দুগ্ধাবশেষে নামা-ইয়া ছাকিয়া, উহাতে আধ তোলা গব্য ঘৃত মিশাইয়া সেব্য।(বাগভট)। **রক্তপিত্তে**—ঘৃত ভজ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি রুদ্ধ হয় (চক্রঃ, চিঃ)। **পিত্তশূলে**—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (চক্র শূল চিঃ)। **শীতপিত্তে**—শীতপিত্ত রোগী পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত আমলকী সেবন করিবে (চক্রদত্ত, চিঃ)। **মূত্র-রোগে**—আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদেশে প্রলিপ্ত করিবে (ভাব প্রঃ, চিঃ)। **যোনিদাহে**—আমলকীর রস চিনি সহ পেয় (ভাব প্রঃ)। **সরক্ত মূত্র-কৃচ্ছ্রে**—ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস

সমভাগে মধু সহ পান করিবে (বঙ্গসেন)। **চক্ষু উঠায়**—সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে (বঙ্গসেন)। **শিরঃক্ষতে**—আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণপূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়, ইহা শিরঃপীড়ায়ও ব্যবহার করা যায় (ভাব প্রঃ, চিঃ)

বহেড়া সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন,—

বিভীতকং স্বাদু পাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাস নাশনম্।
রূক্ষং নেত্র হিতং কেশ্যং কৃমি বৈস্বর্য্য নাশনম্।
বিভীত মজ্জা তৃট্ ছর্দ্দি কফ বাত হরোলঘুঃ।

অর্থাৎ ইহা মধুর, বিপাক, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, রুক্ষ, চক্ষু কেশের হিতকর এবং কফ, পিত্ত, কাস, ক্রিমি ও বিস্বরতা নাশক। বহেড়ার মজ্জা—লঘু, কষায়, রস, মদকারক এবং পিপাসা, বমি, কফ ও বায়ু নাশক।

আয়ুর্ব্বেদে ইহার ব্যবহার এইরূপ—

কাসে—বহেড়া গব্য ঘৃতে মাখাইয়া গোবরের ঢুলির ভিতর রাখিয়া ঘুটের আগুণের উপর স্থাপিত করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসীর উত্তম ঔষধ (চক্র দত্ত, কাসচিঃ)। **শ্বাসে ও উৎকাসিতে**—বহেড়া চূর্ণ মধুর দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে প্রবল উৎকাসি ও শ্বাস নষ্ট হয় (চক্রঃ, কাস চিঃ) **হৃদস্পন্দনে**—বহেড়া চূর্ণ ও অশ্বগন্ধা চূর্ণ—পুরাতন ইক্ষুগুড় ও গরম জলের সহিত সেবন করিলে হৃদস্পন্দন প্রশমিত হয় (বঙ্গ সেন, বাতব্যাধি চিঃ)। **অশ্মরীতে**—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোনো-প্রকার মন্ত্রের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে মূত্র বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (সুশ্রুত, উঃ, ৫৮ অঃ)। **শোথে**—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চরক চিঃ ১৭ অঃ)।

এই হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার মত আমরা প্রত্যেক দ্রব্যই দেখাইতে পারি, যদ্দ্বারা সকল প্রকার রোগের চিকিৎসাই করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে এক একটী দ্রব্যের প্রয়োগে অনেক সময় বড় বড় ঔষধ অপেক্ষা শুভ ফলও ফলিয়া থাকে। গর্ভিণী চিকিৎসায়, শিশু চিকিৎসায় তো এইরূপ এক একটী ভেষজই প্রয়োগ করা আবশ্যক। নানাবিধ ঔষধ প্রদান করুন, কিন্তু স্ত্রী-রোগে অশোক, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতিতে গুলঞ্চ, কাসরোগে বাসক বা তজ্জাতীয় কোনো একটী দ্রব্য অনুপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই শ্রেণীর অনুপানে মূল ঔষধ অপেক্ষাও অনুপানের দ্রব্যে অধিক ফল দর্শিয়া থাকে। দেশের চিন্তাশীল চিকিৎসকগণের দৃষ্টি এইরূপ চিকিৎসা-প্রবর্ত্তনার জন্য আমরা আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ চিকিৎসা দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে, দেশবাসীর যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পাচনের চিকিৎসাও দেশের মধ্যে পুনরায় অধিক করিয়া প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বৌষধেষু পাচনমৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি
'সত্বরম্॥

অর্থাৎ রোগীগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনিগণ বটিকাদি সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা পাচনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই পাচন-দ্রব্য বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। আগে বৈদ্য-চিকিৎসার মধ্যে এই পাচনের প্রচলন বিশেষ ভাবেই ছিল, তাহার ফলে লোকের অর্থব্যয়ও অল্প হইত, অতি শীঘ্র সুফলও ফলিত। এখন দেশের রুচি-বিপর্যয়ে ইহাও নষ্ট হইবার মত হইয়া দাঁড়িয়াছে। অনেক চিকিৎসকতো এখন পাচনের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুকই নহেন, অনেক গৃহস্থও আর পাচন প্রস্তুতের ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে চাহেন না। যাহা হউক গৃহস্থদিগের মধ্যে যদি সে ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে ইচ্ছা নাই করেন, তাহা হইলে দেশের চিকিৎসকগণ দেশের মধ্যে পাচনের পুনঃ প্রচলনের জন্য ঝঞ্ঝাটটা নিজেদের হাতেই না হয় গ্রহণ করুন। তাঁহারা যে যে পাচনের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা তাঁহারা দৈনন্দিন প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রদান করুন, তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করুন। ফল কথা যে ভাবেই হউক পাচনের ব্যবস্থা বহুল ভাবে দেশে প্রচলিত হউক ইহাই আমাদের বক্তব্য।

বিজ্ঞান রহস্য।

(শ্রীসরোজকুমার মহলানবীশ)

মানব—সৃষ্টির আদিকাল হ'তেই অতি সন্ধিৎসু। 'আদম' ও 'ঈভ্' তাহারই মূল কারণ ব'লে আজ আমরা অশান্তি-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। পাশ্চাত্য ইতিহাসের ইহাই নাকি গবেষণাপূর্ণ অকাট্য যুক্তি। ভগবৎ নিষেধ অগ্রাহ্য করায় আজ তাহারা আমাদের কাছে—তাঁদেরই উপযুক্ত বংশধরগণের নিকট ভ্রান্ত ব'লে প্রতীত। কথাটা যদি তাই হ'য়ে থাকে, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয়; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঊর্ণনাভের সূতার ন্যায় জড়িয়ে পড়ি সত্য, কিন্তু ইহার অন্তর্প্রবাহিত, ফল্গুর নির্ম্মল-ধারার যিনি স্বাদ পেয়েছেন, তিনি কি ক'রে বল্‌বেন—জ্ঞান আমরা চাই না, জ্ঞানের অমৃত ধারায় আমাদের কাজ নাই। পতঙ্গ অগ্নির চাকচিক্য দেখে পুড়ে মরে, বীরের হৃদয় সমর-বাদ্যে নাচিয়া উঠে, রণক্ষেত্র আপন শোণিতে রাঙ্গিয়ে তোলে, ইহাতে কি তা'দের সুখ নাই?

যে জ্ঞান কাহারও কাছে অমানিশার নিবর নিস্তব্ধ ভীতিপ্রদ দৃশ্য নির্চয়ে পরিবৃত, আবার কাহারও কাছে শারদ-জ্যোৎস্নার প্রাণমাতান, বসন্তের স্ফূর্ত্তি প্রসূনে, পাখীর মূর্চ্ছনায় আবেশময়, ব'লে প্রতীয়মান হয়, সে জ্ঞান কি? সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে এই বলিতে হয়—কোন কিছুর স্বরূপত্ব জানার নামই জ্ঞান। যেমন জল বলিলে এই বুঝি—দারুণ গ্রীষ্মে যখন কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে মৃতপ্রায় হ'য়ে যাই, শীতল ক্রিয়ার জন্ম ব্যাকুল হ'য়ে উঠি, তখন যাহার স্নিগ্ধ পরশে আবার নূতন প্রাণ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠি তাহাই জল। যাহার অভাবে মানবের আশা ভরসার-স্থল শস্যক্ষেত্র মরুভূমির ভীতিপ্রদ দৃশ্য নিচয়ে পর্য্যবসিত হয়, এমন কি যাহার অভাব ঘটিলে বিশ্বধ্বংসের পথে যেয়ে একটা হাহাকারের আর্ত্তস্বর দুনিয়ার মালিকের পদপ্রান্তে পৌঁছায়, ইহাইতো জল। তাই বুঝি আর্য্যঋষি ইহার নামকরণ করেছেন জীবন। এইতো গেল জল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

ইহারই একটু উপর স্তরে বিজ্ঞান বিরাজিত। বিজ্ঞান কি ইহা বিংশ শতাব্দীর ছোট্ট ছেলেটিকেও ব'লে দিতে হয় হয় না। এখন ট্রামে আমরা নন্দন কাননে (Eden garden) যাই, বৈদ্যুতিক উত্তোলন যন্ত্রে (Lift) আমরা দালানের পর দালান ঘুরিয়া বেড়াই, ষ্টীমারে আমরা গঙ্গা পার হ'য়ে থাকি; বৈদ্যুতিক আলোতে পাখার হাওয়ায় যখন আরাম করি, বিজ্ঞান যে তখন আমাদের ব্রেনে (Brain) আসর জমকাইয়া বসে। বিশ দিনের পথ যখন আমরা একদিনে চলে আসি, আশ্চর্য্যময়ী পশীবুথীর সুললিত কণ্ঠের সুমিষ্ট গীত যখন আমরা নির্জ্জন পল্লীর লতাপাতা ঘেরা কুটীরে ব'সেও শুনতে পাই, বৈদেশিক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়-কৌশল যখন কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তখনই বুঝিতে আর বাকি থাকেনা বিজ্ঞান কি?

বিজ্ঞানের ধাতুগত অর্থ বিশেষরূপে জানা। যেমন জল Hydrogen ও oxygen এই মূল পদার্থদ্বয়ের সমন্বয়ে প্রস্তুত, ইহারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ইহাই বৈদেশিক বিজ্ঞানের মূল সূত্র। কিন্তু এখানেই কি বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ? এই বিজ্ঞানকেই কি আমরা বিজ্ঞান ব'লে গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকি? ইহাই যদি হ'য়ে থাকে, তবে বিজ্ঞান অবিজ্ঞান—বিজ্ঞান অপূর্ণ। বিহগের কূজন, ফুলের হাসি, সমীরের বুকভরা স্নেহ, কাহার আশীষ সিঞ্চন ক'রে দেয়? উষা অলক্ত রাগে রঞ্জিত হয়ে নিসর্গের সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারটুকু লুঠে নিয়ে প্রতিদিন কা'র আদেশে আমার দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে? পূর্ণিমার রজতশুভ্র চন্দ্রমা আমার কুটীর খানি কা'র আদেশে জোছনায় সিক্ত ক'রে দিয়ে হাসতে হাসতে পশ্চিম গগনের কোলে ঢলিয়ে পড়ে। গোলাপ-টগর-মল্লিকা কাহার সৌরভের কণা পেয়ে আজ তাহারা বিলাসী লক্ষীর বরপুত্রের প্রমোদ কাননে সাদরে স্থান পেয়েছে? এই স্থানেই বৈদেশিক বিজ্ঞান চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়। বিজ্ঞানের—আলো সেখানে-যেখানে ব্রহ্মাদি দেবারাধ্য সেই চন্দন চর্চ্চিত চরণযুগলের সন্ধান মেলে—যখন সেই চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া নয়নযুগল প্রেমাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তখন মান

অভিমান, অহঙ্কার দূরে পালিয়ে যায়। তখন শুধু এক অনির্বচনীয়, স্বর্গীয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দেহমনকে মাতিয়ে রাখে। যে মহাজ্ঞানে সেই মহানকে জানা যায়—তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ভিত্তি কোথায়? সমস্যা-সমাধানই বিজ্ঞানের ভিত্তি। লালসায় ইন্ধন যোগানই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চরম ফল। আমরা হিন্দু; আমাদের প্রতি শিরায় উপশিরায় আর্য্য শোণিত প্রবাহিত। ইন্ধন যোগান তো আমাদের ধর্ম নহে। আমরা যে অমৃতস্য পুত্র। আমরা যে বজ্রনির্ঘোষে শুনতে পেয়েছি—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ—"

আমরা তো লালসায় ইন্ধন চাইতে পারিনা। আমরা চাই নির্ব্বাণ—আমরা চাই মুক্তি। আমাদের বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি হ'বে—'আপ্তবাক্য'—উপায়—যোগ। আর সেই বিজ্ঞানসেবী মুনি ঋষিদিগকে আমরা শুধু ফলমূলখেকো বলিতে পারি না। তাঁহাদিগকে আমরা ভাবি দেবতা-শ্রেষ্ঠ। তাই বুঝি ভগবান বাসুদেব ভৃগুপদ চিহ্ন লাঞ্ছিত।

Hydrogen ও oxygen আমার খেলার সাথী Iodine ও Bromine আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব; Electricity আমার আঁধার ঘরের আলো, Laboratory আমার বৈঠক খানা; কিন্তু ওরা তো আমার বুক ফুলিয়ে ব'লে দিতে পারেনা যে তুমি বৈজ্ঞানিক—তোমার বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট আছে। ওরা তো আমায় ব'লে দেয়না যে জ্ঞান পেয়ে কুবের ভিখারী, দেবাদিদেব মহাদেব শ্মশান-বাসী, রাজা সর্ব্বত্যাগী—সে জ্ঞানের খানিকটুকু আমায় দিতে পারে। আমরা গোষ্পদ, মহাসমুদ্রের সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'বে কেন? আমরা তো শুধু বৈজ্ঞানিকের পরিচ্ছদে আসর জমকাইয়া বিজ্ঞানের অভিনয় ক'রে থাকি মাত্র। অভিনয়ে হয়তো কেহ লোক সমাজের মনস্তুষ্টি ক'রে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারি। সেতো হলো আমাদের ব্যবসাদারী জ্ঞান। এই জ্ঞান নিয়েই তো আমি ব'লতে পারিনা আমি বিজ্ঞান জানি। যখন যথার্থ জ্ঞানের দুয়ারে আমি মাত্র দাঁড়াতে পারব, তখনই দেখবো আমার অহমিকা জ্ঞান, ঘুচে গিয়ে এক বিমল জ্যোতিতে আমি উদ্ভাসিত হ'য়ে গেছি। তখন তো আমি বলতে পারবো না আমি X Roy দিয়ে Dishcation দেখবো, আমি টাইটেনিক গড়বো, আমি এরোপ্লেনে হাওয়া খাবো। তখন শুধু এই কথাই মনে হ'বে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" ইহাই তো হলো প্রাচ্যের মূলমন্ত্র। সে জ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনের শক্তি টেলীস্কোপ বা মাইক্রোস স্কোপের নেই, ওরা শুধু আমাদের দৃষ্টিশক্তি—ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে ইহাদের শক্তির অপচয় ক'রে থাকে। আমরা চাই—অন্তর্দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ ক'রে আভ্যন্তরীন অমূল্যরত্নের সন্ধানই আমাদের ইপ্সিত। ইহাইতো যোগ। এই যোগ সাধনার চরমফল আপ্তবাক্য লাভ। আপ্ত বাক্যের মানে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী। যখনই আমি জ্ঞানময়ের আশ্বাস বাণী শুনতে পেলাম, তখন আমার স্বরূপত্ব জ্ঞানের বাকী

রইল কি? আমি যে তখন স্পর্শ মাণিকের পরশে খাঁটী সোণা হয়ে গেছি। আমি যে তখন ভাবি—

"অহং ভোজনং নৈব
ভোজ্যং ন ভোক্তা—"

ইহার জন্যই রাজা সর্ব্ব বনবাসী, গৃহী সর্ব্বত্যাগী। যাহাদের ক্রোধে প্রলয়ের বিভিষিকা সঞ্চার করে, নিঃশ্বাসে রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট হন, অভিসম্পাতে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ঘুচে যায়, তা'রা আজ কাননচারী—ফলমূল খেকো। তাই ইংরেজী সুরে বল্‌তে হয়—

"Plain living and high thinking is the made of our life." তখন আর পার্থিব ভোগ বিলাস বা তাহার সাধন জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না। মন তখন যাহাকে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না, সেই সকল আনন্দের মূল কারণের চরণ কমলে লুব্ধ মধুকরের ন্যায় বদ্ধ হইয়া যায়। সে মধু ত্যাগ করিয়া উড়িবার আনন্দও সে চায় না।

— —

'গুলে গোল'।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।)

'গুলে'র কথা অনেকেই জানেন। আগে গুল অনেকেই দেখিয়াছেন ও তাহার মানব দেহের উপর উপকারিতার কথাও অবগত আছেন। অধুনা গুল, যাহা বিষচিকিৎসা একবার উঠিয়া গেলেও মাঝে মাঝে গুলমাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথা সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে প্রমাণ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গুলের কথা কহিব কি, এখন সবই গোল হইয়া গিয়াছে। আগে প্লীহা, বাতাদি গুরুতর রোগে প্রায় সকলকেই হস্ত পদ বা পৃষ্ঠদেশে গুল লইতে দেখিয়াছি। হস্ত পদাদির নিকৃষ্ট স্থানে লোহা পোড়াইয়া সে স্থানে হরিদ্রা খণ্ড রাখিয়া ঘা করিতে হয়. সে ঘায়ের স্থানে নিম কাষ্ঠের বা হরিদ্রা খণ্ডের ক্ষুদ্র গুটী বসাইয়া দিতে হয়। নিমের গুটি হরিদ্রা গুটীতে ঘায়ের স্থানটা গর্ত্ত হইয়া যায়। কিছুদিন নিয়ত সে স্থানে ঐ গুটী বসাইয়া রাখিতে হয়। পরে অন্য গুটী দিতে হয়। তাহা দিয়া প্রতিদিন প্রচুর পুঁয নির্গত হয়। ঐ পুঁয বাহির হওয়ার দরুণ দেহের বদ্ধ, দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া শরীরটা ঝরঝরে হয়। তদ্দরুণ দৈহিক অবসাদ দূর হইয়া শরীর পাতলা হয়। দেশে এরূপ গুল লইবার রীতি ছিল। এই অবস্থায় শরীরে পুঁযের গন্ধ হয় বলিয়া তাহা নিত্য অন্ততঃ দুইবার করিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইত। কেহ কেহ তাহাতে দুর্গন্ধ না হইতে পারে তজ্জন্য আতর, গোলাপ ব্যবহারও করিতেন।

এখন ভদ্রলোকেরা গুলটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। সাধারণ দরিদ্র লোকেরা কেহ কেহ গুল দিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা প্রচুর উপকারও পাইয়া থাকে। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে কবিরাজেরাও এরূপ গুলের ব্যবস্থা দিতেন এবং তদ্বারা রোগীরা প্রভূত উপকার পাইত। প্লীহা ও বাত রোগে গুল অনেক উপকার দিয়া থাকে। তা' ছাড়া চক্ষু রোগেও গুলের উপকারিতার কথা শুনা যায়। অন্যান্য বহুবিধ রোগে গুলের ব্যবস্থা শুনা যাইত। গুলে যত বেশী পুঁয ঝরে, সেইস্থানে সত্বর তত বেশী স্থায়ীরূপে উপকার হয়। প্লীহা রোগের অবস্থায় বালক, বালিকাদিগকে গুল লইতে দেখা যাইত। এখন গুলের তেমন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না।

বাঙ্গালার জল বায়ুতে আগে গুল সহ্য হইত। প্রথমে দেহের স্থান-বিশেষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া দিলে তাহাতে যন্ত্রণা হয় ও সে স্থান পাকিয়া গলিয়া বিলক্ষণ যন্ত্রণা প্রদ করিয়া তোলে, ক্রমে তাহাতে গুটী বসাইয়া দিলে ঝরিতে আরম্ভ হইলে আর যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু আবার পূর্ণিমাদি জোয়ারের তিথিতে কিছু কিছু করিয়া যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ভদ্রলোকেরা গুলকে বড় কষ্টপ্রদ বলিয়া মনে করেন, ফলে গুল তেমন কোন কষ্ট প্রদান করে না, পরে উহা সহ্য হইয়া যায়। দেহের যত দূষিত রক্ত গুলের ভিতর দিয়া পূযাকারে বাহিরে আসিয়া পড়ে। এইগুলকে দীর্ঘকাল দেহে রাখিলেই বেশী উপকার হয়। এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল গুল দেহে রাখিলে বিশেষ কষ্টও নাই, সঙ্গে সঙ্গে উপকারও হইয়া থাকে। রোগের যন্ত্রণা হইতে গুলের যন্ত্রণা বেশী নহে। এইরূপ উপকারী গুলকে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। এখন হয়ত সর্ব্ব প্রকারের চিকিৎসকেরা গুল দেওয়া সম্বন্ধে গোল করিয়া তাহার প্রচলনে বিরোধী হইবেন।

চক্ষুরোগে সাধারণতঃ ঘাড়ে বা কর্ণে গুল দেওয়া হইত। বাত রোগে ও প্লীহায় হস্ত বা পদে প্রস্রাবাদি রোগে কখন কখন উরুতে গুল দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। প্লীহা ও বাত রোগে সময় সময় পৃষ্ঠে গুল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কর্ণ ও ঘাড়ে মস্তিষ্ক রোগে গুল দেওয়া হইত। এই চিকিৎসায় ব্যয় ছিল না, অথচ উপকারিতা অল্প ছিল না। এইরূপ সুলভ চিকিৎসা উঠিয়া যাওয়ায় দেশের অপকার হইয়াছে। আহারাদিতেও কোন নিষেধ-বিধি কতক গুলি দ্রব্যের উপর ছিল, যাহা খাইলে দেহে বাতাধিক্য ঘটিতে পারিত না।

প্রতিবাদ।

(শ্রীঅজিত শঙ্কর দে).

মাননীয় "আয়ুর্ব্বেদ"-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকায় কবিরাজ নীলকান্ত রায় কবিরত্ন লিখিত "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, এরূপ একটী মিথ্যা যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ আপনার "আয়ুর্ব্বেদে" স্থান পাইয়াছে। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন; কারণ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞান নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে। "The greatest fool is he, who doest'not know that he himself is a fool." বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কবিরত্ন মহাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বালোচিত আচরণ করিয়াছেন।

প্রকৃতি উচ্চ শিক্ষিত কত কবিরাজ ও এলোপ্যাথগণ উচ্চ কণ্ঠে হোমিওপ্যাথির কত প্রশংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন, আর আপনাদের "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের" লেখক মহাশয় স্পষ্টই বলিতেছেন যে,হোমিও-প্যাথিতে রোগ আরাম হয় না। হোমিও-প্যাথিতে রোগ আরাম হয় কি না, তাহা জগতের সকল দেশের লোকই জানেন এবং কবিরত্ন মহাশয় যদি নিদ্রিতাবস্থায় গৃহে বসিয়া না থাকেন, তিনি ও জানেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে চক্রপাণি ও সুরেন্দ্রের কথোপ-কথনচ্ছলে চক্রপাণির মারফত হোমিও-প্যাথির সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলির প্রতিবাদ করিলে আপনার "আয়ুর্ব্বেদের" সকল পৃষ্ঠাগুলিই পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিবাদ করিলেই বা ফল কি হইবে? কবিরত্ন মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতাম। বাদানুবাদ করিবার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্ত তাঁহাকে দুইখানি পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দান করি। একখানি, হোমিও-প্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রণীত অর্গ্যানন (Organon of medicine), আর একখানি মহানুভব কেণ্ট প্রণীত হোমিওপ্যাথিক দর্শন Lctu1e on Homoeopathic Philosophy)। এই দুইখানি পুস্তকে সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া তিনি আর কখনও যেন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা না করেন। তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক অবমাননা সহ্য করিতে হইবে। তাঁহার "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধ যে তাঁহার কত নির্য্যাতনের কারণ হইবে তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক তাঁহার কয়েকটী উক্তির সংক্ষেপে প্রতিবাদ করিতেছি

১। চক্রপাণি মারফত তিনি সুরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিতেছেন, "যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা কি উহাতে মুগ্ধ না উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে, চান?" তাহার উত্তরে আমি বলি যে, হাঁ, যাঁহারা সৎবিষয়ে ভাবিতে বা চিন্তা করিতে জানেন, তাঁহারাই হোমিওপ্যাথির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

২। তিনি লিখিতেছেন, "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এত সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মঅংশে বিভাজিত যে, তাহার ক্রিয়া শরীরের উপর প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।" প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, আমি কবিরত্ন মহাশয়কে তাঁহারই শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ দেখাইয়া দিব বলিয়া আহ্বান করিতেছি।

৩। সুরেন্দ্রের বন্ধুগণ মারফত তিনি বলিয়াছেন, "জার্ম্মান ও আমেরিকানগণ যখন হ্যানিম্যানের মতের পরিপোষক, তখন কি উহাতে ভুল আছে?" তাহার উত্তরে আমি বলি যে, হ্যানিম্যানের সমস্ত সূত্রগুলিই যে যুক্তি মূলক তাহা, কবিরত্ন মহাশয় অর্গ্যানন পাঠেই বুঝিতে পারিবেন।

৪। কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "ঔষধ বিনাও রোগ আরোগ্য হয় এবং হোমিওপ্যাথগণ পথ্যের উপর বেশী নির্ভর করেন।" তাহার উত্তরে আমি লিখি যে, কতক রোগ—বিনা ঔষধেও আরোগ্য হয়, কিন্তু প্রাচীন রোগ তাহা হয় না। পথ্যের বিচার কি কেবল হোমিওপ্যাথরাই করেন? কবিরাজ কিংবা এলোপ্যাথগণ কি সে সম্বন্ধে বিচার করেন না? আমাদের কবিরত্ন মহাশয় কি পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লেখার ন্যায় "স্নান, ভোজন পানের কোন ও নিয়ম নাই"—ইত্যাদি যথেচ্ছাচারিতা সূচক পেটেন্ট কথাগুলি ব্যবহার করেন? তাহা যদি করেন, তাহা হইলে কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক আপনাদের অন্যান্য কবিরাজ মহাশয়গণের অন্নের পথ বন্ধ হইবে

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী এল,এ, এম, এস; এচ এম্ বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবনে আর একবার মাত্র তাঁহার পদধূলি পাইয়াছিলাম। সে আজ প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেবার রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় আশু বাবু তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের সহিত দীনেশ বাবুর বাড়ীতে আসিলেন। দীনেশ বাবু তাঁহাকে

কিছু খাইতে অনুরোধ করিলে তিনি শরীর ভাল নাই বলিয়া আপত্তি করিলেন। দীনেশ বাবু বলিলেন,—কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন পেটের গোলমাল হইয়াছে। দীনেশ বাবু তখনি বলিয়া বসিলেন,—তা'তে কি হয়েছে? আপনি খান, আমি ঔষধ দিব। কিছু মিষ্টান্ন খাইলে পর আশু বাবু ঔষধ চাহিলেন। দীনেশ বাবু তখনি তাঁহার এক পুত্রের দ্বারা দুইটী ঔষধ পূর্ণ শিশি আনাইলেন একটীতে 'মহাশঙ্খবটী' অপরটীতে 'বজ্রক্ষার।' আশু বাবুকে দীনেশ বাবু কিছু বজ্রক্ষার খাইতে দিলেন। আশুবাবু খাইয়াই বলিলেন,—এ কোন্ কবিরাজের ঔষধ? তিনি বলিলেন "এ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয়ের ঔষধ। আমি তাঁর কাছ থেকে এই দুই শিশি ঔষধ লইয়া আসিয়াছি,—এই তাঁর ছেলে, এও কবিরাজ।" তখনি আশু বাবু আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন, আমি তাঁহার কাছে গিয়া পদধূলি লইয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন,—এ ঔষধের নাম কি? আমি বলিলাম বজ্রক্ষার, তিনি বলিলেন, এতে কি আছে? আমি বলিলাম,—সোরা ও ফট‍্‍কিরি। আমার কথা শুনিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আমি তো ঠিক ধরিয়াছি, এতে সোরা আছে, তবে তো এ বড় উপকারী। এর পর আরও দুচারটা প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। তারপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ বাবু উক্ত দুই শিশি অর্দ্ধেকটা করিয়া ঔষধ লইয়া যাইলেন। এই দুই বার মাত্র আমি তাঁর পদধূলি পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, তিনি আরও কিছু দিন কেন থাকিলেন না?

আশু বাবু যে কিরূপ নির্ভীক লোক ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। এই সে দিন 'কনভোকেশনের' পর লর্ড লিটনের সহিত তাঁহার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কিরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনে আছে। একবার লর্ড কর্জ্জন যখন তাঁহাকে বলেন—"আপনার মাকে বলিবেন, প্রধান রাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে, তাঁহার পুত্রকে যাইতে হইবে।" তদুত্তরে আশু বাবু বলিয়াছিলেন,—ভারতের বড় লাট কিম্বা তদপেক্ষা কোন উচ্চতর ক্ষমতাশালী এমন কোন লোকই এ পর্য্যন্ত কেহই জন্মায় নাই যিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে লইয়া যাইতে পারেন। সোজাভাবে সকলকেই এরূপ উত্তর দিতে কখন আশুবাবু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। আমি তাঁহার জীবনী লিখিতে বসি নাই, অনেক যোগ্যব্যক্তি যাঁহারা তাহার সংস্পর্শে বহুদিন কাটাইয়াছেন, সে কার্য্য তাঁহারাই করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদের উপর আশুবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব শীর্ষে স্থান দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে চিকিৎসাজগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারে, তাহার জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে জানিতেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে এদেশবাসীর আদি চিকিৎসা, তাহা দেশবাসী এক দিন না

এক দিন বুঝিতেই পারিবেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইহার বোর্ড অব ট্রাষ্টির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শতকাজের মধ্যে থাকিয়াও ইহার কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ইহা তিনি দেখিতে আসেন এবং ইহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের কর্ম্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আবিস্কৃত বিবিধ তত্ব ও দ্রব্যসম্ভারের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এক একজন অধ্যাপকের প্রতি বিষয়-বিশেষের অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইবে এবং তিনি সেই বিষয়ের শাস্ত্রাংশ যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক অধ্যাপন করাইবেন। রসশাস্ত্র পদার্থবিজ্ঞান বনৌষধি বিজ্ঞান, শারীর ক্রিয়া তত্ব, অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা, কায় চিকিৎসা, শল্যশালাক্য চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা— এই আটটী শাখার জন্য আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগীগণের ঔষধসাধ্য এবং শস্ত্রসাধ্য উভয় রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে নির্ব্বাহ করা হয়। চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ গুল্ম লতাদির পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভেষজ পরিচয়াগারের প্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করাও উদ্যোক্তাদিগের অভিপ্রেত। এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠেয় বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে আমি একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি বিশেষ হিতকর, সুতরাং এই বিদ্যালয় জনসাধারণের এবং রাজসরকারের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য লাভের যোগ্য। ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী সত্বেও এতদ্দেশীয় চিকিৎসা-সমালোচকগণ যদি দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মূলক নহে। ভারতীয় সুতীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন মনীষীগণের যুগযুগান্তরের অর্জ্জিত সূক্ষ্মদর্শন এবং অভিজ্ঞতা যে চিকিৎসা শাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাকে আমরা কদাপি অবজ্ঞা করিতে পারি না। এক্ষণে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে বলিতেছি—ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ উত্তরোত্তর উন্নতির অযোগ্য—মৃত বলিয়া ভাবিও না, কিন্তু উত্তরোত্তর উপচীয়মান বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত যাহাতে ইহারও পরিপুষ্ট সাধিত হয়, যত্নের সহিত তজ্জন্য অনুষ্ঠান কর। এই কলেজের গৃহ, আতুর-নিবাস, গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অত্যাবশ্যক অর্থের প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত হইয়া যাইবে।

(স্বাঃ) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ২২শে জুলাই ১৯১৬।"

আজ নয় বৎসর পূর্ব্বে আশুবাবু যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সাধিত না হইলেও অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ করপোরেশন হইতে বার্ষিক ৩৫০০ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে, ইহা ভিন্ন ইহার বাড়ী প্রস্তুতের জন্য ১বিঘা ১১কাঠা জমি মিউনিসি-প্যালিটি দান করিয়াছেন। আশুবাবুর ইচ্ছা ছিল এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করেন। আশুবাবুর অনুরক্ত দেশবাসীগণ অগ্রণী হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করুন ইহাই প্রার্থনা। পরপার হইতে তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

পরম পূজ্যপাদ মহাত্মার উদ্দেশে আজি আমি কবি অমরেন্দ্রনাথের সহিত হৃদয়ের অঞ্জলি প্রদান করিয়া বলিতেছি,—

বাঙ্গালার সিদ্ধপীঠে হে শব সাধক!
তব তরে অশ্রুঝরে সারা বাঙ্গালার।
বিল্বদল গঙ্গাজলে পূজিতে তোমারে
পারিবে না অভাগা বাঙ্গালি,—তাই আজ
তিল তুলসী গঙ্গোদকে করিছে তর্পণ
ভীষ্ম-পিতামহ জ্ঞানে তোমারে সকলে।"

অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি+

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

(অধ্যাপক শ্রীবিরেন্দ্র নাথ সেন এম-এ)

অগুরু আগরাই চন্দন+ তিক্ত, উষ্ণ, কটু, (লেপে রুক্ষ)। ব্রণ কফ, বায়ু, কান্তি, মুখ-রোগ, চক্ষু ও কর্ণ রোগ নাশক। মাত্রা ১ সাঁখা হইতে ২ মাষা।

অগ্নিজার।—কটু, উষ্ণ। কফ, বায়ু সন্নি-পাত, শূল ও শীতরোগ নাশক। পিত্তপ্রদ।

অগ্নি দমনী, শোলা। কটু, উষ্ণ, রুক্ষ। বাত, কফ, গুল্ম ও প্লীহা নাশক।

অঙ্কোট, আঁকোড়। কটু, স্নিগ্ধ। বিষ-লুতাদি দোষ নাশক, কফ বায়ু নাশক, মূত্র শুদ্ধিকারক, রেচক। মাত্রা—২ তোলা।

ফল।—শীতল, স্বাদু, শ্লেষ্ম নাশক, গুরু,

+ এই অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি সিটি কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারই নাম প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের সংগৃহীত। আঃ সাঃ।

বলকারক, ধাতুপোষক, বিরেচক, বাত, পিত্ত, দাহ, কফ ছুষ্টরক্ত নাশক।

অজগন্ধ, বনযমানী, অজমোদা।—কটু, উষ্ণ। বাত, গুল্ম, উদর রোগ, ব্রণ ও শূল নাশক, নেত্র রোগ নাশক, কৃমিঘ্ন, বসন্ত রোগ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

অজশৃঙ্গী, গাড়র শৃঙ্গী অর্থ শিঙিমাষ, জিয়ল। কটু, তিক্ত, কফ, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিষরোগ, কাস ও কুষ্ঠ রোগে হিতকারী। মাত্রা ২ তোলা।

অণ্ড।—স্বাদু, কটু, রুচি-শুক্রকারক। বাত শ্লেষ্মা নাশক।

অঙ্গী, পেয়ারা। শীতল, স্বাদু গুরু, বায়ু পিত্ত, রক্ত, ক্রিমি, শূল, হৃৎপীড়া, কফ ও মুখরোগ নাশক।

ফল।—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, কফ, বায়ু নাশক, রুচীকারক।

অতসী।—উষ্ণ, তিক্ত। বাতহারক, শ্লেষ্মা পিত্ত কারক; বায়ু কফ, কাস নাশক মাত্রা ২ তোলা।

অতিবলা, পীতবর্ণ বেড়েলা।—তিক্ত, কটু, বাত, কৃমি নাশক। দাহ তৃষ্ণা তৃষ্ণা বিষ ও ছর্দ্দি নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অতিমুক্ত, তিনিশ বৃক্ষ।—কষায়, শীতল মস নাশক, পিত্ত, দাহ, জ্বর, উন্মাদ, হিক্কা ও সর্দ্দি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

অতিবিষা। • পাচক, গ্রাহী। কফ পিত্ত জ্বরনাশক। আমাতিসার নাশক, কাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক, কৃমিনাশক। মাত্রা ৩ রতি।

অত্যম্লপর্ণী লতাবিশেষ। বহ্নি পূরণ। প্লীহনাশক, বাতনাশক, অগ্নি রুচিকারক, শ্বাস শ্লেষ্মা রোগ নাশক।—মাত্রা ৩ মাষা।

অনন্তমূল।—মলবদ্ধকারী, রক্তপিত্তনাশক মাত্র ২ তোলা।

অন্ন। বুদ্ধি শুক্রকর, ইন্দ্রিয়বলকারক।

অপরাজিতা। হিম, তিক্ত। পিত্তোদ্রব ও বিষদোষ নাশক, চক্ষুরোগে হিতকারী, ত্রিদোষ সমতা কারক, শোথ কাস নাশক, কণ্ঠের হিতকারী। মাত্রা মূল ২ মাষ।

অপামার্গ। আপাঙ। তিক্ত, কফ নিবারক, অর্শ, কুণ্ডু উদরাময় ও বিষ নাশক; ধারক, কান্তিকারক। মাত্রা ৪ মাষা। ফলগুণ, স্বাদু, বায়ুকারী।

অহিফেন্ আফিং। সন্নিপাত নাশক, শুক্রবল ও মোহকারক। মাত্রা—॥০ রতি।

অভ্রক। আব্রব। রসায়ন, স্নিগ্ধ, বলবর্ণ-অগ্নিকারক, কুষ্ঠ, মেহ ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

অমৃত ফল, নাসপাতি। বৃষা।

মাষ, মাষ কলাই।

অমৃতস্রবা, রুদন্তি বৃক্ষ, লতাবিশেষ। রসায়ণ, ব্রণ নাশক, বিষ, কুষ্ঠ, আম, কামলা, শোথ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

অম্বষ্ঠকী, আকনদি, নিমুখা। অতিসার নাশক, ত্রিদোষ নাশক, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বাতপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, দাহ ও শূল নাশক ভগ্ন সন্ধানকারী মাত্রা ২ তোলা।

অম্বু শিরীষিকা জল শিরীষ বৃক্ষ। ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ, অর্শ নাশক।

অম্ল রুহা। রুচিকারক, দাহ নাশক, গুল্ম নাশক, আগ্নানাশক। উচ্চারণশক্তি-কারক, অম্ল লোনিকা, আমরুল। কফবায়ু নাশক, অগ্নিকারক, গ্রহণী রোগে হিতকারী।

কুষ্ঠ ও অতিসার নাশক। মাত্রা ২ তোলা হইতে ৩ মাষা।

অম্লবেতস—বায়ু নাশক, অর্শ, শ্রম, গুল্ম নাশক, অরুচি নাশক, প্লীহা নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

অরণ্য কার্পাসী। ব্রণ শস্ত্রক্ষত নাশক।

অরণ্য চটক। শুক্রকারক।

অরি, খদির ভেদ। রক্তপিত্ত নাশক।

অরিমেদ। শোথ ও অতিসার নাশক, কাস, বিষ, বিসর্প, নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

অর্ক, আকন্দ। কটু, উষ্ণ অগ্নিকারক, বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, কৃমিনাশক। কফ দোষ নাশক। মাত্রা মূল ৪ রতি হইতে ৬ রতি।

অর্ক—ক্ষীর। ক্রিমিদোষ ব্রণ নাশক। কুষ্ঠ, অর্শ, উদর রোগ নাশক, প্লীহা, গুল্ম, কাসনাশক। যকৃৎ নাশক। মাত্রা ২ রতি।

অর্জক, বাবুই তুলসী। কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, নেত্ররোগ নাশক, রুচি কারক, সুখ প্রসব কারক।

অর্জ্জুন বৃক্ষ। কষায়, উষ্ণ। ব্রণ শোধন কারক, কফ, পিত্ত, শ্রম, তৃষ্ণা, মেদ, মেহ-নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অলক্ত, লাক্ষা, আলতা। কফ, পিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, কুষ্ঠ, বিসর্প, কৃমি, ব্রণ ও ক্ষতনাশক।

অলাবু। তুম্বি লাউ। হৃদ্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা নাশক, বৃষ্য, রুচি কর, ধাতু পোষক, ভেদক ও পিত্ত নাশক।

অশোক। শীতল, হৃদ্য, পিত্ত, দাহ, শ্রম নাশক, গ্রাহী, গুল্ম নাশক, উদরাময়, নাশক, কৃমি নাশক, তৃষ্ণা নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

অশমন্তক, অরকুচাই। পিত্ত, প্রমেহ, তৃষ্ণা, বিদাহ, বিষম জ্বর নাশক। ছর্দ্দি নাশক ভূত নাশক, মাত্রা ৩ মাষা।

অশ্বকর্ণ, শালবৃক্ষ বিশেষ। লতা শাল— কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ। কণ্ডু নাশক। বিস্ফোটক নাশক মাত্রা ২ মাষা।

অশ্বগন্ধা। কটু, উষ্ণ, বলশুক্রকারী, বায়ু কাস, শ্বাস, জরাব্যাধি নাশক, শ্বিত্র নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

অশ্বত্থ। মধুর, কষায়, শীতল, কফ, পিত্ত নাশক, পক্ক ফল, যোনিদোষনাশক,দাহ ছর্দ্দি, শোথ, অরুচি নাশক, অম্ল পিত্তনাশক। মাত্রা ছাল ২ তোলা, বীজ ৯ রতি, ফল ১০ মাষা।

আসন পিয়াশাল। কটু, উষ্ণ, তিক্ত। কফ, পিত্ত নাশক, গলদোষ ও রক্ত মণ্ডল নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অস্থি সংহার, হাড়জোড়া। বালাস্থি ভগ্ন হিতকরী, বায়ু নাশক, বাতশ্লেষ্মা, ও অক্ষি রোগ নাশক, কৃমি নাশক, অর্শ নাশক, বৃষ্য, মাত্রা শুষ্ক চূর্ণ ১৮ রতি।

আকাশ মাংসী, সূক্ষ্ম জটামাংসী। হিম, শোথ, ব্রণ, নাড়ী রোগ নাশক। সুতা, জ্বালাহারক, বর্ণকারী। মাত্রা ১ মাষা।

আকাশবল্লী, লতাবিশেষ, মধুর, কটু। পিত্ত নাশক শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, বলকারী। মাত্রা ৩ মাষা।

আখুকর্ণী, লতা বিশেষ। কটু, উষ্ণ। কফ পিত্ত নাশক, সারক, আনাহ,জ্বর শূল নাশক, পরম পাচক, কৃমি নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

আখোট, আকরোট। বলকারী, মধুর, স্নিগ্ধ। বাত পিত্তনাশক, রক্ত দোষ নাশক।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ ব্যবহার বিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল এল, এম, এস প্রণীত। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ৩।০ টাকা। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে মেডিকেল জুরিস্ প্রুডেন্স অবশ্যই শিক্ষা করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে এতদিন সেরূপ শিক্ষার অভাব ছিল —এই গ্রন্থখানির প্রকাশে সে অভাব পূর্ণ হইল। সহজ কথায়, সরল ভাষায়, অতি সুন্দরভাবে বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার দেব বাবু চিকিৎসক মাত্রেরই উপকার করিয়াছেন। অপঘাতাদি আকস্মিক বিপদে কিরূপ কর্ত্তব্য অবলম্বন আবশ্যক, এগ্রন্থে তাহা জানিতে পারা যাইবে। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মূত্রতত্ত্ব।—কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, এইচ, এম, বি, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত। ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। মূত্রপরীক্ষা ও মূত্র রোগের চিকিৎসাবিধি এলোপাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় তিন প্রকার মত অবলম্বনে যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকার এ পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার পরিশ্রম সার্থকই হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা সত্য সত্য এগ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি।

রতিযন্ত্রাদির পীড়া।—ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মৈত্র প্রণীত। মূল্য ৪৲ টাকা। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে দেশের বালক ও যুবক বৃন্দ কিরূপ ভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে তাহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাহার ফলে শুক্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়ার কথা ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার চিকিৎসা বিধি এ পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। এধরণের গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বড়ই প্রশংসনীয়। আগে ইহার সভাগৃহেই মাসিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে কলেজ স্কোয়ারের সাধারণ স্থানগুলিতে সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করায় আয়ুর্ব্বেদের কথা সাধারণকে জানান হইতেছে। ইহাতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে। প্রতিমাসে 'ভবিষ

সভা.যা'র ব্যবস্থায় এই সভা যেভাবে ব্যাধি-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তদ্বারা যথেষ্ট উপকার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেরই এই সভায় যোগদানকরা কর্ত্তব্য।

কালাজ্বর।—কালাজ্বরের তত্ত্ব নির্ণয় ও তাহার চিকিৎসাবিধি স্থির করিবার জন্ত এখন যেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও সেইভাবে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ সভাই এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। কলিকাতা করপোরেসনের সাহায্যে এজন্ত কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদীয় ওয়ার্ড খুলাইবারও চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সুযোগ্য কমিশনারের হস্তে করপোরেসনের কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, তাঁহাদের এ প্রয়াস সফলই হইবে। আয়ুর্ব্বেদের মতে কালাজ্বর—বিষমজ্বরেরই শ্রেণী বিভাগ মাত্র, বিষম ও জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ আছে, সেরূপ আর কোন চিকিৎসায় নাই। কলিকাতা করপোরেসন যদি আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় কালাজ্বরের ওয়ার্ড খুলিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তদ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়টির এ বর্ষের নূতন সেসন যথা কালেই আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বর্ষে ছাত্র সংখ্যাও যেরূপ হয় এবারও সেইরূপ হইয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়টির কার্য্যও অতি সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবার এসময় কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও এখানে কিন্তু রোগীর সংখ্যা কম হয় নাই, মেডিকেল ও সার্জ্জিকেল—উভয় বিভাগে এই চিকিৎসালয়ের রোগী সংখ্যা প্রত্যহ ৮০ হইতে ১০০ শত হইতেছে। এই চিকিৎসালয় হইতে কলিকাতার উত্তর পল্লী অঞ্চলের যে বিশেষ উপকার হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত।

আয়ুর্ব্বেদ কমিটি :—গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত আয়ুর্ব্বেদ কমিটি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আশান্বিত হইয়াছি। প্রায়ই ইঁহারা পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। রাজকীয় সাহায্যের অভাবেইতো এতদিন আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারে নাই, এখন যদি সে সাহায্যের অভাব না হয়, তাহা হইলে ইহার পুনরুন্নতি হইতে যে বেশী সময় লাগিবেনা তাহা নিশ্চয়ই। সংপ্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে যেরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন, তাহাতে সেই চেষ্টার সহিত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মিলিত হইলে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্য অতি সহজেই সিদ্ধ হইতে পারিবে।

কলিকাতা ১৯নং গোয়াবাগান ঈশ্বর মিলের লেন বিষ্ণু প্রেস হইতে কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩১। | ১২শ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ)

সম্মানসভাপতি ও সম্মাননীয় সভ্যমহোদয়গণ। আয়ুর্ব্বেদ সভার কতিপয় সভ্যমহোদয়ের অনতিক্রমণীয় আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আজ আমি এই অকিঞ্চন সন্দর্ভের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ক প্রবন্ধ বর্ণনার ভার অর্পিত না থাকায় নিজবুদ্ধি-বিচারক্রমে যে বিষয়টী নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রথমেই অনানুষঙ্গিক দুই একটী কথা ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। বর্ত্তমান সভায় আমার বর্ণনীয় বিষয় "আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।" বিষয় নির্ণয়ান্তে রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই অন্তঃকরণে একটা সংশয়জনিত অন্তরায় উপস্থিত হইল, ঈদৃশ প্রবন্ধের প্রয়োজন কি? অত্রত্য সভাসদ্ মহোদয়-বৃন্দ মধ্যে সকলেই বৈদ্যকশাস্ত্রী, আমার বক্তব্য কোন কথাই তাঁহাদের অগোচর নাই, সুতরাং ইহা তাঁহাদের পক্ষে পুরাতন, অতএব নিষ্প্রয়োজন। অপর পক্ষে যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্যকপ্রতিপক্ষ। তাঁহারা যে ইহাতে মনঃসংযোগ অথবা বক্তব্যের যৌক্তিকতা অবধারণ করিবেন এমত ভরসা করিনা। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বৈফল্য বুঝিয়াও মাত্র একটী কারণে এই ব্যর্থ প্রয়াসে

* আয়ুর্ব্বেদ সভার অধিবেশনে পঠিত।

উন্মত্ত হইয়াছি। এ প্রবন্ধে অসাধারণ মনীষাশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রতিপক্ষগণ উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও কোন ক্ষতি মনে করি না, কিন্তু এদেশে সাধারণ জনের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা যদি কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ইহাদ্বারা একটুও অবলম্বন প্রাপ্ত হয়েন,তাহাই আমার সাফল্যের প্রধান নিদর্শন হইবে।

বৈদ্যকানুশীলনকারী অথবা আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে "আয়ুর্ব্বেদ" অথর্ব্ববেদেরই অঙ্গবিশেষ, অতএব অপৌরুষেয়. আমাদের অদূরদর্শি-বুদ্ধিতে অপৌরুষেয় বস্তুর ধারণা হয় না। সত্য,তথাপি আয়ুর্ব্বেদ যে সাধারণ পুরুষ প্রণীত নহে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কোন্ যুগে কোন্ সর্ব্বশক্তিশালী মহাপুরুষ ইহার প্রণয়ন করেন তাহার নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশব্যক্তির পক্ষে পণ্ডশ্রমমাত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রারম্ভ পরিচয়বিষয়ে "ব্রহ্মাস্মৃত্বায়ুষোবেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ" এই আর্ষবাক্যই দেখিতে পাই। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদকে স্মৃতিবলে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপতিকে শিক্ষাদান করেন, অনুভূত বস্তুরই স্মরণ সম্ভাবনা, সুতরাং তৎপূর্ব্বেও যে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ছিল ইহা ঐ উক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষান্তরে 'স্মৃ' ধাতুর যদি জ্ঞানার্থ গ্রহণ করা যায়, তবে স্বয়ং অর্থে অবগত হইয়া এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞতা বশতঃ তিনি আপনা হইতেই আয়ুর্ব্বেদ আবিষ্কৃত করিয়া প্রজাপতিকে উপদেশ দান করেন। এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে, ইহাতেও আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডিত হয় না, যেহেতু ব্রহ্মা পুরুষাতীত। এতৎসম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার আবশ্যকতা নাই, কারণ আমরা লৌকিক আয়ুর্ব্বেদেরই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত। সংসারে যখন আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম প্রচারণার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহার পরও বহুসহস্রবৎসর অতীত হইয়াছে। উক্ত সময়কেই যদি আয়ুর্ব্বেদের প্রারম্ভকাল নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে তৎসমকালে অথবা তৎপরবর্ত্তী ২।১ সহস্রবর্ষ মধ্যে যে অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত ছিলনা ইহা প্রত্নতত্ববিদ্‌গণই স্বীকার করেন। জগতে বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রথম প্রচারকালীন ইতিবৃত্তের আলোচনায়ও এবিষয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। যেকালে ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্বের নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই,সেই অতি প্রাচীনকালীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় অবগত হওয়া যায়, যে, তখন ও এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানাধিকারী, তপস্যাপরায়ণ, মহিমশালী মানব মণ্ডলী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরমসুখে শান্তি এবং সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের সহিত কাল যাপন করিতেন। মানসিক শক্তিপ্রভাবে ও প্রকৃতির অবস্থার সম্যক্ অনুশীলনে তাঁহারা এতই সিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন যে, ধাতুবৈষম্যজনিত ব্যাধি প্রায়শঃই তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইত না। তৎকালে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মানুসরণে উচ্চ বর্ণের অধিকাংশ লোকই অল্পাধিক যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন; ঐ যোগ ও তপোবলে আর্য্যগণ প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন, রজস্তমোময় পাপ স্বভাব ব্যাধি তাঁহাদের

অপস্পর্শ করিতে পারিত না। সাময়িক ব্যতিক্রমবশতঃ যদ্যপি কদাচিৎ কোন রোগ উপস্থিত হইত কিন্তু তখনই তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তিপ্রভাবে তাহাকে শক্র বোধে দূরীভূত করিতে পারিতেন। অতএব তৎকালে রোগ প্রতীকার জন্য কোন অনুশাসনের আবশ্যক হইত না। সুতরাং তখন প্রয়োজনাভাব বশতই আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ছিল না। ইহাই অনুমান সিদ্ধ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী বিষয়ই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কোন দেশে, কোন ব্যক্তিরই এতদ্ব্যতীত কাম্যবস্তু থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্যসম্পন্ন দীর্ঘজীবন লাভই উক্ত চতুর্ব্বর্গলাভের প্রধান উপায়; সেই জন্যই পূর্ব্বকালে দেহরক্ষার জন্য নানাবিধ যোগ প্রাণায়ামাদি কতকগুলি সদনুষ্ঠান নিত্যক্রিয়ারূপে সমাজে প্রচলিত ছিল। উহাদ্বারা যেমন মানসিক একাগ্রতা সাধিত হইত, ধাতু দির পুষ্টি, ও স্থৈর্য্যকারিতা গুণে শরীরও তদনুরূপ সবল ও কর্ম্মক্ষম হইত। দুরতিক্রমণীয় কাল প্রভাবে, মানবগণ যখন অলসতা, অধৈর্য্য এবং ভোগবিলাসাদি দোষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক ও মানসিক শক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হইতে লাগিল, এবং নিজের স্বভাব বলে, ঐ অবনতির পথ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারিল না, তখনই দেহরক্ষার নিমিত্ত অস্বাভাবিক উপায়ের অবলম্বনে বাধ্য হইল। তখন সর্ব্ববিভূতিশালী মহাযোগী সিদ্ধমহর্ষিগণের বিশ্বপ্রেমপ্রবণ, পরহিতময় প্রাণ এই আকস্মিক অকল্যাণকর, কলুষ স্বরূপ ব্যাধির বিশ্বধ্বংসকর পরাক্রমে একান্তই কাতর হইয়া উঠিল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শান্তি নিকেতন, পবিত্র সংসার ক্ষেত্রে রোগ-রাক্ষসের ক্রূরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব, অচিরাৎ ইহার প্রতিকার আবশ্যক, নতুবা মানবের সুখ শান্তি রক্ষার কোনও উপায়ান্তর নাই। লোকহিতব্রত মহর্ষিগণের এই দূরদর্শি চিন্তাই সংসারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রসূতি। অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন দিব্যশক্তিশালী মহর্ষিমণ্ডলী স্বয়ং আধিব্যাধি মুক্ত; কিন্তু জগতের হিতানুষ্ঠানই তাঁহাদের জীবনব্রত সুতরাং সংসার রক্ষার্থ তাৎকালিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা প্রাকৃতিক শান্তিময়, নির্ব্বাধ, দেবভূমি হিমাচলের এক নিভৃত পার্শ্বদেশে সমবেত হইয়া কোন উপায়ে রোগরাক্ষসের করাল কবল হইতে সংসার রক্ষিত হইবে, এতদ্বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য পরস্পরের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সমিতিতে তৎকালীন বিশ্ববিশ্রুত, জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর, স্বাধ্যায় তপঃসম্পন্ন, মহর্ষি মণ্ডলীর সমস্ত সম্প্রদায়ই প্রায় সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলেই মহর্ষিগণ স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপনের নিমিত্ত ধ্যানাবলম্বী হইলেন। কি মোহন দৃশ্য! কোন বাক্ বিতণ্ডা নাই, পরস্পরের জিগীষা প্রণোদিত পাণ্ডিত্যাভিমান জনিত প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতার আড়ম্বর নাই, সকলেই ধ্যানাস্তিমিত লোচন, স্থাণুবৎ স্থির ও ধীরভাবে নিজ নিজ নির্ম্মল অন্তঃকরণ-দর্পণে কর্ত্তব্যাংশের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। আজন্ম সৎশিক্ষা,

ত্যপথানুসরণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানানুশীলনাদি মঙ্গলময় ব্রতে নিরত থাকায়, তাঁহাদের অন্তঃকরণে, রাগদ্বেষাত্মক কোন বিকারই অধিকার পাইত না। অতএব তাঁহারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তিকেই কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতেন। কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অনুসারেই তাহার নিরাকরণ করিতেন। তাঁহাদের মলমুক্ত মানস মুকুরে যাহা প্রতিফলিত হইত, তাহা অভ্রান্ত ও সিদ্ধান্তরূপেই পরিগণিত হইত। মিথ্যা, ছলনা, ঈর্ষ, দ্বেষহিংসাদি তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত ছিল না অথবা অশিক্ষাজনিত কোনরূপ কুসংস্কার ও তাঁহাদের প্রতিভা-প্রদীপ্ত হৃদয়ে স্থান পাইত না। কর্ত্তব্য-বোধে জগতের হিতার্থে তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই শাস্ত্র। যে পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহাই বিশ্ববাসীর অবলম্বনীয় সৎপথ ছিল। তাঁহারা যখন সমাধিযোগে জ্ঞাননেত্রে কর্ত্তব্যপথ অব-লোকন করিলেন, তখনই অপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া সকলেই সমকালে একই অভিমত প্রকাশ করিলেন। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূলীভূত কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষের অপহর্ত্তা এবং জীবনের প্রধান বিঘ্ন স্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলের ধ্বংসকারী রোগাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদই একমাত্র উপায়। উক্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে হইলে অমরপতি ইন্দ্রদেবই আশ্রয়ণীয়। সুরনাথ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অনুকম্পা হইলে ইহলোকে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইবে, তাহাতে সংসার স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া সুখ শান্তি সহকারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। এইরূপ পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্রণী হইয়া ইন্দ্রদেব-সমীপে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালাভের জন্য নিজের সমুৎসুকতা জ্ঞাপন করিলেন। অপরাপর ঋষিগণও সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন ভরদ্বাজকে যোগ্য-তম বিবেচনা করিয়া তৎপ্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ দেবেন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলে দেবরাজ তাঁহার সদুদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যসাধনযোগ্য বিপুল বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শিষ্যের জ্ঞান ও প্রতি-ভার গৌরবানুসারেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ফলাফল নির্ভর করে। স্থূলবুদ্ধি ব অল্পমতি শিষ্যকে সাধারণ বিষয় বুঝাইতে ও আচার্য্যের যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজকে, দেবরাজ যে ভাবে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানকালে মহা মনীষীগণেরও বিস্ময়জনক। সুরপতি কতিপয় পদ নিবদ্ধ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের তিনটী মূল সূত্র মাত্র মহর্ষিকে উপদেশ দেন। সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা হেতু, স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় এবং পীড়িতের পীড়া হেতু, ব্যাধির রূপ ও চিকিৎসা, ইহাই ঐ তিনটী মূল সূত্রের তাৎপর্য্য। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই গূঢ়ভাবে উক্ত মূল সূত্র তিনটীর অন্তর্নিহিত। মহামুনি ভরদ্বাজ স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে, ঐ মূল সূত্র তিনটীর অনুসরণ করিয়া সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিদিগকে শিক্ষা দেন, এই তিনটী মূল সূত্রে নিবদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিশাল পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রনয়ন করা কিরূপ গভীর গবেষণা ও বিপুল জ্ঞানের ফল, তাহা আমাদের ন্যায় ব্যক্তির ধারণার অতীত। মহামাহমমণ্ডিত মহর্ষিগণ কিরূপ অলৌকিক প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই সমস্ত প্রমাণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয়ই আমাদের প্রতিপাদ্য, এখানে তৎসম্বন্ধেই ঋষিদের দিঙ মাত্র প্রতিভার কথা বর্ণিত হইল; বস্তুতঃ জগতের আদিম, অভ্রান্ত, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানাত্মক, ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রই চিরপুজ্য, সেই মহাত্মাদগণের সমাধিসিদ্ধ, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফল। এই প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব সন্দর্শনই উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত প্রবন্ধ মুখেই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন, প্রচার-পদ্ধতি ও প্রচারকের স্বাধিকারে যোগ্যতার খ্যাপন, আবশ্যক মনে করিয়া এই ভূমিকার অবতারণা করিলাম। আশা করি ইহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষণই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম উদ্দিষ্ট বিষয়, যথা নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য চর্য্যাপরায়ণ মানবের ধাতুসাম্য রক্ষিত থাকে এইজন্য সহসা কোন শারীর ব্যাধি জন্মিতে পারে না। রোগ প্রতিকারার্থ চিকিৎসা বিধানের আবশ্যকতা সত্য, কিন্তু যে উপায়ে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে না পারে তাহা তদপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। বৈদ্যক শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রায় প্রাকৃতিক অবস্থার তত্ত্বানুশীলন ও তদুপযোগী আচরণ দ্বারা দেহ ও মনকে সবল রাখিার বিধান দেখা যায়। সাধারণতঃ তাদৃশ আচরণই স্বাস্থ্য রক্ষার মূল। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, প্রকৃতি, সাত্ম্য, শীতোষ্ণাদি দেশগত বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসুখ সহসা ব্যাহত হয় না। তাঁহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া দুর্লভ জীবনের সম্ভাব্য কর্ম্মানুষ্ঠানের আশানুরূপ অবসর প্রাপ্ত হন। এস্থলে প্রমাণ স্বরূপ শার্ঙ্গধরের কতিপয় সুভাষিত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিনকালে, সন্তি পুনরধিকবর্ষশতজীবনোমনুষ্যাঃ, তেষাং বিকৃতিবর্জ্জ্যৈঃ প্রকৃত্যাদিবলবিশেষৈঃ আয়ুষোলক্ষণতশ্চ প্রমাণমুপলভ্য বয়সঃ ত্রিত্বং বিভজেত"।

এই উক্তিতে আমরা বিকারবর্জ্জিত প্রকৃত্যাদির বল বিশেষের দ্বারা বর্ত্তমান-কালে নির্দ্দিষ্ট শতবর্ষাধিক পরমায়ু লাভ করা যায় এবং তাদৃশ দীর্ঘজীবী লোক সংসারে বহুসংখ্যক আছেন ইহা জানিতে পারি। এখানেও এবম্বিধ দীর্ঘজীবন লাভের স্বাস্থ্যচর্য্যাই হেতু বুঝা যাইতেছে, প্রকৃতির অনুকূল বিবিধ অনুশীলনেই বিকৃতিকে বর্জ্জন করা যায় এবং উহাই স্বাস্থ্যচর্য্যার মূল সূত্র। এই প্রসঙ্গেই উক্ত গ্রন্থে পুনরুক্ত হইয়াছে—

তত্র শারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভি

ক্রতস্থ জ্ঞান বিজ্ঞানস্থিরেন্দ্রিয়ার্থ বলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য রুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধ সর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্ট বিচরণাৎ সুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ। হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণঃ অপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতং উপসেবমানস্য পূজার্হ সম্পূজকস্য জ্ঞান বিজ্ঞানোপশমপরস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদান পরস্য তপোজ্ঞান প্রশম নিত্যস্য অধ্যাত্মবিদস্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাবেক্ষমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতমতো বিপর্য্যয়েণ, অর্থেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি চেষ্টাদীনাং বিকৃতিলক্ষণৈরুপলভ্যতে।" সাধারণ জনের বোধগম্যার্থ উক্ত বাক্যসমূহের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল। যাহারা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি মুক্ত, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন, বিবিধ রুচিকর ভোগ সম্ভোগকারী, সমুন্নত কর্ম্মশীল তাঁহারা শান্তি সহকারে জীবন অতিবাহিত করেন। ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে রত হইলেই জীবিতকাল ক্লেশের হেতু হয়। সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলে নিরত, পরবিত্তে লোভহীন, সত্যভাষী, সম গুণাবলম্বী, সদ্ অসদ্ বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যকারী, অবহিত চিত্ত, পরস্পরের অপ্রতিবন্ধকভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবাপরায়ণ, পূজ্যজনের পূজাকারী, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শান্তির আশ্রয়ী, বৃদ্ধজনসেবী, রাগ, ঈর্ষা, মত্ততা ও গর্ব্বহীন, দান তৎপর, নিত্য তপোজনিত শান্তি পরায়ণ, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্, অধ্যাত্মবোধানুসারি কর্ম্মরত, ঐহিক ও পারত্রিক বিধির প্রতি অভিনিবিষ্ট এবং হিতবিষয়ে স্মরণশীল, ঈদৃশ মহাত্মাগণ হিতায়ুসম্পন্ন হইয়া সুখ শান্তির সহিত দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি চরক ও বলিয়াছেন—

"বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণং অস্মিন্‌কালে, তস্যনিমিত্তং প্রকৃতিগুণাত্মসম্পৎসাত্ম্যোপসেবন ঞ্চেতি।"

বর্ত্তমান কালে জীবিত কালের পরিমাণ শতবর্ষ। প্রাকৃতিকগুণ, আত্মনিষ্ঠা ও সত্য ব্যবহারই দীর্ঘায়ুরক্ষার হেতু। এই সব উক্তিতেও আমরা দেহধারণের ও নির্ব্বাধ জীবন যাত্রার জন্য স্বাস্থ্যচর্য্যারই প্রাধান্য দেখিতে পাই। অধ্যাত্ম্য বিষয়ক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, বিশেষ জ্ঞান ও কষ্টকর অভ্যাস-সাপেক্ষ, কিন্তু অন্যান্য যে সকল শারীর বিজ্ঞানের কথা এই সব প্রস্তাবে উক্ত আছে, তাহা পালনকরা কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কোন ঋতুতে কোন দোষের প্রবলতা হয়, ঐ দোষের উপশমের জন্য তৎকালে কিরূপ আহার বিহারাদি কর্ত্তব্য, কোন্ প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে কোন কোন দ্রব্য পথ্য বা অপথ্য, কোন দ্রব্যসহযোগে কোন দ্রব্যের ভোজন বিরুদ্ধ অথবা কোন বস্তু লঘুপাকী হয়, দিবারাত্রের মধ্যে কোন সময়ে কোন দোষের প্রকোপ হয়, মধুরাদিষট্ রসের পৃথক পৃথক গুণ কর্ম্ম প্রকৃতিভেদে উহাদের বিধি নিষেধ, কোন রস কোন দোষের বর্দ্ধক বা প্রশমক ইত্যাদি নিত্য স্মরণীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলি বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রায় প্রতিগ্রন্থেই সবিস্তার বর্ণিত আছে। স্বাস্থ্যকামী মনোযোগ পূর্ব্বক তত্তৎ বিষয়ের আলোচনা ও অনুবর্ত্তন করিলে ব্যাধির আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি অগ্নিবেশের

কোন উপায়ে রোগোৎপত্তির নিবৃত্তি হয়" এই প্রশ্নোত্তরে বলিয়া ছিলেন—শরীর ও মনই রোগের আশ্রয়স্থল, রোগোৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি নিত্য নিয়মিত প্রতিক্রিয়াদ্বারা দেহ ও মনকে বিশুদ্ধ রাখা যায় তাহা হইলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি শীতকালের সঞ্চিতদোষ বসন্তে, গ্রীষ্মসঞ্চিত দোষ বর্ষায় এবং বর্ষাসঞ্চিত দোষ শরৎকালে নির্হরণ করে, ঋতু জনিত ব্যাধি তাহাকে অভিভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি হিতকর আহার বিহার সেবী, সমীক্ষ্যকারী বিবেক-সম্পন্ন, অনাসক্তিসহ বিষয় ভোগী, সত্যবান্, ক্ষান্তিশীল, আপ্তসেবী, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, মহর্ষি প্রভৃতি পূজ্যজনের অর্চ্চনা তৎপর, সে ব্যক্তি নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন যাপন করে। যাহার জ্ঞান, তপস্যা, যোগতৎপরতা, পবিত্র বুদ্ধি, মন ও কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, সে ব্যক্তি কদাপি রোগাক্রান্ত হয় না। প্রাতঃ কালীন শয্যাত্যাগ হইতে নৈশশয্যা গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত যে সময়ে যে ভাবে যে সমস্ত দেহমনের সর্ব্বথা হিতকারী, আধিব্যাধির যাতনা নাশক অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য নৈমিত্তিক স্বাস্থ্যচর্য্যাবিধি বৈদ্যক শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ঐ সকল সহজসাধ্য নিয়মের পালন পক্ষে সংসারে কোনই প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় না। অথচ উহার অনুসরণে আমাদের মানবজীবনের শ্রেষ্ঠকাম্য স্বাস্থ্যসম্পদ রক্ষিত হয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সামান্য এবিষয়ের উপযোগিতা দেখাইতেছি। ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎবৎসর পূর্ব্বেও শিশুগণের জন্মগ্রহণের পর হইতে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে পরিণত বয়সেও উক্ত বালকগণের দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকিত। আমি নিজেই একজন এই বিধির দৃষ্টান্তস্থল। শৈশবে চোখে কাজল দিবার কথা অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। কারণ ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও অঞ্জন দিবার উৎপাত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বালোচিত যে সব উপায় অবলম্বন করিতাম ও পরিশেষে মাতৃদেবীর কঠোর শাসনে নিরুপায় হইয়া অঞ্জন লইতে বাধ্য হইতাম, তাহা সহজে ভুলিবার বিষয় নয়। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আজ এই প্রায় ষাট বৎসর বয়সেও যে দৃষ্টি-শক্তি অপ্রতিহত আছে ইহা সেই সদনুষ্ঠানেরই ফল। এপর্য্যন্ত কোন দিন আমি নেত্রাময়ে আক্রান্ত বা দৃষ্টিশক্তিহীনতার জন্য চশমা লইতে বাধ্য হইনাই। এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থনকরা এক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং সম্ভবপর ও নয়, কর্ত্তব্য বোধে নিত্যপালনীয় কতকগুলি স্বাস্থ্য বিধির উল্লেখ করিতেছি, যাহা প্রতিগৃহে প্রতিদিনই পালনীয়। যথা—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতঃ শৌচবিধি সমাপন করিবে, তাহার পর আকন্দ, বট, খদির, করঞ্জ, অর্জ্জুন, করবীরাদি তিক্ত ও কটু ও কষায় রসযুক্ত বৃক্ষের কোমল অগ্রভাগ দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিবে। ইহাতে দন্ত মলহীন সুসম্বদ্ধ ও দন্তমূল সুদৃঢ় হয়। এই হিতকারী অথচ অনায়াসসাধ্য বিধান ত্যাগ করিয়া আমরা আজকাল যৌবনাগমনের পূর্ব্বেই দশনহীন বা দন্ত বেষ্টগত রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন যাপনের প্রধান অবলম্বন আহার সুখে বঞ্চিত এবং অজীর্ণাদি রোগাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছি। এইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন,

পাচকাগ্নি রক্ষণ, ভ্রমণবিধি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট বিধান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে এখন ঐ সকল বিধান প্রায়ই যথাযথ ভাবে পালিত হয় না, তাহার ফলে দেশের স্বাস্থ্য দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। এক শতাব্দি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় লোকের যেরূপ বল, বীর্য্য, দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য সম্পদ দেখা যাইত আজ কাল সেরূপ প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না, ইহার প্রধান কারণ, আমরা আমাদের প্রকৃতি সিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে হঠকারিতা দোষে অতিক্রমণ করিতেছি। স্নান, আহার, বিহার, বেশ, ভূষা, শয়ন, আসন এমনকি হাস্য, ভাষাদি পর্য্যন্ত এ দেশে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিধির অনুসরণেই বিহিত হইতেছে। বিরুদ্ধ ভোজন, অকালে ভোজন নিষিদ্ধ ভোজন, অতৈল ও অসময়ে স্নান, প্রকৃতি বিরুদ্ধ বেশভূষা, অসমভাবে শয়নাসন, উগ্রবীর্য্য ধূমপান, অসাস্থ্যকর মাদক সেবন, অস্থানে হাস্যভাষ্যাদি, শরীরের পক্ষে কত অনিষ্টকর, তাহা কেহই চিন্তা করেন না, অথবা তদ্বিষয়ক কোন সংস্কার না থাকায় চিন্তার অধিকারী ও হইতে পারেন না। পূর্ব্বকালে আহার বিহারাদি দ্বারা শরীর স্বাস্থ্য সম্পন্ন, দীর্ঘকালস্থায়ী, বলিষ্ঠ ও শ্রম সহিষ্ণু হইত এখন আহার বিহারাদি দোষে শরীর চিররুগ্ন, ক্ষণভঙ্গুর, অধৈর্য্যশীল ও দুর্ব্বল হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদ -বিধির অবমাননাই ইহার প্রধান হেতু। কার্য্য কারনালোচনায় একথা স্পষ্টতই প্রতীত হয়। আজকাল সামান্য কারনেই ঘরে ঘরে যে এত রোগের প্রাদুর্ভাব ইহাই তাহার কারণ। বাতুকী·তা, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, বহুমূত্র, ক্ষয়, বিষমজ্বর প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের দেশকে যেরূপ ভাবে আশ্রয় করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে, কোন্ হৃদয়বান, দেশপ্রেমিক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। উক্ত ব্যাধি সকল একবারে নূতন নহে, কিন্তু প্রাচীন কালে ঘরে ঘরে, জনে জনে, এরূপ পরিদৃষ্ট হইত না। স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির অবহেলা ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ, পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ ইহার প্রধান হেতু; এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ প্রতীকারা-পেক্ষা স্বাস্থ্যচর্য্যাই অধিক আবশ্যকীয় বলিয়া প্রথমোদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ প্রাকৃতিক রীতির অতিক্রমই রোগোৎপত্তির কারণ। যদি আমরা সাবধানে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে সহসা কোন দুঃসাধ্য ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারেনা। সংসার ক্ষেত্রে নানা জাতীয় কর্ত্তব্যে নিবদ্ধ মানবের পক্ষে যথাশাস্ত্র স্বাস্থ্য বিধির অনুসরণ অবশ্য সহজ সাধ্য বা সম্ভবপর নয়, এবং কোন কালেই কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে, যে অধুনা আমরা ক্ষমতা সত্বেও অজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধাবশে যেরূপ ভাবে, সেইসব হিতকারী, সনাতন রীতির লঙ্ঘণ করিতেছি, প্রাচীনকালে কখনই সেরূপ হইত না। তখন সামাজিক রীতিবশে বা ধর্ম্মহানি ভয়ে লোক আহার, বিহার, স্নানাদি বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত থাকিত। আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে আমরা ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিতেছি কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, উহা আমাদের অস্থি মজ্জাগত, বংশানুক্রমিক পরম সম্পদ, প্রকৃতি শক্তির সর্ব্বথা অনুকূল,

ইচ্ছা বা অনিচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিবার বিষয় নহে। যে জল মাটিতে আমরা গঠিত, যে সমাজ, যে ধর্ম্মানুশাসন, যে আহার-বিহার-পরিচ্ছদাদিতে আমরা অভ্যস্ত, তদবলম্বনেই বৈদ্যক-শাস্ত্র প্রণীত, কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার বা রোগ-প্রতীকারে উহা আমাদের সর্ব্বাংশে উপযোগী। মোহমুগ্ধ হইয়া আমরা যে পরিমাণে ইহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি, ঠিক সেই হিসাবেই স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগ-যন্ত্রণা আমাদিগকে জর্জ্জরিত এবং অকর্ম্মণ্য করিতেছে। জানিনা, কতকালে আমাদের এ মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। নিজের গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত অযত্নসুলভ, অমূল্য রত্নকে অবহেলায় বর্জ্জন করিয়া, আমরা বহুসহস্র-ক্রোশস্থিত, পাশ্চাত্য দেশসম্ভূত দুর্লভ কাচ-খণ্ডের প্রতি আসক্ত হইয়া নিজেকে ও স্বদেশকে দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যের পথে চালিত করিতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, গভীর গবেষণা মূলক বা বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে, আমি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি বা তদ্বিষয়ে আমার কোন অধিকার নাই, কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট বস্তু যে জগতের সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় বা আদরণীয়, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করিনা। বৈদ্যিকশাস্ত্রবিধি, ভারতের পক্ষে যত অনুকূল, অপর দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সেরূপ হইতে পারে না। জড়জগতের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এ বিষয়ের যৌক্তিকতা বুঝিতে পারি। যে দেশে, যে জল-মাটীর গুণে, যে সকল তরুলতা গুল্মাদি বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, বিবিধ ফলপুষ্পাদি পরিশোভিত হয়, ভিন্ন দেশীয়—ভিন্ন প্রাকৃতিক জলমাটির সহযোগে কদাপি সেরূপ হয় না। কারণ, ভিন্ন দেশজ ভিন্ন প্রাকৃতিক জল-মৃত্তিকাদি ঐ জাতীয় তরুলতা-গুল্মাদির প্রকৃতির সমধর্ম্মী নহে। পৃথক্ পৃথক্ দেশজাত, জলমৃত্তিকাদির প্রকৃতির সহিত তত্তৎ দেশীয় জীবজন্তু তরুলতাদির প্রকৃতি যেমন সম্বন্ধযুক্ত, তেমনই তত্তজ্জ দেশজাত আহার্য্যবস্তু বা ভেষজ দ্রব্যের সহিত ও সমধর্ম্মিতা-গুণে সম্পর্কিত। এই নিমিত্তই আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"যস্য দেশস্য যো জন্তু স্তজ্জং তস্যৌষধংহিতং"

যে প্রাণী যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহার পক্ষে সেই দেশ জাত ঔষধই হিতকারী। ইহা নূতন নহে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ সত্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানে এ সত্যকে আজ সেই আর্য্য মহর্ষিগণের বংশসম্ভূত ভারতীয় লোক অবহেলায় অবমানিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দেশবাসীর পক্ষে পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? দেশের এই দুর্দ্দশার কারণ একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষায়, মানুষকে ও সমাজকে উন্নত করে, সমাজের অভাব বা কুসংস্কারকে দূরীভূত করিয়া সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ করে, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের পক্ষে ইহার বিপরীত ফলই প্রসব করিতেছে। এই শিক্ষা-প্রভাবে, আমরা জাতীয়জীবনহীন স্বধর্ম্মচ্যুত পরনির্ভরশীল; অধিক কি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরের ইচ্ছানুসারে পরের কার্য্যেই চালিত হইতেছি। যাদুকরী বিদ্যার মত এই মোহিনী শিক্ষার মোহে আমরা এতই আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের জাতীয় জীবন কোন্ উপাদানে গঠিত, কোন

ধর্ম্ম, কোন কর্ম্ম, কিরূপ আহারবিহারাদি, আমাদের প্রকৃতির অনুকূল, অথবা ইহাদের কোন গুলি কি কারণে আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এসব বিষয়েরও অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করি না। শীতপ্রধানদেশজাত, রাজবিধির অনুশাসনে, আমরা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত আছি, বুদ্ধির ভ্রমে বা অনুকরণপ্রিয়তা-দোষে, অস্বাস্থ্যকর বুঝিয়াও ঐ সব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয় আলোচন করিলে ইহার একটা দৃষ্টান্ত বুঝা যাইবে। জাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের গৌরবের বিষয়, তৎ-সমস্তই নব্য শিক্ষাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এস্থলে তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে, কিন্তু ঐ শিক্ষাস্রোতে যে দেশের আশা ভরসা-স্থল, যুবক ও বালকগণের স্বাস্থ্য সম্পদ দূরী-ভূত হইতেছে, তাহা উপেক্ষা করা কষ্টকর। স্কুল কলেজে ছাত্রগণের মধ্যে সুস্থ, সবল, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বর্ষা-কালে বিদ্যালয়ে সমাগত হইবার জন্য বেলা ১ প্রহর অতীত হইতে না হইতে বালকদের স্নান, আহার, সম্পন্ন করিতে হইবে। তৎকালে ক্ষুধার উদ্রেক হোক্ বা না হোক্ তাহার চিন্তা করিবার অবসর নাই। বেলা ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত কফ প্রকোপের সময়, তখন পাচকাগ্নি মন্দ থাকে, তৎকালে ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, অতএব অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি নানা রোগ জন্মে। ভোজনান্তে কিঞ্চিৎকাল পদচারণা করিয়া বিশ্রাম লাভ করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, এ নিয়ম পালনও ছাত্রগণের পক্ষে অসম্ভবপর। তাহারা অতি দ্রুত আবেগে কোন মতে আহার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, আপাদমস্তক পরিচ্ছদে সম্পূর্ণরূপে আবৃতদেহ হইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালীন প্রখরসূর্য্যকরেসন্তপ্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ ধারা নির্গত হইতেছে, গাত্রদাহে অস্থির হইতেছে, অথচ দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে বাধা। অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাবে দিন দিন শরীর দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইতেছে, তথাপি বিদ্যা শিক্ষার বিরাম নাই। মাসান্তে, বর্ষান্তে পরীক্ষা দিতে হইবে, দেহের দশা যাহাই হোক্, শিক্ষিত হওয়া চাই; এ কিরূপ শিক্ষা? "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।" যে দেশের ইহাই বীজমন্ত্র, বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জন দূরের কথা, যে দেশের আর্য্য সন্তান ধর্ম্মপ্রাণ হইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিবন্ধক ধর্ম্মার্জ্জনকেও বর্জ্জন করিতে উপ-দেশ দেন, সেই ভারতে আজ কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে সবারই বিষম মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইবে। কেবল বালক ও যুবকগণ নহে, অফিসের কর্ম্মচারী-বর্গও এই নিয়মে আবদ্ধ। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এরূপ দৈশিক সাত্ম্যবিপরীত, শীতপ্রধান দেশোচিত, রীতির নিত্যানুষ্ঠানে কিরূপ কুফল জন্মিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিদ্যা বা অর্থার্জ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য, শারীরিক ও মানসিক শান্তি লাভ; কিন্তু উক্ত রীতিতে বিদ্যার্থী বা কর্ম্ম-চারীগণের পক্ষে সেই দুইটীই দুর্লভ। আমা-দের বংশানুক্রমিক এবং দৈশিক শাস্ত্রোক্ত সাত্ম্যবিধির লঙ্ঘনদোষে কেবল আমরাই

অধঃপতিত হইতেছি এমন নহে, কিন্তু ভাবী-বংশধরগণেরও ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া যাইতেছি।

বর্ত্তমান শিক্ষা বা কর্ম্মজীবনেও আমরা আমাদের জীবনের সারসম্বল আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে বিনষ্ট করিতেছি। জীবনযাত্রা, ধনার্জ্জন ও ধর্ম্মসঞ্চয়, আয়ুর্ব্বেদের এই তিনটী ক্রমনির্দ্দিষ্ট স্তর পরস্পর সাপেক্ষভাবে নিবদ্ধ। জীবন নির্ব্বাধ ও শান্তিপূর্ণ না হইলে ধনার্জ্জন সম্ভবপর হয় না, ধনার্জ্জন ব্যতীত জীবনের কোন প্রয়োজনই সুসাধিত হইতে পারে না, সংসার-ধামে আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু মাত্রই অর্থায়ত্ত, অতএব যাহাতে ধনাগমের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করা যায়, তৎপ্রতি বৈদ্যক শাস্ত্রে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ, সাধন-প্রণালী, পরিণাম প্রভৃতির বিষয়, যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, কেবল আমাদের শারীর ব্যাধি প্রতিকারক গ্রন্থ নহে। ইহা একাধারে চিকিৎসা, অর্থনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে আমাদের যাবতীয় কল্যাণের আকর স্বরূপ। অথচ ইহার প্রত্যেক অধ্যায়, প্রত্যেক বাক্যই আমাদের দৈহিক সুখশান্তি ও মানসিক সমুন্নতির অনুসরণেই নির্দ্দিষ্ট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছায় আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব লঙ্ঘন করিতে পারি না। ঘরে, বাহিরে, শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আয়ুর্ব্বেদ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সুহৃদের ন্যায় কল্যাণকামনার অনুসরণ করিতেছে। দুষ্পরি-হার্য্য কালের ক্ষণিক আবর্ত্তনে আমরা সাময়িক মোহগ্রস্ত হইয়াছি, এ মোহভ্রান্তি চিরস্থায়িনী হইবে না। আয়ুর্ব্বেদাধিদেবের প্রসাদালোকে আবার আমরা নিজ কর্ত্তব্য-মার্গ অবলোকনে জাতীয় জীবন, স্বাস্থ্যসম্পদ্ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম জনিত গৌরবে মণ্ডিত হইব। একথা আমি উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলে বা সাময়িক উত্তেজনা বশে বলিতেছি না; আশা-সাফল্যের অস্ফুট পূর্ব্বরূপ দর্শনেই এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি। সেই নিত্য, সত্য, অভ্রান্ত, বিশ্বজনীন শুভঙ্কর, স্বকীয়প্রভাব-প্রভায়—ভাস্বর, পঞ্চম বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ভাস্কর সাময়িক মোহ মেঘাবরণে আবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের হতাশ বা নিরুদ্যম হওয়া উচিত নয়। ভারতাকাশে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন রূপ অনুকূল অনিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, অনতিবিলম্বে সেই মোহ-মেঘাবৃতি, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কত যুগ যুগান্তর ব্যাপী, রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সামাজিকবিপ্লবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সহস্র সহস্র বৎসর যে আয়ুর্ব্বেদ নিজের অপ্রতিহত প্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্ব বাসীর অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করিতেছে, তাহা অবিনশ্বর, অক্ষয়। যতকাল সৃষ্টির সত্ত্বা থাকিবে, ততকাল, আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব জগতে প্রদীপ্ত থাকিবে।

সভ্য মহোদয়গণ, পরিশেষে আমার এই নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃতির উপর আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব মাত্রই পরিদর্শিত হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা ও দেশান্তরে অবস্থান নিমিত্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা সমাপ্ত করিতে পারি নাই।

ব্যাধি এবং তৎ প্রতীকার বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব বারান্তরে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প আছে, যদি ভগবৎ কৃপায় সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হয় তবে সঙ্কল্প—কার্য্যে পরিণত হইবে।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন)

ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর—দুইটি ভীষণ ব্যাধিই বাঙ্গালায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তো কথাই নাই—ইংরাজ রাজত্বের সৃষ্টির কিছু কাল পরে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে—মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে সর্ব্ব প্রথমে এই ম্যালেরিয়ার মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীগণ যে জানিতে পারিল, তাহার প্রকট ভাব উপস্থিত হইল উহার বিশ বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম প্রতিষ্ঠিত মহম্মদপুরে। ঐ বৎসরই ঐ ম্যালেরিয়া রোগে ঐ গ্রামের ৪.৫ হাজার লোক কাল কবলিত হইল। তাহার পর যশোহরের চিত্রানদীর দুই ধার দিয়া বহু গ্রাম—বহু জনপদ ধ্বংস করিয়া নদীয়ায় ইহার প্রকট মূর্ত্তি পূর্ণভাবে দেখা দিল। নদীয়া হইতে ক্রমশঃ সমগ্র বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী করাল বদনব্যাদানে দেশবাসীকে গ্রাস করিয়া বসিল। এ সব কথার আলোচনা আমরা আয়ুর্ব্বেদে বহু বার করিয়াছি। ফলে ম্যালেরিয়া এখন বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান ভীষণ ব্যাধি। শ্রাবণের শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইহার জ্বালা সহ্য করিবার জন্য বঙ্গবাসী এখন যেন প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া থাকে, বর্ষার অন্তে এই ভীষণ রোগের আক্রমণ নীরবে সহ্য করিতেই হইবে—ইহা এখন বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধারণা।

কালা জ্বরের মূর্ত্তি কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট এখনও নূতন। এই সর্ব্বনেশে রোগ বাঙ্গালায় বেশী দিন আগমন করে নাই। আগে যাহারা আসাম অঞ্চলে যাইত, তাহারাই কালাজ্বরে ভুগিত বলিয়া বাঙ্গালী জানিত। পেটের জ্বালায় অতি কষ্টে না পড়িলে এই জন্য আগে কেহ আসাম অঞ্চলে যাইতও না। এক কথায় এই কালাজ্বরটা আমদানী হইয়াছে আসাম হইতেই। আসামে ইহার নাম ছিল কালা—আজর। উহা হইতে বাঙ্গালায় এখন উহা 'কালাজ্বর' নাম ধারণ করিয়াছে।

এখন আর কালাজ্বর বলিলে আসামের জ্বর বুঝায় না, কয়েক বৎসর হইতে ইহাও যেন এখন বাঙ্গালার নিজস্ব রোগের মত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা কিন্তু ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর—দুইটি জ্বরকেই বিষমজ্বরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিদগণ স্থির করিয়াছেন, ম্যালেরিয়া জ্বরে—(১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা পালা করিয়া জ্বর কমে বাড়ে বা জ্বর-বিচ্ছেদ ঘটে। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয়। (২) শরীরের ক্রমিক দুর্ব্বলতা ইহাতে ঘটে না, জ্বরের পালার মধ্যে রোগী বেশ কাজ করিতে পারে। (৩) প্লীহা বড় হয়, কিন্তু যকৃৎ বেশী বড় হয় না। (৪) ম্যালেরিয়া জ্বরে ঘোকালীন জ্বর বিরল। (৫) অণুবীক্ষণের দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, রক্ত ও শ্বেত কণিকা—উভয়েরই তুল্য-রূপে ধ্বংস হইতেছে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকমণ্ডলী কালাজ্বরের উপসর্গগুলির নির্ণয় নিম্নলিখিত রূপ করিয়াছেন (১) জ্বর অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। কখনও জ্বর ছাড়ে, কিন্তু জ্বর ছাড়িবার বা বাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয় না। (২) অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এবং ক্রমিক শীর্ণতা বড় বেশী বেশী ঘটিয়া থাকে। প্লীহা যকৃৎ—দুইই বড় হয়। (৩) ঘোকালীন অবিরাম জ্বর কালাজ্বরেই বেশী। (৪) কালাজ্বরে শ্বেত-কণিকা ৪/৫ হইতে ৪/৫ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। শ্বেত কণিকা দেহ রক্ষার কার্য্য করে। এই জন্য উহারা কমিয়া গেলে নিউমোনিয়া-রক্তাতিসার, যক্ষ্মা প্রভৃতির রোগ-বীজাণু সমূহ দুর্ব্বল-শরীরকে পাইয়া বসে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আরও স্থির করিয়াছেন, 'ম্যালেরিয়া জ্বর—বহু কম্প ও বহু উপদ্রবের সহিত অগ্রসর হয় আর কালাজ্বর নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে থাকে। কালাজ্বরে ১০৩।১০৪ ডিগ্রি তাপ উঠিলেও বিশেষ উপদ্রব দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর সন্ধ্যা কিম্বা রাত্রিতে আসে। কালাজ্বর সকালে আসে ও ঘোকালীন অবিরাম জ্বরে প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু সর্ব্বদা রক্তে দেখিতে পাওয়া যায়, আগে হইতে কিন্তু যাঁহারা কুইনাইন খাইয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু তাঁহাদের পরীক্ষা কালে দুর্লভ হয়। কালাজ্বরের জীবাণু কিন্তু এরূপ ভাবে দেখা যায় না, প্লীহা ও যকৃৎ হইতে রক্ত লইয়া দেখিলে তবে উক্ত রোগের জীবাণু দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম, এইবার আয়ুর্ব্বেদের কথা বলিব। আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের শ্রেণীবিভাগে বলা হইয়াছে, যে জ্বর সাত দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত, ইহা রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের গুরুতা, বমন ভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্ত চিত্তত্ব—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিম্বা কেবল দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতে দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সতত্তক। এই জ্বর রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং এই জ্বরে মুখ হইতে অল্প রক্তোদ্গীরণ, দাহ মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা, (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা—এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র হইয়া থাকে, তাহার নাম অন্যেদ্যুক। ইহা

মাংসকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বর জানুর অধোজঙ্ঘা মাংস পিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডা'দ্ব দ্বারা পীড়ন বৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মল মূত্রের অতি প্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি—এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক। এই জ্বর মেদাগত। এই জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুইদিন অন্তর হয়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত। এই জ্বরে অস্থি সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুস্থন, শ্বাস, মল রেচন, বমন, হাত পা ছোড়া এবং অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

ডাক্তারেরা সন্তত জ্বরের নাম করণ করিয়াছেন, Remiteent fever সতত জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন Donble Quatidion অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরের নাম করণ করিয়াছেন, quotidian তৃতীয়ক জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন,Tertion এবং চাতুর্থক জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন quontian.

আয়ুর্ব্বেদে বিষম জ্বরের শ্রেণী বিভাগে চাতুর্থক-বিপর্য্যয় নামে আর এক প্রকার জ্বরের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি ও অন্তে থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদে বিষম জ্বরের এরূপ শ্রেণী-বিভাগ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব বায়ু, পিত্ত, কফ লইয়াই এই বিষম জ্বর গুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীরের নিম্নলিখিত রূপ অবনতির পরিচয় দিয়াছেন,—

ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয় এবং তাহাতে কাল রং আসিয়া জমে। রক্তহীনতা অর্থাৎ পাণ্ডুতা ম্যালেরিয়া জ্বরে দৃষ্টিগোচর হয়। চর্ম্ম—রক্তাল্পতা বশতঃ ম্লান ও অমসৃণ হয়। খোস, পাচড়া, দক্রু, স্ফোটক, কর্ণমূল, উরুস্তম্ভ ও পৃষ্ঠব্রণ—ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক দিন ভুগিলে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের কপিশ বর্ণ—কপিশতর হয়। চক্ষু হরিতাভ ও জ্যোতিঃহীন হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের থলিগুলি বড় শক্তিহীন হয়, রক্ত সঞ্চালন শক্তিও ক্রমে কমিয়া যায়। রোগীর হাত পা ফুলিতে থাকে, ক্রমে উদরী ও সর্ব্ব শরীরে শোথ হইতে দেখা যায়। যকৃৎ—রক্তে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং যকৃতে প্রদাহ উপলব্ধি হয়। যকৃতের অংশ সমূহ স্থানে স্থানে রূপান্তর প্রাপ্ত ও কঠিনস্পর্শ হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃৎ বেশ বড় হইয়া উঠে কিন্তু কালাজ্বরে যকৃতের বিবৃদ্ধি ম্যালেরিয়া অপেক্ষা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহাও বেশ বড় হয়। মূত্রগ্রন্থি ও অন্ত্রি সমূহে ম্যালেরিয়া এবং কালা জ্বরে স্থানে স্থানে প্রদাহ ও ক্ষত দেখা যায়। অস্থি ও মজ্জা 'মলীক' রঞ্জিত দেখায়। মস্তিষ্ক এবং

বায়ু মণ্ডলের বহুরোগ ম্যালেরিয়ার সহিত ঘটিয়া থাকে। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড ঘটিত পীড়াও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরে কম ঘটে না। বায়ুকোষ ও বায়ুনালীর প্রদাহ (Bronchitis) ম্যালেরিয়া রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলে। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহও ম্যালেরিয়ায় ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় অণ্ডকোষ ফুলিয়া জ্বর ও বাত শিরা যুক্ত জ্বর ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেখা যাইয়া থাকে। অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময়, জ্বরাতিসার, বিসর্প, বহু প্রকার চর্ম্মরোগও ম্যালেরিয়ার ফল সম্ভূত।

আয়ুর্ব্বেদের যে বায়ু, পিত্ত, কফের কথা বলিতেছিলাম, বিষমজ্বরের উৎপত্তির কারণই সেই বাতাদি দোষ সম্ভূত। বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপন্ন করে, পূর্ব্ব কথিত সন্ততাদি জ্বর বলিয়া তাহারাই অভিহিত। জ্বর মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে অনতিবল দোষও প্রবৃদ্ধ এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস রক্তাদি কোনো ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। ইহা ভিন্ন কখন কখন প্রথম হইতেও বিষম জ্বর হইতে দেখা যায়। যাহা হউক এখনকার কথা—ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর কি? ম্যালেরিয়া জ্বর যে বিষম জ্বর ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, সে কথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কালাজ্বরেও ম্যালেরিয়ারই মত বিষম জ্বরের অন্তর্গত। কালা জ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সন্ততক, জ্বরের অনেক চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায়। দুইবার করিয়া জ্বর হওয়া কালা জ্বরের একটি প্রধান লক্ষণ—ইহা আয়ুর্ব্বেদে সন্ততক জ্বর বলিয়া কথিত। আয়ুর্ব্বেদে যে বাতবলাসক জ্বর কথিত আছে, তাহার পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, ঐ জ্বরে রোগী শ্লেষ্মবহুল, জড়প্রায়, রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট ও অবসন্ন হয়। কালাজ্বরে বেশীদিন ভুগিলে ঐরূপ অবস্থাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার সহিত কালাজ্বরের আর একটা বিশেষ প্রভেদ যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক দিন ভুগিলে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে। কালাজ্বরের রোগী কিন্তু সেরূপ হয় না, কালাজ্বরের রোগীর বর্ণ হয় ঘোর কালো। পল্লীগ্রামে 'কৃষ্ণকামল' বলিয়া কামলা রোগের যে নামান্তর প্রচলিত আছে, কালাজ্বরের রোগীর অবস্থা সেইরূপই হইয়া থাকে। ম্যালিরয়া জ্বরেও প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি হয়। কালাজ্বরে ঐ দুইটীর বিবৃদ্ধি কিন্তু ম্যালেরিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেক সময়েই মল কঠিন, দাস্ত ভালরূপে পরিষ্কার হয় না। কালাজ্বরে অনেক সময় তরল ভেদও ঘটিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগী জ্বরের সময় কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, দুর্ব্বলতা অনুভব করে এবং জ্বর না থাকিলে বেশ কাজকর্ম্ম করিতে পারে। কালাজ্বরে যে সময় জ্বর থাকে না, সে সময়ও রোগী দুর্ব্বলতা যথেষ্ট অনুভব করিয়া থাকে, জ্বরের সময় ত কথাই নাই, অন্য সময়ও কাজকর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাহার লুপ্ত হইয়া থাকে।

এইবার চিকিৎসার কথা বলিয়া, অদ্য এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। ম্যালেরিয়া কি কালাজ্বর বিবেচনা না করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্‌গণ যেরূপ ঐ দুইটি রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন না, আমাদের কিন্তু তাহার কোন কারণ নাই। অ্যালোপ্যাথেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগে যে শুভ ফল পাইয়া থাকেন, কালাজ্বরে সে ফল প্রাপ্ত হন না—এইজন্যই তাঁহাদের অত বিবেচনা। আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যখন কুইনাইনের প্রয়োগ করি না, তখন আমাদের সে চিন্তা করিবার কারণ কি? হরিতাল—ম্যালেরিয়াই বলুন আর কালাজ্বরই বলুন, সকল প্রকার বিষম জ্বরেই তো আমরা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারি। উহার প্রয়োগে বিবেচনার বিষয় কিছুই নাই। হরিতালঘটিত বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ যদি প্রাতঃকালে জ্বরের বেগ কম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়াই হউক আর কালাজ্বরই হউক, শুভ ফল ফলিবেই। একবার ঐরূপ বৃহৎ জ্বরাঙ্কুশ, মধ্যাহ্নে একটী আগ্নেয় ঔষধ, বৈকালে অভয়া লবণ, গুড় পিপ্‌পলী প্রভৃতি প্লীহা নাশক ঔষধ—যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া আসে, জ্বরও মুক্ত হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন সনাতন আয়ুর্ব্বেদ বনজ ভেষজে পরিপূর্ণ। সেই সকল বনজ ভেষজের সমন্বয়ে বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দাস্যাদি প্রভৃতি পাচনের প্রয়োগ ম্যালেরিয়া হউক আর কালাজ্বরই হউক, আমাদের মতে যে অতি শুভ ফল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মায়ের পূজা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আবার মা আসিতেছেন। বাঙ্গালার বরা মালঞ্চে আবার স্থলপদ্মের দল ফুটিয়া মাতৃপূজার অর্ঘ্য হইবার জন্য উন্মুখদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। রক্ত জবা রাগ ভরে জগন্মাতার চরণপদ্মে পড়িয়া ধন্য হইবার জন্য আশায় আকুল হইয়া রহিয়াছে। কাননকুন্তলা বঙ্গ পল্লীর প্রান্তর পার্শ্বে অপরাজিতার অপূর্ব্ব সৌরভ পান্থকুলের মনঃহৃত করিতেছে। সেফালির শুভ্র কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মর্ত্ত্যবাসীর নাসারন্ধ্রে স্বর্গের সুরভি উপস্থিত করিতেছে। কোন্ পুষ্পের কথা বলিব? যত্নসুলভ উদ্যানজাত বেলা, চামেলি, টগর, মল্লিকা—সকল পুষ্পই এখন আর কলিকা দশায় থাকিতে ইচ্ছুক নহে,—মায়ের আগমনে সকলেই এখন গর্ব্বপরিমায় প্রস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। অযত্নসুলভ কুটজ বনমল্লিকার অভূতপূর্ব্ব সদগন্ধেও মানব মাত্রেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে।

নীল-স্বচ্ছ কাশপ্রদেশ অতি পরিষ্কার। প্রতি পক্ষে জ্যোৎস্নার আনন্দে সকলের মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয় সত্য, কিন্তু মায়ের আগমনের পূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাশির এরূপ রজত শুভ্র নির্ম্মল শোভা অন্য সময় হয় কিনা বলিতে পারি না। দেবী পক্ষের এই ফুটন্ত জ্যোছনায় যে প্রাণ মাতান কি এক উন্মাদনা শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। নির্ম্মল গগনে তারকা নিকর বেষ্টিত চন্দ্রের শোভাও এই সময় যেরূপ মনোমদ হইয়া থাকে, সেরূপ বুঝি অন্য সময়ে হয় না। কত প্রবাসী বাঙ্গালী প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রিয়জনের সহিত মিলন সম্ভাবনায় আশায় দিন কাটাইতেছে। সুকুমারমতি বালক-দিগের আনন্দ, কবে বিদ্যালয়ের অবকাশ হইবে, স্নেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে কয়দিনের জন্য গমন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। যুবক-যুবতীর আকাঙ্ক্ষা কবে পরস্পরের সন্দর্শন সুখ উপভোগে পরস্পরে আনন্দ রসে আপ্লুত হইবে। বৃদ্ধ পিতা, প্রৌঢ়া জননীর আকাঙ্ক্ষা—কবে প্রবাসী পুত্রের আনন্দপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া স্বর্গ ভোগ অপেক্ষাও অধিক সুখ উপলব্ধি করিবেন। এক কথায় আনন্দময়ী মায়ের আমার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ সময় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি যেন অপূর্ব্ব আনন্দে উন্মত্ত। বাঙ্গালীর এ আনন্দ পৃথিবীর আর কোন উৎসবে আছে কিনা জানি না। শোক তাপ প্রপীড়িত অতিবড় দুঃখীর প্রাণও এ সময় আনন্দের উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারে না।

আনন্দময়ী মা আমার বর্ষে বর্ষে এই-রূপ পরমানন্দ লইয়াই বাঙ্গালায় আগমন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রান্তরভূমি-গুলি যে সময় উর্ব্বরাশক্তির প্রবল প্রাচুর্য্যে অপরিমিত ধান্যশীষে অপরূপ শোভা ধারণ করিত, সেই ক্ষেত্রজাত ধনধান্যে যে সময় বাঙ্গালীর অতিবড় গরীব গৃহস্থেরও অন্নবস্ত্রের অভাব হইত না, বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রধান সম্পদ—ধান্য এবং অন্যান্য শস্যসম্ভার যে সময় এই দেশ হইতে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইত না, তাহার ফলে যে সময় টাকায় দুই মন চাউল কিনিয়া বাঙ্গালী উদর পুর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত, শাকশব্জী তরি তরকারী পল্লীবাসীর অঙ্গনার নিম্নদেশে—প্রাঙ্গনের পার্শ্ব ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া বাঙ্গালীর ব্যাঞ্জনের অভাব দূর করিত, এক কথায় যে সময় সকল পল্লীবাসী বাঙ্গালীই ক্ষেত্রের ধান্য, বাগানের তরকারী, পুকুরের মৎস্য এবং গৃহ পালিত গাভীর দুগ্ধে আহারীর অভাব আদৌ ভোগ করিত না, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতি যে সময় সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পরমা-নন্দে কাল যাপন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিত, সে সময় এই শরৎকালে জগন্মাতা আদ্যাশক্তির আগমনে বাঙ্গালী যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মত্ত হইতে পারিত, সেরূপ আনন্দ এখন বুঝি আর বাঙ্গালী লাভ করিতে সক্ষম হয় না। দেশে এখন নগদ অর্থ যতটা সুলভ হইয়াছে, আগে

অবশ্য এরূপ ছিল না, সেকালে টাকার মুখ খুব কম লোকেই দেখিত। তখনকার দশ টাকা, এখন একশত টাকার সমতুল্য হইয়াছে। তখন এখনকার মত এত অধিক টাকা উপার্জ্জন করিবার কল্পনাও বাঙ্গালী করিতে পারে নাই। দাসখৎ লিখিয়া চাকুরী করিবার প্রবৃত্তি তো তখন বড় একটা কেহই রাখিতেন না, সে প্রবৃত্তি যাহার আসিত, তিনি অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার কারণ, নগদ অর্থ দিয়া দ্রব্য কিনিবার প্রয়োজন তখন কাহারও বড় আবশ্যক হইত না, দ্রব্য বিনিময়ে সংসারের অনেক কার্য্যই তখন সম্পন্ন হইতে পারিত। এখন তো আর তাহা হইবার উপায় নাই, প্রবৃত্তির বিপর্য্যয়ে এবং ম্যালেরিয়া-কলেরা প্রভৃতি আধিব্যাধির বিষম তাড়নায় বাঙ্গালী এখন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে, অমরাবতী তুল্য তাহার সৌধাবলীর উপর বট-অশ্বত্থ শিকড় গাড়িয়া তাহাকে জীর্ণ, শীর্ণ ও ভগ্নপ্রবণ করিয়া তুলিতেছে, তাহার পিতৃ পুরুষের কর্ষণের জমী গুলি এখন বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে, পুকুরে আর সেকালের মত মৎস্য হইবে কি—বহুকাল-বধি সংস্কারের অভাবে পুকুরগুলি তাহার মজিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। গাভী পালন—সে কার্য্য তো দেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত। এক কথায় বাঙ্গালী এখন দেশ ছাড়িয়া, প্রবাসে আসিয়া, যথেষ্ট অর্থের মুখ দেখিলেও ব্যয়াধিক্যে অভাবের তাড়নায় 'হা-ভাতের দল' হইয়া পড়িয়াছে। যখন সে দেশে ছিল, তখন সে পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পারিত, সেই আহার্য্যের মধ্যে ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকিত—তাহার ফলে চিররুগ্ন হইয়া, তাহাকে অকাল বার্দ্ধক্যকে আলিঙ্গন করিতে হইত না। এখন সে প্রবাসে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেও ব্যয়াধিক্য নিবন্ধন সেই অর্থ লইয়া যেন ছিনিমিনি খেলা করিতেছে। কলিকাতার মত প্রবাসে শৌচ কার্য্যের জন্য মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কিনিতে হয়, সুতরাং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অভাবতো এখানে পূর্ণ হইবার উপায় নাই, বাঙ্গালী বাঁচিবে কিসে? মাতৃপূজার মহোৎসবে সেকালের মত আনন্দে আত্মহারাই বা হইবে কিরূপে?

ইহার উপর রোগের তাড়না। পল্লী গ্রামের ম্যালেরিয়ার কথা নূতন করিয়া তুলিবার কিছুই নাই, শরৎ কালে যে সময় মায়ের আগমন, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী সে সময় করাল বদন ব্যাদানে পল্লীভূমিকে তো গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াই থাকে। বাঙ্গালার পল্লী গুলিতো এ সময় শ্মশান ভূমি। সহরের মত প্রবাসে আসিয়া ও বাঙ্গালী তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় কই? কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমনিয়া রূপ রোগ রাক্ষসেরও এসময় প্রবল প্রতাপ। এবৎসর তো ঘরে ঘরে এগুলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আরম্ভ হইয়াছে। ফল কথা, সহরে আসিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও বাঙ্গালীর স্বস্তি কোথায়? পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, অভাবের তাড়নায় বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর রোগের জ্বালা, বাঙ্গালী আর

মাতৃপূজায় অভিনিবিষ্ট হইবে কেমন করিয়া ? কৃতকর্ম্মের ফলেই বলুন, আর গ্রহবৈগুণ্য বশতঃই বলুন, চির শান্তি প্রিয় বাঙ্গালীজাতি বহু বৎসর হইতে যে শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগন্মাতা আদ্যাশক্তি সে শক্তি অর্জ্জনের ক্ষমতা বাঙ্গালীজাতিকে পুনরায় প্রদান না করিলে তাহার পক্ষে আর আনন্দ-বিহ্বল হইবার উপায় নাই। হে মা; বাঙ্গালীকে আবার সে শক্তি আনিয়া, যে শক্তি লাভ করিয়া বাঙ্গালী একদিন এই শরদাগমে পক্ষকাল পূর্ব্ব হইতে তোমার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত, যে শক্তি লাভ করিয়া আনন্দময়ী মা আমার তোমার হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ সন্তানগণ তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, চিন্ময়ীরূপে তোমাকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া পড়িত, বিশ্বধাত্রী মহামহিম মহিমাময়ী মা আমার, বাঙ্গালীকে, আবার সেই শক্তি ফিরাইয়া দাও মা ! বাঙ্গালী আবার রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা, সর্ব্বাপেক্ষা অন্ন চিন্তার নিদারুণ জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তোমার উৎসবে কয়দিনের জন্য আত্মহারা হইয়া উঠুক, বাঙ্গালীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা কয়দনের জন্য দুঃখ কষ্ট সকল ভুলিয়া, দৈন্য-জ্বালা চিত্ত হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার স্নিগ্ধ মধুর মোহিনী শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী দুর্গতিহারিণী জননী আমার তোমার পাদপদ্মে আত্ম নিয়োগ করিতে সমর্থ হউক। হে মা বাঙ্গালীর জন্য আবার সেই ব্যবস্থা করিয়া। বিশ্বসৃষ্টির ও বিশ্বরক্ষার মূলাধার মা আমার, তুমি না করিলে বাঙ্গালীর আর সে ব্যবস্থা কে করিবে মা।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি

দ্রব্য গুণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,]

আঢ়কী, অরহর ডাউল। কষায়, মধুর। কফ পিত্ত নাশক, গ্রাহী।

আত্তৃপ্য, আতা। রক্ত বর্দ্ধক, বল মাংস-কারী। দাহ, রক্ত পিত্ত নাশক বায়ু নাশক।

আদিত্য পত্র, অর্কপত্র। কটু, উষ্ণ। কফ, বাতরোগ, গুল্ম, অরুচি নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

আমলক, কাট আমলা। কষায়, কটু; শীতল। পিত্ত দোষ নাশক মাত্রা ৪।৫ মাষা।

আমলকী। শুক্রকারী, শীতবীর্য্য, অম্ল হেতু বায়ু নাশক, মাধুর্য্য জন্য পিত্ত নাশক, রুক্ষতা হেতু কফ নাশক। দাহ, বমি, মেহ, শোথ, রক্তদোষ ও পিত্ত নাশক। তৃষ্ণা ছর্দ্দি নাশক, রসায়ন। মাত্রা ৪ মাষা—৫ মাষা।

আম্র। বলাম্র ফল। বায়ু, পিত্তকারী, কফ রোগ নাশক।

মধ্যাম্র—পিত্তকারী।

পকাম্র। বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বল কারক, বায়ু নাশক, ত্রিদোষ সমতা কারক, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকারক।

মধুযুক্তাম্র। ক্ষয় রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নাশক।

ঘৃত যুক্তাম্র বাত পিত্ত নাশক।

দুগ্ধ যুক্তাম্র। ভেদক, বাত পিত্ত ও হারক, শুক্র-বলবর্দ্ধক।

আম্র ফলাস্থি গুণ। তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, মেহ ও অতিসার নাশক।

ত্বক গুণ। কষায়।

মূল গুণ। রুচিকারক, কষায়, গ্রাহী, শীতল।

পুষ্প গুণ। কষায়।

পল্লব গুণ। কফ পিত্ত নাশক।

আমসত্ব। তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বাত ও পিত্ত-নাশক, সারক।

আম্রপেষী, আমষী। ভেদক, কফ বাত নাশক।

আম্র ত্বক। কষায়, অম্ল, পিত্ত, কফ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

আরগ্বধ। সোঁদালী। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাত রক্ত, উদাবর্ত্ত, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, বিষ্টম্ভ বাত ও পিত্তনাশক। কোষ্ঠ শুদ্ধি কর। মাত্রা ২ তোলা হইতে ৪ তোলা।

আরাম শীতলা। তিক্ত, শীতল। পিত্ত-নাশক, দাহ ও শোথ নাশক। বিস্ফোট ব্রণ রোপণ কারক, মাত্রা ৩ মাষা।

আরুক, আড়ু। মধুর, হিম। অর্শ, প্রমেহ, গুল্ম ও রক্ত দোষ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

আদ্রক, আদা। উষ্ণ, কটু। শোথ ও কণ্ঠরোগ নাশক (লবণ-আদা) ভোজনাগ্রে পথ্য। বাত কফ নাশক, সারক, কুষ্ঠ ও পাণ্ডু নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

আলু। রক্ত পিত্ত নাশক, শুক্রকারক, স্তন দুগ্ধ কারক, গুরু, কফ নাশক।

আবর্ত্তকী; লতা বিশেষ। কষায়, অম্ল। শীত বীর্য্যকারী, পিত্ত নাশক।

আশুধান্য। পিত্তকারী।

আহুলা, কাঞ্চন পুষ্প। তিক্ত, শীতল। চক্ষুরোগে হিতকারী। পিত্তদাহ, মুখরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল ও ব্রণনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ঈঙ্গুদী, জীয়াপুতা, লতাফটকী। কটু, উষ্ণ, ফেনিল, রসায়ন, ব্রণ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ইন্দ্র চীর্ভিটী, যুগ্ম ফল, লতা বিশেষ। কটু, শীতল, পিত্ত শ্লেষ্মা, কাস, দোষ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

ইন্দ্র যব। কটু, তিক্ত, শীতল। কফ, বাত, রক্তপিত্ত, দাহ ও অতিসার, বমনকারক। জ্বর দোষ নাশক। কুষ্ঠ নাশক, জ্বরা তিসার, রক্তার্শ, কৃমি বিসর্পনাশক মাত্রা ৩ মাষা।

ইন্দ্রবারুণী। শ্বাস, কাস নাশক, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ নাশক, প্রমেহ, মূঢ় গর্ভ, গণ্ডমালা, ও বিষ নাশক; কামলা, পিত্ত, প্লীহা, উদরী নাশক, কৃমি নাশক, জ্বর নাশক। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি।

ইর্ব্বারু; কাঁকুড়। অজীর্ণকারী। শীতল পক্ক ফল দাহ ছর্দ্দি তৃষ্ণা নাশক। ক্লান্তি নাশক।

ইক্ষু। রক্ত পিত্ত নাশক, বল, শুক্র, কফ কারী। মূত্র, শুদ্ধিকারক, রক্তবর্দ্ধক, শ্রম নাশক, ত্রিদোষ নাশক, সারক, রুচিকর।

ইঙ্গিণ। পিত্ত, শ্লেষ্মা, অগ্নি বৃদ্ধিকারক।

পিত্ত কারক। পিত্তকারক, কফ কারক, বৃষ্য বায়ু নাশক।

উড়ম্বর। কফ পিত্ত নাশক, ব্রণ শোধন ও রোপণ কারক, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ নাশক, গর্ভ রক্ষক। মাত্রা ২ তোলা, ছালের মাত্রা ৫ মাষা।

উৎপল। পিত্ত কফ নাশক। দাহ, শ্রম বমি, ভ্রান্তি, কৃমি ও জ্বর নাশক।

উৎপলিনী; কুমুদিনী। হিম, তিক্ত, পিত্ত নাশক, রক্তামাশায় বাত, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রম ও বমি শমতা কারক,। বীজগুণ রুক্ষ, হিম, গুরু।

উদধি মল, সমুদ্র ফেণা। শীতল, কষায়, অতিবান্তি কারক, অর্থাৎ বমন কারক। মাত্রা ১ মাষা।

উপচক্র, চক্রবাক পক্ষি বিশেষ। মাংস গুণ লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ বীর্য্য, বলাগ্নি বৃদ্ধি কারক।

উপোদকা, পুঁই শাক। কষায়, উষ্ণ, কটু, মধুর। নিদ্রা, আলস্য, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্ম কারী বল্য।

উশীর, বেণামূল। ঘর্ম্ম, দৌর্গন্ধ, দাহ ও পিত্তরক্ত রোগ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

উষ্ট্রাস্থী, পুষ্প বিশেষ।—তিক্ত, উষ্ণ। রুচিকারক, হৃদ্রোগ নাশক। বীজ বৃষ্য।

উষ্ট্রী।—দুগ্ধ,—কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কৃমি, শূল ও উদরী নাশক। দধি—অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি, শূল, ও উদরী নাশক। নবনীত—ব্রণ কৃমি, বাত ও বিষ নাশক। ঘৃত—কুষ্ঠ, কৃমি, বিষ, বাত, কফ, গুল্ম ও উদরী নাশক। মাংস—বীর্য্য বর্দ্ধক।

এড়গজ—চাকুন্দিয়া।—বায়ু কফ, কুষ্ঠ, ত্বগ্দোষ, গুল্ম, উদরী ও অর্শ নাশক।

এণ হরিণ। মাংস—কষায়, মধুর পিত্ত রক্ত কফ ও জ্বর নাশক, সংগ্রাহী, রুচি কারক, হৃদ্য. বলকারী।

এরকা, তৃণ বিশেষ।—হিম। শুক্রবৃদ্ধি কারক। চক্ষুরোগে হিতকারী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী দাহ ও পিত্ত শোণিত নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

এরঙ্গ মৎস্য ভেদ।—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু।

এরণ্ড।—তৈল, মধুর, গুরু, অতি শ্লেষ্ম বর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, জীর্ণ, জ্বর-নাশক, কৃমিদোষ নাশক, শূল, কুষ্ঠ নাশক, আমবাত নাশক, জ্বরকাস নাশক। মাত্রা ২৪ মাষা হইতে ৩০ মাষা।

মূল—শূল, বায়ু কফনাশক, শুক্রকারী। স্নেহ মধ্যে এরণ্ড তৈল শ্রেষ্ঠ বিরেচক। চূর্ণ মধ্যে তেউড়ি। রস মধ্যে কাঁরবেল্ল, ফল মধ্যে হরীতকী।

এলজ, মৎস্যভেদ।—মধুর, বৃষ্য, সংগ্রাহী, কফ, বাতনাশক, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক।

এল বালুক, লালুকা।—উগ্র, কষায়, কফ, বাত, মূর্চ্ছা, ও জ্বরদাহ নাশক, পরম রুচি কারক। মাত্রা—১ মাষা।

এলা।—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি। পিত্তরোগ ও কফনাশক, বাস্তিনাশক শূল, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বায়ুনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নাশক, কফ, শ্বাস কাস ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক মাত্রা—১ মাষা।

ওকুল, গোধুম কৃত ঘৃত পক্কপিষ্টক বিশেষ গুরু, বৃষ্য, বল্য, রক্তবাত নাশক। মধুর, রুক্ষ।

ওড়িকা, উড়িধান।—শোথ, রুক্ষ, কফ-বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক।

ওল্, ওল।—অগ্নিদীপন, রুচি কারক, কফনাশক। লঘু, অর্শঘ্ন। মাত্রা—১০ তোলা।

ওষণী, শাক বিশেষ :—কফ, বায়ুনাশক।

ঔদ্দালক, মধু বিশেষ :—কুষ্ঠরোগ নাশক। বিষ রোগ নাশক। মাত্রা —২ তোলা।

ঔদ্ভিদ।—তীক্ষ্ণ, উৎক্লেদকারী, ক্ষারযুক্ত, কটু, তিক্ত কোষ্ঠবদ্ধ, আনাহ, ও শূল নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

ঔষরক, খারীলবণ।—কটু, ক্ষার, তিক্ত, বাত কফনাশক। বিদাহি, পিত্তকারী, মল বদ্ধ, ও মূত্র সংশোধনকারী। মাত্রা—২ তোলা।

কক্কোল, কাঁকলা। কটু, তিক্ত, উষ্ণ-দীপন, পাচন, রুচিকারক। কফ বাতরোগ নাশক। মাত্রা। ৩ মাষা।

কঙ্কলোড্ডা, চিকোড্ডমূল।—গুরু, শীতল। অজীর্ণকারী। মাত্রা—৩ মাষা।

কঙ্কুষ্ঠ, পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা বিশেষ।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, ব্রণ ও শূলনাশক; রেচক। মাত্রা—২ মাষা।

কঙ্গু।—ধাতু শোষক, রুক্ষ, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারী, ভগ্নসন্ধানকারী, পিত্ত-দাহনাশক। মাত্রা—১ তোলা।

কচ্ছপ :—মাংস—বাতনাশক, শুক্রবৃদ্ধি-কারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, বল্য, মেধা স্মৃতিকর, শোথনাশক। চর্ম্ম—পিত্তনাশক। পাদ —কুষ্ঠনাশক। অণ্ড—বাজীকর।

কচু।—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারী।

কর্কট, কাঁচড়াদাম।—শ্লেষ্মকারী, ধারক, হিম, রক্ত পিত্তনাশক, বায়ুহর।

কটভী, নয়া কটকী, জ্যোতিষ্মতীলতা।—কটু, উষ্ণ, গুল্ম, বিষাগ্নান, শূলদোষনাশক; বাত; কফাজীর্ণনাশক। কফ ও শুক্রকর। মাত্রা ২ মাষা।

কটুকা, কটকী :—কটু, তিক্ত, শীত, রক্তপিত্ত, দাহ, শ্বাস, ও জ্বর নাশক। সারক, কফ নাশক, কৃমিঘ্ন। মাত্রা ৫ মাষা।

কটুতুণ্ডী; কটুহরই।—কটু, রেচক, রক্ত-পিত্তনাশক।

কটুতুম্বী, তিৎলাউ,।—কটু; তীক্ষ্ণ, বান্তিকারক, শ্বাস, বাত, শোথ, ব্রণ ও শূল, বিষনাশক; পাণ্ডু, কৃমি, কফ ও বায়ুনাশক, প্লীহানাশক, উদরীনাশক। মাত্রা ১ রতি।

কটফল-কায়ফল। তিক্ত, কটু। বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস ও—অরুচিনাশক। মুখরোগনাশক। মাত্রা ২ হইতে ৮ রতি।

কটি - লতা বিশেষ।—মধুর, শীত, কফ, শ্বাস, ও জ্বরনাশক। রাজযক্ষা নিবারক। মাত্রা ৩ মাষা।

কণগুগ্‌গুল। কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি। বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক। রসায়ন মাত্রা ২ মাষা।

কণ্টকারিকা। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন। শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায় দোষ, কফ, বাত ও জ্বরনাশক, তৃষ্ণানাশক, কণ্ডু,কুষ্ঠ, ও কৃমিনাশক, পীনস ও পার্শ্বপীড়ানাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কণ্টকী-কাঁটাবেগুন। কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কণ্ডুনাশক।

কণ্টাফল, কাঁঠাল। পক্কফল-গুণ-রক্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাত পিত্তনাশক। শ্লেষ্ম-শুক্র-বলপ্রদ, বৃংহণ, মাংসল।—বীজ—পিত্তনাশক শ্রম-নাশক।

কদম্ব।—তিক্ত, কটু, কষায়, পিত্ত-নাশক, বাত; কফনাশক; শুক্রবর্দ্ধক, মাত্রা ২।৹ তোলা রস।

কদলী, কলা। পক্কফল কষায়, মধুর, বলকারী, শীতল, শুক্রবৃদ্ধিকর, পিত্তনাশক, ক্লমনাশক, তৃষ্ণানাশক, হৃদ্য, কফ, কৃমি-নাশক। কুষ্ঠ, প্লীহা ও জ্বরনাশক। বস্তি শোধক। মূল—বলকারক, বাতপিত্ত-নাশক।

কম্হারী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, শোথ, রক্তগ্রন্থি ও জ্বরনাশক। দীপন, রুচিকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

কপর্দ্দক, কড়ি।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কর্ণশূল; ব্রণ, গুল্ম, শূল ও নেত্রদোষ নাশক।

কপিকচ্ছু, আলকুশী। বাজ্বরস, শুক্রবৃদ্ধি-কারী; বাত, ক্ষয় ও ব্রণনাশক। বীজগুণ, বাত শমনকারী, পরম বাজীকর, কফ, বাত নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কপিঞ্জল; চাতকপক্ষী।—মাংসগুণ—লঘু; শীত, কফ ও রক্ত পিত্তনাশক। অগ্নি-কারক। শুক্রবৃদ্ধিকর।

কপিত্থ, কতবেল।—অম্ল, উষ্ণ। কফ নাশক, গ্রাহী, বায়ুবর্দ্ধক। কণ্ঠরোগ-কারী, বিষহর, রুচিকর। শ্বাস, বমি, শ্রম, ক্লম হর, কণ্ঠ্য। মাত্রা ৪ তোলা।

কপিলদ্রাক্ষা, কিসমিস। মধুর শীত, হৃদ্য। দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হৃল্লাস নাশক।

কপোত।—বীর্য্য ও বলবৃদ্ধিকারক, বাত-পিত্তনাশক।

কমল।—শীতল, স্বাদু, রক্তপিত্ত ও ভ্রমনাশক। সন্তাপনাশক। মাত্রা ৪ তোলা

কম্পিল্লক, কমিলা।—বিরেচক, কটু, উষ্ণ। ব্রণ, কফ, কাস ও কৃমিনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

করঞ্জ।—ফলগুণ—কটু, উষ্ণ। চক্ষু-রোগে হিতকারী, বাতনাশক। কফ, মেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। পত্রগুণ।—কফ, বাত, অর্শ, কৃমি ও শোথনাশক, ভেদক ও পিত্তবর্দ্ধক। তৈল—বাতনাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিসূচিকানাশক। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। লেপনে নানাবিধ চর্ম্মদোষনাশক।

করমর্দ্দক।—পক্ক ফল—ত্রিদোষনাশক, অরুচিবিষনাশক, পিপাসানাশক।

করবীর, অশ্বথ।—কটু, তীক্ষ্ণ। দুষ্ট কণ্ডুনাশক। ব্রণ বিস্ফোটকশমনকারক। মাত্রা ॥৹ রতি।

করীর, বাঁশের কোঁড়া।—শ্লেষ্মানাশক; কষায়, দাহজনক।

করীব, উষ্ট্রপ্রিয়কণ্টকবৃক্ষ।—আগ্মানকারী, কষায়, কটু, উষ্ণ, শ্বাসনাশক, শূলনাশক ব্রণদোষনাশক।

করুণ, করুণা লেবু।—ফলগুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদনাশক।

করুণী, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বায়ু কফনাশক।

কর্কট।—বায়ুপিত্তনাশক, বলকারী।

কর্কট শৃঙ্গী।—তিক্ত গুরু, উষ্ণ। বায়ু, হিক্কা, অতিসার, কাশ ও শ্বাসনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

কর্কটী, কাঁকুড়।—মধুর, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, কফদোষকারী, মূত্ররোধ নাশক।

কর্কোটক, কাঁকরোল।—শুক্র-কফপিত্ত নাশক, রুচিকারক, মাত্রা ২ তোলা।

কচ্চুর, কচুর।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, কাস ও গলগণ্ডদোষনাশক।

কর্ণস্ফোটা কানকাটা, লতাবিশেষ।—কটু, তিক্ত, হিম। সর্ব্ববিধ, গ্রহভূতাদি দোষ ও সর্ব্বব্যাধিনাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কর্দ্দম, কাদা।—শীতল, রুক্ষ, ব্রণশোধন ও রোপণকারক; শোথনাশক। বিষরোগ, বেদনা ও দাহনাশক;

কর্পূর।—শিশির, তিক্ত, কটু। শ্লেষ্ম, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, বিদাহ ও কণ্ঠস্বরদোষ নাশক মাত্রা ৪ রতি।

কর্ব্বুদার, শ্বেতকাঞ্চন।—গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙা।—অম্লপিত্তকারক, মধুরাম্ল, বলপুষ্টিকারক।

কলমধান্য, শালিধান্যবিশেষ।—রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক, চক্ষুরোগে হিতকারী।

কলম্বা।—স্তন্যদুগ্ধ শুক্র শোষকারী, মধুর কষায়। মাত্রা ১২ রতি। শুষ্ক ৫ তোলা।

কলায়, মটর, বাঁটুল। বাত, রুচিপুষ্টি ও আমদোষকারী পিত্ত, দাহ ও কফ নাশক, শীত, কষায়, ভেদক।

কশেরুক, কেশুর।—গুরু, বিষ্টম্ভকারী, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, দাহ ও শ্রমনাশক।

কস্তুরী।—সুরভি, তিক্ত,চক্ষুরোগে হিতকারী, কফদোর্গন্ধনাশক, রক্তপিত্ত ও সর্দ্দিনাশক। মাত্রা ২ রতি।

কাংস্য।—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুরোগে হিতকারী, বাত কফ বিকারনাশক। রুক্ষ কষায়, রুচিকারী, লঘু, দীপন, পাচন, সারক, ও পিত্তনাশক। মাত্রা ১ রতি।

কাকমাংস।—ক্ষয়নাশক। চক্ষুরোগে হিতকারী।

কাকজঙ্ঘা। তিক্ত, উষ্ণ। কৃমি, কফ ও বীর্য্যনাশক। বিষমজ্বরনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

কাকতিন্দুক, মাকড়াগাব—কটু, উষ্ণ, তিক্ত রসায়ন। বাতদোষ নাশক। পলিত স্তম্ভিত। মাত্রা ।০ রতি।

কাকমাচি, গুড়কামাই।—কটু, তিক্ত উষ্ণ, কফ, শূল, অর্শ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। ত্রিদোষ নাশক, ভেদক। মাত্রা ২ তোলা।

কাকলী দ্রাক্ষা, বেদানা, কিসমিস।—মধুর, অম্ল, রসাল। রুচিকারক, শ্বাস ও হৃল্লাস নাশক।

কাকোদুম্বরিকা, কাকডুমুর।—শীত কষায়, ব্রণনাশক, গর্ভরক্ষক, স্তনদুগ্ধকারক।

কাকোলী।—শীতল, মধুর, ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু, রক্তদাহ ও জ্বর নাশক; কফ শুক্র বর্দ্ধক।

কাচলবণ, কালালবণ, বিটলবণ।—পিত্তকারী, কফ, বাত, গুল্ম ও শূল নাশক। অগ্নিদীপনকারক। মাত্রা ।০ তোলা।

কাঞ্জিক।—বাত, শোথ, পিত্তজ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা শূল, ও আধ্মান নাশক। হৃদ্‌রোগ

নাশক; পাণ্ডু ও কৃমিরোগ নাশক। অগ্নিকারক।

কাঁতল।—উষ্ণ, মধুর, গুরু, ত্রিদোষ-কারী।

কাদম্ব, বালিহংস।—বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক, স্নেহক, শুক্রকারক।

কানক, জয়পালবীজ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, সারক। মাত্রা ।॰ রতি।

কারবেল্ল।—ধারক; রক্তপিত্তরোগনাশক, রুচিকর।

কাপাসী।—মধুর, শীত,। স্তনদুগ্ধকারী। পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা নাশক। বল্য, ভ্রান্তি নাশক।

কালশাক।—সারক, রুচিকর, বল্য, বায়ুকর, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক।

কালিন্দ, তরমুজ। শীতল, গ্রাহী, গুরু। শুক্রনাশক, পিত্তনাশক, কফ-বাতকারী।

কাশকেশুর।—রুচিকর, পিত্তদাহ নাশক, বল্য, শুক্রকারী, শ্রম, শোষ ও কফ নাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

কাষ্ঠকদলী।—রুচকর, রক্তপিত্ত নাশক, হিম, গুরু, মাত্রা ৫টা।

কাসীস, হিরাকষী।—কষায়, শিশির। বিষ, কুষ্ঠ, কৃমি নাশক। চক্ষুরোগে হিতকারী, কান্তিবর্দ্ধক। মাত্রা ২ রতি।

কিঞ্জল্ক, নাগকেশর।—মধুর, রুক্ষ, কটু, আমকৃৎ ব্রণ নাশক; পিত্ত, তৃষ্ণা ও দাহ নাশক, শোথ নাশক।

কিরাততিক্ত, চিরতা, ভূনিম্ব। বায়ু বৃদ্ধি কর, রুক্ষ, কফপিত্তজ্বর নাশক, সারক, কৃমিঘ্ন সান্নিপাতিকজ্বর, শ্বাস ও দাহ নাশক, কাস, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ১০ মাষা হইতে ২ তোলা।

কিলাট, ছানা।—স্নিগ্ধ, গুরু, বৃষ্য, পিত্ত নাশক।

কুকুন্দর; কোকশিম, কুকুরশোকা।—কটু, তিক্ত, জ্বর, রক্তকফ নাশক। মূল—মুখ শোষ নাশক; মাত্রা ১ তোলা।

কুক্কুট।—বৃংহণ, চক্ষুরোগে হিতকারী। শুক্র ও কফকারক, বাত, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নাশক।

কুঙ্কুম কেশর।—সুরভি, তিক্ত, কটু, উষ্ণ,। কাস, বাত, কম্পরোগ, মূর্দ্ধশূল ও বিষদোষ নাশক। কান্তিকর, রেচক, কণ্ডু নাশক, বর্ণ্য, ব্যঙ্গদোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

কুটজ, কুড়চি।—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়। অতিসারনাশক, রক্তপিত্ত ও অর্শোবনাশক, অর্শঘ্ন, কফনাশক; দীপন, রুক্ষ, সংগ্রাহী, হিম। মাত্রা ২ মাষা।

কুণ্ঞর, বনবেতুয়া।—মধুর, রুচিকারক, দীপন, পাচন, ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, পিত্তশ্লেষ্মানাশক।

কুন্দ।—শীত, লঘু, কফপিত্তনাশক, সারক, দীপন; পুষ্প—গ্রাহী।

কুন্দুরু।—মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ। স্বেদোষ-নাশক, দাহনাশক, প্রদরনাশক, জ্বর-নাশক।

কুমুদ। শীতল, স্বাদু, তিক্ত। কফ, রক্ত-দোষ, দাহ; শ্রম ও পিত্তনাশক।

কুষ্মাণ্ডতুম্বী, গোল লাউ।—মধুর, শীতল, কফপিত্তনাশক। শ্বাস, কাস ও জ্বর-নাশক।

কুস্তিকাপানা।—মূত্রকারক। মাত্রা ২ মাষা।

কুলঞ্জন।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন। মুখদোষনাশক।

কুলথ।—কফ, বাত, গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, শ্বাস, কাস ও প্রমেহনাশক। বৃংহণ, গ্রাহী। মাত্রা ১০ তোলা।

কুশ।—ত্রিদোষনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও প্রদরনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কুষ্ঠ, কুড়।—উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রল, বিসর্পনাশক, কাসনাশক, বায়ুকফনাশক, জ্বর, শোথনাশক; অরুচি ও শ্বাসনাশক, পার্শ্বশূলনাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও রক্তনাশক। হিক্কানাশক। মাত্রা ১০ মাষা।

কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। বৃংহণ, বৃষ্য, বস্তিশুদ্ধিকর। বাতনাশক, রক্তপিত্ত, মূত্রাঘাত, প্রমেহ ও অশ্মরীনাশক, রক্তপিত্তনাশক, জীর্ণাদিপুষ্টিকারক, শুক্রকারী, অরুচিনাশক, বলকারী। মাত্রা ২০ তোলা।

কুসুম্ভ, কুসুমফুল।—শাক মধুর, কটু, উষ্ণ, দৃষ্টিপ্রসাদনকারী, অগ্নিকারক, রুচিকর, কফনাশক, পিত্তকারী।

কৃশরা।—শুক্রবলকারী, পিত্তকফদায়ক।

কৃষ্ণজীরক, কেলেজীরা। কটু, উষ্ণ, কফ, শোথ ও জীর্ণজ্বরনাশক। অতিসারনাশক, গর্ভাশয় শুদ্ধিকারক, সংগ্রাহী, মেধাকারী, দীপন, বল্য, রুচ্য, বৃষ্য, আধ্মাননাশক, চক্ষুষ্য। মাত্রা ২ মাষা।

কৃষ্ণ ধুস্তুরক—কটু, উষ্ণ, কান্তিকর। ব্রণ, কণ্ডু, জ্বর ভ্রম নাশক। মাত্রা ১ বীজ।

কৃষ্ণ মুগ। ত্রিদোষ ও দাহনাশক, বলবীর্য্য পুষ্টিদায়ক, মধুর, লঘু।

কৃষমৃৎ।—ক্ষত দাহ, প্রদর, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক।

কৃষ্ণশালি।—ত্রিদোষ ও দাহনাশক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণকান্তি ও বলকারক।

কৃষ্ণসার। মাংস—সংগ্রাহী, রুচিবলকারক, জ্বরনাশক।

কৃষ্ণাগুরু।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, (লেপে) শীতল। (পানে) পিত্তহর, কর্ণাক্ষিরোগনাশক। মাত্রা ১ মাষা।

কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী। কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, নেত্র রোগনাশক। মাত্রা বীজ ৩ মাষা।

কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা ইক্ষু। ত্রিদোষনাশক।

কেতকী। মধুর, তিক্ত, কটু। কফনাশক। বর্ণকারী, লঘু, দুর্গন্ধ নাশক, বৃংহণ পিত্ত কফনাশক রসায়ণ, মাত্রা ৫ মাষা।

কেমুক, কেউ। মূল—কফপিত্ত নাশক, অগ্নিকারক। গ্রাহী, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কেশরাজ। কটু, তিক্ত, রুক্ষ। কফবাত নাশক। কেশ্য, ত্বচ্য, চক্ষুষ্য, কৃমি শ্বাস-কাস-শোথ নাশক। দন্তরোগ নাশক রসায়ন, বল্য, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ নাশক, শিরোবর্ত্তিনাশক, অগ্নিকারক, পাণ্ডুনাশক, শ্বিত্র নাশক। মাত্রা রস ২॥০ তোলা।

কোকিলাক্ষ, কুলিয়াখাড়া।—আমবাত ও বাতরক্ত নাশক, পিত্তাতিসার নাশক, শুক্রকারী মাত্রা ১ তোলা।

কোদ্রব, কোদো।—বাতল, গ্রাহী, পিত্ত কফ নাশক, মধুর, তিক্ত রুক্ষ।

কোল, বদরিফল।—শুক্রল, বৃংহণ ; পিত্ত-দাহ, ক্ষয় ও তৃষ্ণা নাশক। বায়ু কফ নাশক। পক্ক ফল—বায়ু পিত্ত নাশক। মজ্জা-ছর্দ্দিনাশক।

কোবিদার, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।—হিম, গ্রাহী, শ্লেষ্মা পিত্ত নাশক ; কৃমি কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণ নাশক। প্রদর নাশক ক্ষয়কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, রক্তপিত্ত নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কোশাতকী—ঝিঙ্গা।—শিশির, কষায়। পিত্ত, বাত, কফ নাশক। মলাশয় শোধক।

মহাকোশাতকী, ধেঁধুল, ধুন্দুল।—পিত্ত-বায়ু নাশক, শ্বাস জ্বর ক্রিমি নাশক।

কোষাতকী, ঘোষালতা।—ফল কফার্শ নাশক, আমাশয় শুদ্ধি কারক।

খটী, খড়ী।—মধুর, শীতল। পিত্ত, দাহ ব্রণদোষ ও নেত্র রোগ নাশক। অম্ল পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

খড়গী, গণ্ডার —মাংস বলকারী বৃংহণ, গুরু। কফ ও বায়ু নাশক, কষায়, মূত্রবন্ধকারী, আয়ু বৃদ্ধিকারী।

খদির।—শীতল, দন্ত্য, কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদ, কৃমি মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, পাণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক। বিসর্প নাশক, মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

খর্জ্জুর।—মধুর শীতল, গুরু। ক্ষয়, অভিঘাত, দাহ, বাত ও পিত্ত রোগ নাশক। বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক, গুরু, পিত্ত নাশক, তৃষ্ণা নাশক, কাস-শ্বাস নিবারক।

খপরীতুত্থ।—কটু, তিক্ত। চক্ষুহিত, রসায়ন, সর্ব্বদোষ শমনকারী। মাত্রা ১ রতি

খলিশ।—গ্রাহী, কষায়। বায়ু কোপনকারী, রুক্ষ, লঘু, শূল নাশক, আমনাশক।

খাখস, পোস্তদানা।—বল্য, বৃষ্য, বায়ু নাশক।

খদির সার।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

(ক্রমশঃ)

সফল চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, এ, এম, এস, এচ এম বি)

ছুলি রোগে—পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া দুই তিনবার দিবসে প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

মুখে রক্ত উঠিলে—গোলাপ এক তোলা, কেওড়ার আরক একতোলা, কচি ডুমুরের রস দুই তোলা, মিশ্রি এক-তোলা একত্র করিয়া দুই তিন দিবস খাইলে রক্তউঠা ভাল হয়।

গণ্ডমালা হইলে—বামুনহাটির শিকড়—আতপ চাউলের চাল্‌নির সহিত

বাটিয়া ফোড়া, কোলা ও ঘায়ে পাঁচ সাত দিবস প্রলেপ দিলে পীড়া আরোগ্য হয়।

দন্তের গোড়ায় বা জিহ্বায় ঘা হইলে—গোয়ালিয়া লতার পাতা মোটা ডাটা ডুমাডুমা করিয়া কাটিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে চুঁয়া ঘৃতের সহিত ঐ ভাজা ডাঁটা বাটিয়া অবলেহ করিয়া ঐ ঘায়ে দুই তিন দিবস দিলে আরোগ্য হইবে।

মুখের ঘায়ে—দন্তের গোড়ায় নালী হইয়া পুঁজ পড়িতে থাকিলে গন্ধভেবেণ্ডার আটা এক তোলা, চারি আনা লবণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তলের পাত্রে গরম করিয়া দন্তের গোড়ার দুই দিকে দিয়া কিছুক্ষণ পরে ধুইয়া ফেলিবে। দিনে দুই তিনবার প্রয়োজ্য।

কান পাকিলে—(১) গোলাপ ফুলের আতর শিশি করিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান পাকা ভাল হয়।

(২) সর্ষপ তৈল অগ্নিতে চড়াইয়া একটা বা দুইটা শামুক তাহাতে ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কর্ণে দিলে কান পাকা ভাল হয়।

(৩) শঙ্খের গুঁড়া গরুর চোণাতে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পুরিয়া ক্ষণকাল রাখিলে কান পাকা ভাল হয়।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে—যদি মুখ দিয়া হঠাৎ অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিতে দেখা যায়, তবে কেশুরিয়ার জল এক ছটাক খাইতে দিবে, পরে অতি কচি ডুমুর ঘৃতে ভাজিয়া অর্দ্ধপোয়া খাইতে দিবে। নাক দিয়া রক্ত উঠিলে সদ্য ঘৃতের নস্য লইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া ভাল হয়।

(২) পুরাতন ঘৃত ও চামিলি ফুলের তৈল ব্রহ্মতালুতে মাখিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া ভাল হয়।

ছেলেদের দাঁত না উঠিলে—যদি ছেলেদের দাঁত না উঠে, তবে নরুণ দিয়া সেই জায়গার মাড়ি কিঞ্চিৎ চিরিয়া দিলে দন্ত উঠিবে।

মাথায় উকুন হইলে—চাপা ফুলের পাতার রস চুলে মাখিয়া শুকাইবে। পরে জলে ধুইয়া ফেলিবে, ইহাতে মাথার উকুন মরিয়া যায়।

(২) রাত্রে শয়নকালে পানের রস পায়ের তালুতে মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

চোখ উঠায়—পাতি লেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষুর নীচে ও উপরে প্রলেপ দিবে।

চক্ষুতে ছানি হইলে—শ্বেত পুনর্নবার শিকড় পুরাতন কাঞ্জির সহিত ঘষিয়া চক্ষে দিলে ছানি ভাল হয়।

চক্ষুতে নালী হইলে—লবণ মধুতে ঘষিয়া গরম করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষের নালী ও কোলা ভাল হয়।

শিরঃ পীড়ায়—(১) কর্পূর—চন্দনে মিশ্রিত করিয়া রগে দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়।

(২) অপরাজিতা ফুলের পাতার রস নস্য কারণে শিরঃ পীড়া ভাল হয়।

মাথায় টাক পড়িলে—শোধিত হরিতাল, বহেড়া, বৃহতীর মূল সমভাগে লইয়া—মধুসহ মাড়িয়া প্রলেপ দিলে টাকে চুল উঠে।

ক্ষয়কাসে—(১) হরিণের মাংস সিদ্ধ করিয়া ছাগল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে ক্ষয় কাস ভাল হয়।

সর্পভয় নিবারণের জন্য—পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত পুনর্ণবার মূল আনিয়া ঘরে রাখিলে সর্পভয় দূর হয়।

কুকুরে কামড়াইলে—অগ্র কুকুরের লোম কলার ভিতর করিয়া রবিবারে খাওয়াইলে কুকুরে কামড়াইলে ভাল হয়।

শিয়ালে কামড়াইলে— অগ্র শিয়ালের লোম রবিবারে কলার ভিতর করিয়া খাওয়াইলে শিয়ালে কামড়াইলে ভাল হয়।

বিছায় কামড়াইলে-ছাগলের নাদি জলদিয়া গুলিয়া বা কাচা থাকিলে ঘসিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ভাল হয়।

দদ্রু রোগে—(১) ধূপ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, কণ্টকারি ১ তোলা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে জলদ্বারা বাটিয়া দদ্রুর উপর প্রলেপ দিলে বহু পুরাতন দদ্রুও ভাল হয়।

(২) শোধিত গন্ধক কেরোসিন তৈলসহ দদ্রুস্থানে মাখিলে দদ্রু ভাল হয়।

রক্তাতিসারে—(১) বটপাতা বাটিয়া বাসিজলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়।

(২) আমের ছাল বাটিয়া কাঞ্জির সহিত পান করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়।

(৩) কুড়চির ছালের রস বা কাথ সেবনে রক্তাতিসার ভাল হয়।

বাতে—অর্কমূল বাসি জলের সহিত পান করিলে বাত ভাল হয়।

কর্ণরোগে—(১) হুড়হুড়ের পাতার রস কর্ণে দিলে কানপাকা ও কান কটকটানি ভাল হয়।

(২) গুগ্‌গুলু জলে গুলিয়া গরম করিয়া কাণে দিলে কাণপাকা ও কাণ কটকটানি ভাল হয়।

ডাইনের দৃষ্টি হইলে—(১) হুড়হুড়ের পাতার রস মুখ ও নাকে দিলে ডাইনের দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(২) সজিনার মূলের ছাল পঁচিশটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে ডাইনে পাওয়া ব্যক্তি ভাল হয়।

বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—(১) কণ্টকারির মূল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না।

(২) হরীতকীর আঁটি ছিদ্র করিয়া সূত্র দিয়া ডান হস্তে পরিলে বসন্ত হয় না।

শিশুর জ্বরে—নাগর মুতা, হরীতকী, নিমছাল, পলতা ও যষ্টিমধু—সমভাগে লইয়া ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে শিশুদিগের জ্বর ভাল হয়।

শিশুর অতিসারে—(১) বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ শিশুদিগের দুর্দ্দমনীয় অতিসারে মধুর সহিত সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(২) শুঁঠ আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করাইলে শিশুর সর্ব্বপ্রকার অতীসার ভাল হয়।

শক্তি বৃদ্ধির জন্য—গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী এই সমুদয় সমভাগে ঘৃতের সহিত সেবনে স্মৃতিশক্তি এত বর্দ্ধিত হয় যে, তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়।

নালী ঘায়ে—(১) শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালী ঘায়ে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নালী বিনষ্ট হয়।

(২) হাপরমালীর আঠা নালী ঘায়ে লাগাইলে নিশ্চয়ই নালী ঘা ভাল হয়।

কুচকী হইলে—(১) প্রথম কুঁচকী উঠিবার সময় বটের আঠা লেপন করিলে কুঁচকী বসিয়া যায়।

(২) কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুঁচকী ভাল হয়।

একশিরা হইলে—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, ও হরীতকী, ইহাদের কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফ জন্য একশিরা ভাল হয়।

শোথে—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু, ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখাশ্রিত শোথ অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

বেরিবেরি।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন)

বেরিবেরি নামটা এদেশের লোকে আগে জানিত না গত ১৮৮৭ সালে বা তাহার কিছুকাল আগে হইতে এই নামটা এদেশবাসী শুনিয়াছে। শুধু শুনিয়াছে তাহাই নহে, এই রোগ সেই সময় হইতে দেশে একটা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় ইহার নাম শুনিলেই সকলের শঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই রোগের নামের উৎপত্তির মূল কি, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এই রোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (Beri Beri) বেরিবেরি। সরিসস্ বাসিগণ ইহার নাম দিয়াছেন (Berbiers) বারবিয়ার্স। ব্রেজিলবাসী ইহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Morbus Innominatus) মর্ব্বস ইনোমিনেটস্। বোহিমা ইহার নাম দিয়াছেন (Sugar warks Sickness) সুগার ওয়ার্কস সিকনেস। সিংহল দ্বীপের অধিবাসীগণ ইহার নাম দিয়াছেন, (Bad Sickness) ব্যাড সিকনেস। জাপান হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে (Kakko) কাক্কো। বলা বাহুল্য সকল নামই বেরিবেরি সংজ্ঞাজ্ঞাপক। ডাক্তার হার্কলট্স (Herklotts) বলেন, হিন্দী ভাষায় ভেড়ী শব্দ হইতে বেরিবেরি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দী ভেড়ী শব্দের

অর্থ মেষ বা ভেড়া। হার্ট সের যুক্তি—বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পাদবিক্ষেপভঙ্গীর সহিত ভেড়া বা মেষের পদক্ষেপের সৌসাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়াই এইরূপ নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় 'ভেবুভেরী' অর্থে ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত স্ফীতি। ম্যান্‌শন গুড (Manson good) বলেন, বেন্‌টিয়স (Bentius) কর্ত্তৃক বেরিবেরিয়া (Beri Beria) প্রচলিত হইয়াছে এবং তাঁহার অনুমান এই নাম প্রাচ্য দেশ হইতে উদ্ভূত। কার্টার (Carter) বলেন, 'ভর' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে "ভরি" অর্থাৎ নাবিক এবং "ভরভার" শব্দের অর্থাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—বলিয়া উহা হইতে বেরিবেরি উৎপন্ন হইয়াছে। কার্টারের এই অনুমানের কারণ আফ্রিকা এবং আরব দেশীয় নাবিকদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল। কেহ কেহ বলেন, সিংহল দেশীয় কোনো দৌর্ব্বল্য বাচক শব্দ হইতে বেরিবেরি নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ মালাবার উপকূলস্থ প্রদেশে ম্যালেরিয়া, বাতব্যাধি ও অন্যান্য কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উহার জ্ঞাপনার্থ সিংহল দেশবাসীরা এই শব্দটী প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই রোগের নাম আমরা কিছুকাল হইতে শুনিলেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন, এই পীড়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহু দেশের অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ গ্রীক, রোমান ও বহু দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। জাপান ও চীন দেশের ইতিবৃত্তে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ডেন্‌মার্ক নিবাসী (Duch) জাতির যে সময়ে পৃথিবীর পূর্ব্ব মহাখণ্ডে গতিবিধি ছিল, সেই সময় তাহারা এই পীড়া ও ইহার প্রকৃতি পরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল দেশে জনপদোধ্বংসী মূর্ত্তিতে ইহার প্রকোপ হয় এবং সেই সময় জাপানেও নাম বদলাইয়া ইহা প্রকাশ পায়।

শরীরের ত্বকগত স্নায়ুজালের অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখার বিশেষ প্রাদাহিক অবস্থা ও তদানুষঙ্গিক সর্ব্বাঙ্গীন বা আংশিক শোথ এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রবণতাই বেরিবেরির প্রকৃত সংজ্ঞা বলিয়া ডাক্তারেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই রোগের আক্রমণে সর্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক শোথ প্রকাশ ভিন্ন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন,—(১) শরীরের মাংসাশের অপকর্ষ (২) কোনো কোনো স্থানে রক্তের জলীয় অংশের সঞ্চয় (৩) হস্ত এবং পদ দ্বয়ের অবশ ভাব, ঐ সকল সকল স্থানে বেদনা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা, হৃদয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য ও বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রক্তবর্ণ প্রস্রাব, নিদ্রালুতা।

এই রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশজ রোগ বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরিমিত আহার অনুপযুক্ত আহার, অযথা আহার, প্রদুষ্ট জল বায়ু সেবন, শৈত্য সংস্পর্শ, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সেবন, রাত্রি জাগরণ, মাদক সেবন প্রভৃতি এই রোগ উৎপত্তির কারণ বলিয়া তাঁহারা

অারও নির্ণয় করিয়াছেন। বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে এই পীড়া বড় একটা হইতে দেখা যায় না। পঞ্চদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেই এই রোগ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র, কারাগৃহের বন্দী প্রভৃতির মধ্যে এই পীড়ার প্রাবল্য দেখা যায়। টায়ফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ক্ষয় রোগ, সিফিলিস বা উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার পরিণামে এই রোগ হইতেও দেখা যায়। গর্ভিণী, আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদিগের এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হইয়া সম্ভাবনা।

এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অল্প শিরোবেদনা, ক্রুর কোষ্ঠ, ক্ষুধামান্দ্য, হস্তপদাদিতে বেদনা, মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা, হৃদস্পন্দন, কখন বা অতিসার, কখন বা সামান্য জ্বর ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে শোথাদির লক্ষণাদি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই পীড়া উপস্থিত হইলে অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। ত্বক কিয়ৎপরিমাণে স্পর্শজ্ঞান বিহীন হয়। জঙ্ঘা দেশের সম্মুখ-ভাগ, চরণের উপরিভাগ ও উরুদ্বয়ের পার্শ্বভাগের ত্বকের স্পর্শজ্ঞানহীনতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও বাহু এবং দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানের কিয়ৎ-পরিমাণে স্পর্শজ্ঞানহীনতাও ঘটিয়া থাকে। পাদডিম্বের কৃশতা ও উরু ডিম্বের শিথিলতা বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। ঐ দুই স্থানে হস্ত দ্বারা পীড়ন করিলে এরূপ বেদনা অনুমিত হয় যে, রোগী শিহরিয়া উঠে। উরু দেশের মাংসপেশী ঐরূপ বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা বেরিবেরিকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপরিউক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট বেরিবেরির নাম—পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি। এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি দুই প্রকারের আরম্ভ হয়,—১ম—আকস্মিক উৎপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বে কোনো চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, রোগী রাত্রিকালে নিদ্রার পর প্রাতে পীড়াক্রান্ত হইয়া জাগরণ করিল। ২য়—চিরাগত উৎপত্তি, এইরূপ অবস্থার লক্ষণ সমূহ প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যে বেরিবেরির পূর্ব্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পূর্ব্বরূপ এই চিরাগত উৎপত্তির অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরিতে যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই মূত্রাধিক্যের কারণ রোগীর স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়া। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা (Brain and spinal cord) শরীরস্থ সমগ্র স্নায়ু মণ্ডলীর কেন্দ্র স্থান। এই কেন্দ্র স্থান কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাদিতে তাহাদের অনুভূতির উদ্রেক শক্তি প্রতিফলিত হইবে। এইজন্য স্নায়ু শাখা প্রশাখা দ্বারা সেই উত্তেজনা বা অনুভূতি উদ্রেক শক্তি মূত্র যন্ত্রে (Kidney) প্রতিফলিত হয় বলিয়াই মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই অনুভূতিউদ্রেকশক্তির জন্য জানুসন্ধিতে কোন প্রকার উত্তেজনার লক্ষণ অনুভব করিতে পারা যায় না অর্থাৎ জানুসন্ধিতে আদৌ বল থাকে না। এই অবস্থায়

রোগীর কোনো ইন্দ্রিয়েরই বল থাকে না। কোনো দ্রব্য হস্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক পান-আহারাদি কোনরূপ কার্য্য রোগী করিতে সমর্থ হয় না। অনেক সময়ই হস্ত কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষু, মুখমণ্ডল, চর্ব্বণযন্ত্র, জিহ্বা প্রভৃতির মাংসাংশের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উপলব্ধি হয় না। শরীর দ্বার-রোধক মাংসপেশী সকলের ও মূত্রাশয়ের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে না। অন্ন-মহাস্রোতের কার্য্যকলাপও যথাবিধি সম্পাদিত হয়। কখন কখন অজীর্ণ প্রযুক্ত উদর স্থান ও আহারান্তে উদরের প্রপীড়ণ উপস্থিত হইয়া থাকে। গুল্‌ফসন্ধির বল হানি এইরূপ অবস্থায় যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে শয্যাশায়িত রোগী শয্যা হইতে পদদ্বয় উত্তোলন করিতে পারে না এবং লম্বভাবে বা উর্দ্ধভাবে একের উপরে দ্বিতীয় পাদ স্থাপনায় সক্ষম হয় না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা বিশারদগণ পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি ভিন্ন বেরিবেরির আর যে সকল শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ২য়টীর নাম হৃৎপিণ্ড বৈষম্য ও শোণিত সঞ্চরণ বৈষম্য বিশিষ্ট বেরিবেরি। এই পীড়ায় হৃৎপিণ্ড অধিকভাবে দূষিত হয়। বাম স্তনের নিকট এক প্রকার স্পন্দন অনুভূত হয়। শুধু বামস্তনের নিকটই নহে, এই প্রকার বেরিবেরি রোগে বক্ষঃ প্রাচীরের অনেক দূর পর্য্যন্ত হৃৎ-স্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। গ্রীবা ও কণ্ঠদেশে জগুলার (Jogulars) নামক ধমনীদ্বয়েও স্পন্দন অনুভব হয়।

এইরূপ বেরিবেরি রোগে বক্ষঃ প্রাচীরে অঙ্গুলী প্রাতুৰাতকরিলেই স্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। হৃদ্দেশে কর্ণ প্রয়োগ করিলে দুইটি শব্দ শ্রুত হয়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মত হৃৎপিণ্ডে দুই প্রকার শব্দ হয়। ১ম শব্দ সামান্য বিশ্রাম, তাহার পর ২য় শব্দ ও সর্ব্ব শেষে সামান্য বিশ্রাম-সময়। এইরূপ বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ হয়। সামান্য পরিশ্রমেই ইহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। শোণিত সঞ্চারক যন্ত্রটি বিকৃত হওয়াই ইহার কারণ। আর এক প্রকার বেরিবেরি আছে, তাহার নাম শোথ বিশিষ্ট বেরিবেরি (Dropsical Beriberi) এইরূপ বেরিবেরি রোগ স্ফাতকায় হইয়া থাকে। ইহাদের মুখ—মণ্ডল স্ফীত ও গুরুভাব ধারণ করে। ইহাদের ওষ্ঠ নীলাভ হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ হস্ত পদাদিতে বিশেষ ভাবে শোথ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহারা Kidney অর্থাৎ মূত্রপিণ্ডের তীব্র প্রদাহ ভোগ করিয়া থাকে। এই বেরিবেরি শোথের বিশেষত্ব যে, ইহাদিগের শোথ—সকল সময় সকল স্থানে থাকে না, একস্থান হইতে অপর স্থানে শোথ উপস্থিত হয়। এইরূপ পীড়ায় হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগী গমনাগমন করিতে কষ্ট বোধ করে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এইরূপ অবস্থায় অধিক লক্ষিত হয়। এইরূপ রোগীর পাদ-শোথ চলচ্ছক্তির প্রতিরোধক হয়। এইরূপ অবস্থায় গুলফ-সন্ধির পক্ষাঘাতিক অবস্থাও হইয়া থাকে এবং জানুসন্ধির স্পন্দন

(knee-gerk) লুপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও জঙ্ঘার সম্মুখাংশ অসার হয়। এই শোথ-বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয় না, জিহ্বাও পরিষ্কার থাকে। হৃদ্‌-প্রদেশে বক্ষের ঊর্দ্ধে অস্বস্তি বোধ হয়। এই কারণেই এ শ্রেণীর রোগী ক্ষুধা সত্বেও বেশী আহার করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। বেরিবেরির শ্রেণীবিভাগে আরও দুই প্রকার বেরিবেরির পরিচয় পাওয়া যায়। একপ্রকার একত্র শোথ ও পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বেরিবেরি (Mixed paraplegic and Dropsical cases), আর এক প্রকার গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্য (Great Variety in Degree and combination of Symptoms)। শোথ ও পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগে জঙ্ঘার সম্মুখাংশ, পাদ দ্বয়, পার্শ্বদেশ, কোমর, বক্ষঃপ্রাচীরের মধ্যস্থল, গ্রীবার আরম্ভ স্থল প্রভৃতি স্থানে কঠিন শোথ হয়। জঙ্ঘা-প্রদেশ অসাড়ত্ব অনুভূত হয়। এই রোগে জানু-সন্ধির স্পন্দন হয় না। হৃৎ-পিণ্ডের শব্দ প্রবল ভাবে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় সাধারণতঃ রোগীর স্বাস্থ্য বিশেষ বিকৃত হয় না, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। প্রস্রাব কম হয়।

গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্যের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে রোগী সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে ও অনায়াসে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। প্রথমতঃ রোগ অতি সামান্য বলিয়াই মনে হয়, যখন বেশী হইয়া পড়ে, তখন রোগীকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। সেই সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সামর্থ্য শূন্য হইয়া পড়ে। রোগী এই সময় কঙ্কালসার হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে কখন কখন শোথ-প্রযুক্ত স্ফীত হইতে দেখা যায়। স্বরভঙ্গ এরূপ রোগীর একটী বিশেষ লক্ষণ।

সকল প্রকার বেরিবেরিতেই যে মৃত্যু হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদেরা স্বীকার করেন না। পক্ষাঘাত সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী দৃষ্ট হইলে তাহাকে প্রাণ-নাশক বলিয়া বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। যদি বেরিবেরিতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক মাংসপেশীসমূহ বিশেষ ভাবে জড়িত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বেরিবেরিতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ— এই রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ। ফুসফুসে জল, হৃদয়াবরণে জল সঞ্চয়, বায়ু দ্বারা পাকাশয়ের পরিপূর্ণতা বেরিবেরি রোগে মৃত্যুকে আনয়ন করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি।—আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো ব্যাধি নাই। তবে নিদান-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা শোথ রোগের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রমাণ করিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদে-শোথের লক্ষণ এইরূপ,—

বহুদিন কোনো পুরাতন ব্যাধিতে ভুগিয়া শরীর দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলে বাতাদি দোষ কুপিত হওয়ায় ত্বক ও মাংসাশ্রিত বায়ু যখন দূষিত, রক্ত, পিত্ত, ও কফকে বাহিরের শিরা সমূহে আনয়ন করিয়া তদ্বারা নিজে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন

হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া পড়ে. সে ফুলার নামই শোথ। যকৃৎ দোষ, হৃদ্‌রোগ এবং বহুমূত্র বা মূত্রাল্পতা প্রভৃতি মূত্রাশয়ের পীড়া—এই ত্রিবিধ কারণেই সাধারণতঃ শোথ রোগ জন্মায়।

শোথের প্রকার ভেদ।—বাতজ, পিত্ত, কফজ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ এবং বিষজ ভেদে শোথ নয় প্রকার।

বিভিন্ন শোথের উপদ্রব ও লক্ষণ।—বাতজ শোথ একস্থানে ঠিক থাকে না, স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়ায়। ঝিঁঝিঁ ধরার মত উহা ভারী হয়, টিপিলে মধ্যস্থলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল খাইয়া পড়ে, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার শোথ রাত্রে কমে এবং দিবসে বাড়ে। **পিত্তজ শোথ** কোমল, উহার উপর হস্ত রাখিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়. এই প্রকার শোথ রক্তবর্ণ। জ্বালা যন্ত্রণা, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসাদি ইহার আনুষঙ্গিক উপদ্রব। **কফজ শোথ**—স্থূল, ভারী, অথচ একস্থানে স্থায়ী এবং পাণ্ডুবর্ণ। এই শোথ ধীরে ধীরে বহু বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা কমিবার সময় ধীরে ধীরে কমে। শোথ-স্থানে টিপিলে টোল খাইয়া যায়, চাপ উঠাইয়া লইলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি চাপের দাগ থাকে। কফজ শোথ রাত্রে বৃদ্ধি পায় এবং দিবসে শুকাইয়া আসে। **বাত-পিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্ত-শ্লেষ্মজ**—এই তিন প্রকারের দ্বন্দ্বজ শোথে দুই দুইটী মিলিত লক্ষণ এবং **ত্রিদোষজ শোথে** সর্ব্ব প্রকারে মিলিত লক্ষণই প্রকাশ পায়। **অভিঘাতজ শোথ**—শীতল বায়ু লাগিলে, তুষার পাতে, সমুদ্রের জলে স্নান বা সমুদ্রের বায়ু সেবনে ও শুঁয়াপোকা, আলকুশী, ভেলা প্রভৃতির চোঁচ, বা রস লাগিলে উৎপন্ন হয়, ইহার লক্ষণাদি পিত্তজ শোথের মত এবং ইহা সচল। **বিষজ শোথ**—বিষ ভক্ষণ, জল, সংযোগ বিরুদ্ধ আহার দ্বারা, বিষ ক্রিয়া হেতু, সবিষ সরিসৃপাদির অর্থাৎ মাকড়সা ও বৃশ্চিকাদির দংশন, সংস্পর্শ এবং তাহাদের মল মূত্রাদি গাত্রে লাগিলে অথবা বিষাক্ত বৃক্ষের বায়ু সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। ইহা দাহকর, বেদনা দায়ক এবং দেহের উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দেশে সঞ্চরণশীল ও কোমল স্পর্শ।

সাধ্যাসাধ্য।—সর্ব্ব উপদ্রবযুক্ত শোথ এবং বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল রোগীর শোথ আরোগ্য হওয়া কঠিন। মধ্য দেহে ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে তাহাও কষ্টসাধ্য। অন্য কোনো বিশেষ রোগ ব্যতীত যদি পুরুষের প্রথমে পদাদি নিম্নদেশে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং স্ত্রীলোকের যদি প্রথমে মুখাদি উর্দ্ধদেহে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ নিম্নদেহে পদাদি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে শোথ অসাধ্য। কিন্তু যদি উক্ত শোথ পাণ্ডু, অর্শ প্রভৃতি রোগ সাপেক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সাধ্য। শোথের সহিত শ্বাস, অরুচি, জ্বর, পিপাসা, বমি এবং দৌর্ব্বল্য—এই সকল উপদ্রবের এক কালে উপস্থিত হইলে সে শোথ প্রাণনাশক হয়। স্ত্রী বা পুরুষের তলপেটের (মূত্রাশয়) উপরিভাগ ফুলিয়া পড়িলে এবং পুরুষের লিঙ্গ ও কোষ এবং স্ত্রীলোকের যোনি ফুলিলে, সে শোথে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। উপরোক্ত কয় প্রকারের দুর্লক্ষণাক্রান্ত শোথ ব্যতীত অপর সকল প্রকার শোথ অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হইলেও সুচিকিৎসায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ জনপদব্যাপী শোথ বা Epedemtc Dropsyর কথা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করিলেও তাঁহারা কিন্তু এই জনপদব্যাপী শোথের সহিত বেরিবেরির সাদৃশ্য ঠিক স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন,—(১) জনপদ ব্যাপী শোথ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ, বেরিবেরি সেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। (২) শোথ রোগ সর্ব্ব প্রকার লোকের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু বেরিবেরি রোগ যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হিতাচার সম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই হয় না। (৩) বহুজনের একত্র সমাবেশ বেরিবেরি রোগ বিস্তারের সাহায্য করে। জনপদ ব্যাপী শোথ রোগে বহু জনের সমাবেশ ক্ষতির কারণ হয় না। (৪) পাকাশয় ও অন্ত্র সংক্রান্ত রোগ বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে শোথ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু বেরিবেরিতে সেরূপ হইবার কোনো কারণ নাই। (৫) শোথ রোগের প্রথম অবস্থায় গাত্রে বিস্ফোটক (Eruption) উদগত হয়; বেরিবেরিতে সেরূপ হয় না। (৬) শোথ রোগে কোনো না কোনো স্থানে শোথ থাকিবেই, কিন্তু বেরিবেরি পীড়ায় সকল সময় শোথ নাও থাকিতে পারে। (৭) অনেক সময় শোথ রোগের প্রথমে বা শোথের সঙ্গে জ্বর থাকে, বেরিবেরিতে জ্বর হয় না। (৮) বেরিবেরি রোগে পক্ষাঘাত একটী প্রধান লক্ষণ। শোথ রোগে কিন্তু পক্ষাঘাতক লক্ষণ থাকে না। (৯) শোথ রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিত-সঞ্চারের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও প্রসারিত হয়, এজন্য ত্বকে দানা ও শোথ জন্মে। অঙ্গুলি পীড়নে দানাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ কাল শিরার ন্যায় স্থায়ী চিহ্ন উপস্থিত হয়। বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিত সঞ্চারের বিশৃঙ্খলতা ঘটে বটে, কিন্তু দানা উদ্গম বা কাল শিরা চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে না। (১০) শোথ রোগে মূত্র কদাচিৎ অ্যালবিউমেন যুক্ত হয়। কিন্তু বেরিবেরিতে অ্যালবিউমেন থাকে না। (১১) শোথ-রোগীর শোণিত-পরীক্ষায় একটি বিষ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বেরিবেরি রোগে এই বিষ পদার্থ লক্ষিত হয় না। বেরিবেরির সহিত পরিপাক বিধানের কোনো সম্বন্ধ নাই।

বেরিবেরি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসার এইরূপ মতদ্বৈধ হইলেও আমরা অনেক সময় ডাক্তারেরা যাহাকে বেরিবেরি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে শোথ রোগের চিকিৎসা করিয়া কিন্তু সুফলই পাইয়াছি। হইতে পারে, বিসূচিকা ও কলেরার মত বেরিবেরি ও শোথ রোগে কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। হইতে পারে ঋষিযুগের বিসূচিকার সহিত এখনকার কলেরার যেরূপ অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, ঋষিযুগের শোথ ও এখনকার বেরিবেরির মধ্যে সেইরূপ বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু শোথ ও বেরিবেরির মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে অনেকটা একই স্বভাবের রোগ বলিয়া যদি উভয়কে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঋষি উপদিষ্ট শোথ রোগের চিকিৎসার বিধি বেরিবেরিতে প্রয়োগ করিলে বিফল মনোরথ হইবার তো কোনো কারণই দেখি না। বেরিবেরি ও শোথ রোগ উভয় পীড়াতেই Heart বা হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে, শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উভয় পীড়াতেই বর্ত্তমান, এ অবস্থায় বেরিবেরি ও শোথ স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও উভয় রোগেই Heart যাহাতে ভাল থাকে, শ্বাস যন্ত্রের কষ্ট যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহা তো করিতেই হইবে, সুতরাং চিকিৎসায় গোলযোগ হইবার কোনো কারণই নাই।

৮ম বর্ষের বর্ষ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

"আয়ুর্ব্বেদে"র বর্ষারম্ভ আশ্বিনে হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্বিন মাস—পূজার মাস বলিয়া প্রতিবৎসরই এই সময় নূতন ভাবে 'কাগজ' বাহির করা বড় কষ্টকর হয়। সেই জন্য আমরা এবার ভাদ্রের সহিত আশ্বিনের সংখ্যা একত্র করিয়া ৮ম বর্ষ শেষ করিয়া দিলাম। গ্রাহকেরা এবার ১২ খানির পরিবর্ত্তে ১৩ খানি কাগজ ১২মাসে পাইলেন। অতঃপর কার্ত্তিক হইতে ইহার নবম বর্ষ আরম্ভ করা হইবে।

যতগুলি কারণে ৮ম বর্ষের পত্রিকা পরিচালনে নানারূপ বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য বাঁকী থাকাই তাহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান সময় প্রেসের দর, কাগজের মূল্য—সকলই অত্যধিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় গ্রাহকদিগের নিকট যদি বাঁকী রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে পত্রিকা পরিচালন ব্যাপার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই জন্যই ৮ম বর্ষের কাগজ পূর্ব্বের মত আমরা যথাসময়ে বাহির করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। অতঃপর নানারূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আগামী কার্ত্তিক হইতে আমরা যাহাতে প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে ইহা বাহির করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। কার্ত্তিক মাস হইতে নূতন আকারে—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তারগণের লেখায়—যতদূর ভাল হইতে পারে সেইভাবে প্রতিসংখ্যা বাহির হইবে। গ্রাহকেরা দয়া করিয়া আপন আপন মূল্য অবিলম্বে মণিঅর্ডারযোগে প্রেরণ করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। যাঁহাদের নিকট মূল্য বাঁকী রহিয়াছে,—তাঁহারা তো মনিঅর্ডার করিবেনই, ইহা ছাড়া যে সকল সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, তাঁহারাও অবিলম্বে ৯ম বর্ষের মূল্য মণিঅর্ডার করিবেন, ইহাও বিশেষ ভাবে প্রার্থনা। বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদের কাগজ এইখানি মাত্রই ভরসা। সকলের সমবেত সাহায্য-প্রাপ্তি ভিন্ন আমরা এই মহান্‌কার্য্য পরিচালিত করিতে পারি না। বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের দিনে সমস্তই অর্থ-সাপেক্ষ। আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক মণ্ডলী এ কথাটা বুঝিয়া কার্য্য করুন ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।

আশ্বিন মাসের মধ্যে যাঁহাদের মূল্য পাওয়া যাইবে না,—আগামী ৯ম বর্ষের ১ম সংখ্যা অর্থাৎ কার্ত্তিক-সংখ্যার কাগজ তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে এবং আশাকরি, সকলে তাহা যথাসময়ে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।